শিশু-সাথী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

চঞ্চল আমি তোমাদের সাথী
নাম মোর সমীরণ,
কোরক ফুটাই বহি' পরিমল
লুটি' বন-উপবন।
নদ নদী আর নিঝরের সাথ,
ছুটিয়া বেড়াই আমি দিনরাত,
তোমাদের সনে ধূলা-খেলা খেলি
ঘুরে ফিরি অনুখন।

তরঙ্গ তুলি মহাসাগরেতে—
দুলে উঠে রণতরী,
বন্যা হরিণ পেন্‌গুইনেরে
চলি শঙ্কিত করি।
এলা-লবঙ্গ-চন্দন-বাস
আনি উপহার তোমাদের পাশ,
তোমাদের কাছে নিতি নব হই
আমি চির পুরাতন।

তোমাদের ওই উজ্জ্বল চোখে
স্বরগের জ্যোতি ভাসে,
পাই পারিজাত-কুসুম-গন্ধ
সুরভিত নিঃশ্বাসে।
তোমরা নবীন ধরণীর আশা,
তার আকাঙ্ক্ষা, তার ভালবাসা,
শ্রীভগবানের সব-সেরা দান
হৃদয়-জুড়ানো ধন।

তোমরা সকলে জ্ঞানী গুণী হও,
বীর উন্নত-শির,
প্রতিভা এবং সংযমে হও
গৌরব ধরণীর।
তোমাদের যশ, মঙ্গলবাণী—
আমি যেন নিতি বহে বহে আনি;
জীবন হউক দীর্ঘ শান্ত—
নির্ম্মল হ'ক মন।

জীবক
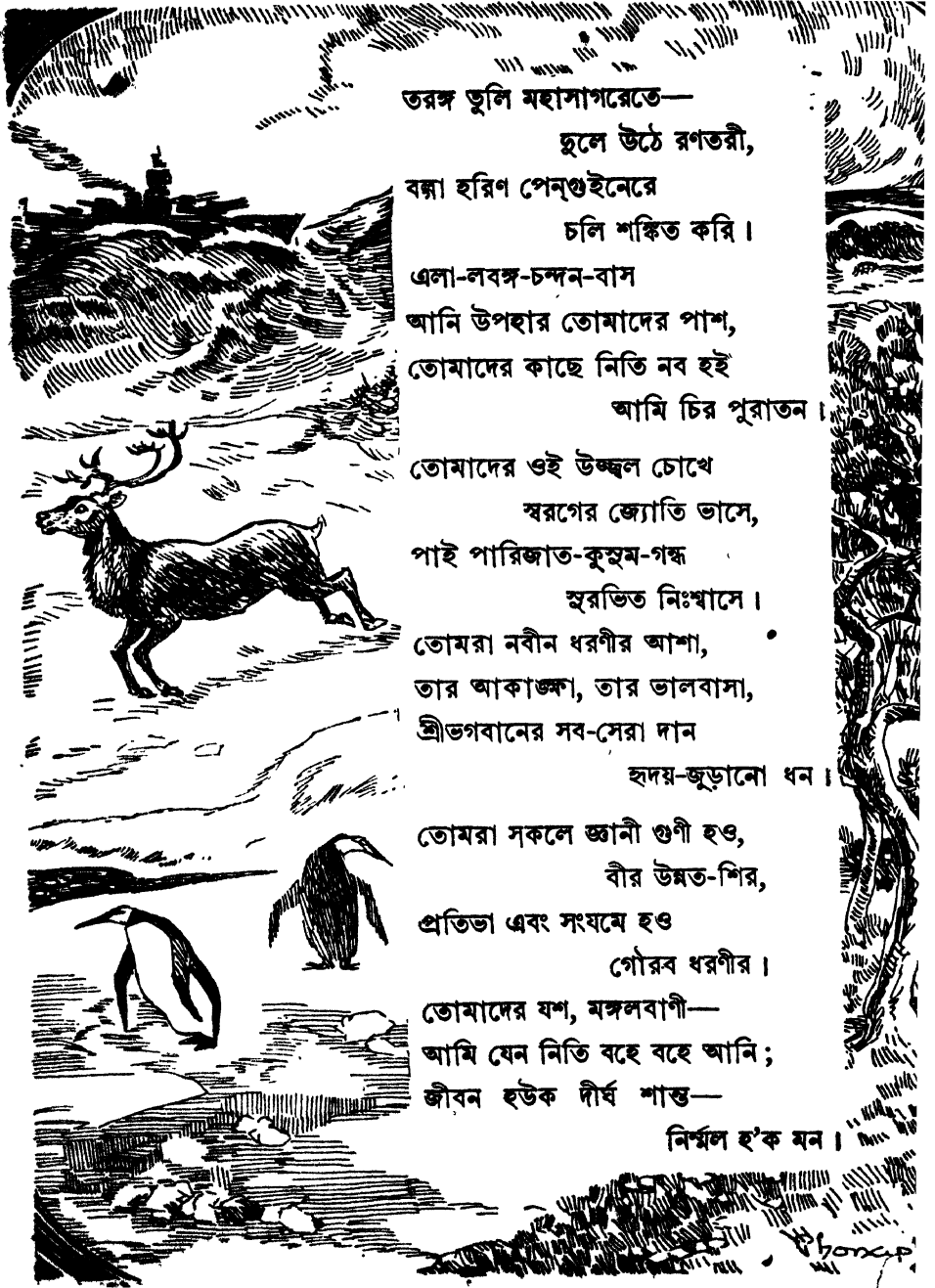
অধ্যাপক শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য, এম. এ.

বুদ্ধদেবের সময়ে ভারতবর্ষে চিকিৎসা-শাস্ত্রের অসামান্য উন্নতি হইয়াছিল। তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যান্য বিদ্যার সহিত চিকিৎসা-বিদ্যা সম্বন্ধেও শিক্ষাদান করা হইত। এই বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া অনেকেই আয়ুর্ব্বেদে অশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপ একজন বিশিষ্ট চিকিৎসকের নাম পালিগ্রন্থে পাওয়া যায়। তাঁহার নাম জীবক।

রাজা বিম্বিসারের পুত্র অভয় ছিলেন জীবকের পিতা। জীবকের মাতার নাম শালবতী। ইনি অভয়ের ধর্ম্মপত্নী ছিলেন না। কাজেই পিতার মৃত্যুর পর জীবকের পিতৃরাজ্য লাভ করিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

জীবকের বুদ্ধি খুব প্রখর ছিল। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিতে তাঁহার অধিক দিন লাগিল না। কিন্তু প্রথম পাঠ সমাপ্ত করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না। অল্প বয়সেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, নিজের জীবিকা অর্জ্জনের জন্য তাঁহাকে একটা কোন উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

অনেক চিন্তা করিয়া একদিন তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া তক্ষশিলা যাত্রা করিলেন। তক্ষশিলায় তখন আচার্য্য আত্রেয় ছিলেন আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপক। তাঁহার অধ্যাপনার খ্যাতি তখন চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দেশ-বিদেশ হইতে শত শত শিক্ষার্থী তাঁহার নিকটে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিবার জন্য তক্ষশিলায় ভিড় করিতেছে। শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই ধনীর সন্তান। আচার্য্যকে উপযুক্ত দক্ষিণা দিতে কাহারও কার্পণ্য ছিল না।

সেদিন প্রভাতে তক্ষশিলা বিদ্যালয়ের কক্ষে কক্ষে বিবিধ শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা চলিতেছে। আচার্য্য আত্রেয়ও যথারীতি নির্দ্দিষ্ট কক্ষে বসিয়া আয়ুর্ব্বেদের পাঠ দিতেছেন। অন্তেবাসিগণ মন্ত্রমুগ্ধবৎ-স্তব্ধ হইয়া গভীর মনোযোগ সহকারে গুরুর বাক্য শুনিতেছে।

পাঠকক্ষের পশ্চাতে সমুচ্চ বেদীর উপর আচার্য্যের আসন। সম্মুখে কাষ্ঠাসনে তাঁহারই স্বহস্তলিখিত একটি পুঁথি উন্মুক্ত রহিয়াছে। কিন্তু পুঁথির দিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই। বিদ্যার্থিগণের দিকে চক্ষু রাখিয়াই তিনি বক্তব্য বিবৃত করিতেছেন।

এমন সময় হঠাৎ দ্বারের কাছে একটি তরুণ বালকের মূর্ত্তি দেখা গেল। আচার্য্য জিজ্ঞাসুনেত্রে বালকের দিকে তাকাইলেন। পাঠকক্ষ মুহূর্ত্তের মত নীরব হইল। ছাত্রগণ প্রথমে কিছু বুঝিতে পারে নাই। পরক্ষণে গুরুর দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিতেই সকলে একটি তরুণ আগন্তুককে দেখিতে পাইল।

আত্রেয় জীবককে আহ্বান করিলে জীবক নিকটে আসিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া করজোড়ে বলিলেন—"আপনার শিষ্য হইবার জন্য বহুদূর হইতে আসিয়াছি। আমাকে আপনার শ্রীচরণে একটু স্থান দিন।

আত্রেয় মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন—"আমার শিষ্য হইতে হইলে যে দক্ষিণা দিতে হইবে; দিতে পারিবে তো?"

কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া জীবক উত্তর দিলেন—"গুরুদক্ষিণা না দিলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না সে জ্ঞান দাসের আছে। দক্ষিণা দিব বই কি!"

যে যতই ধনী হউক এমন কথা কেহই স্বচ্ছন্দে বলিতে পারে না। ছাত্রগণ পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল।

আত্রেয়ও একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"তা বেশ, দেখি কি আনিয়াছ।"

"যাহা সকলে দেয় সেরকম কিছু আনি নাই। স্বর্ণমুদ্রায় আপনার ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া দিতে পারে এমন ছাত্র আপনার বিদ্যালয়ে অনেক আছে। আমি আনিয়াছি একটি ভৃত্য—যে আপনার শ্রীচরণসেবায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করিয়াছে। সে দক্ষিণা কি আপনার কোন কাজেই লাগিবে না?"—এই বলিয়া জীবক আত্রেয়ের পায়ে মাথা রাখিলেন।

"স্বর্ণ-রৌপ্যের চেয়ে তার মূল্য অনেক বেশী, বৎস!"—বলিয়া আচার্য্য সস্নেহে তাঁহাকে তুলিয়া তাঁহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সাত বৎসর অতীত হইয়াছে। আচার্য্যের অধ্যাপনার গুণে এবং নিজের ঐকান্তিক চেষ্টায় জীবক আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে অসামান্য ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। রোগ-নিরূপণে তাঁহার অশেষ দক্ষতা জন্মিয়াছে। অস্ত্রোপচারেও তিনি সিদ্ধহস্ত হইয়াছেন। জটিল ব্যাধির সন্ধান পাইলেই আত্রেয় জীবককে পাঠাইয়া তাঁহার বুদ্ধি পরীক্ষা করেন। জীবকও রোগী দেখিবামাত্র রোগের নাম বলিয়া এবং ঔষধের যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া গুরুর বিস্ময় উৎপাদন করেন। যত সাংঘাতিক বিস্ফোটকই হউক না জীবক যাহাতে অস্ত্রোপচার করেন তাহা নিরাময় না হইয়া যায় না। এখন যে কোন দুরারোগ্য অসুখই হউক না কেন আচার্য্য আত্রেয় জীবকের উপর চিকিৎসার ভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন।

এইভাবে আরও কিছুদিন অতিবাহিত হইল। জীবকের অভিজ্ঞতা-বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার খ্যাতিও চারিদিকে রাষ্ট্র হইতে লাগিল।

একদিন আচার্য্য মনে মনে চিন্তা করিলেন—জীবকের সকল পরীক্ষাই লওয়া হইয়াছে, কেবল একটা এখনও বাকী। ফল-মূল, পত্র-বল্কল প্রভৃতির গুণাগুণ সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান কতখানি তাহা তো এখনও জানা হয় নাই। সেটা জানা আবশ্যক।

এইরূপ চিন্তা করিয়া একদিন আত্রেয় জীবককে ডাকিয়া বলিলেন—"বৎস, একটি বিশেষ কাজের ভার তোমাকে দিতে চাই। সেই জন্য তোমাকে ডাকিয়াছি। যাহা কোন প্রকার চিকিৎসার কাজে লাগে না, এমন কতকগুলি বৃক্ষলতা আমার আবশ্যক। তুমি এই তক্ষশিলার চারিদিকে আট ক্রোশের মধ্যে ঘুরিয়া ভাল করিয়া সন্ধান কর। দেখ দেখি যদি কয়েকটি সংগ্রহ করিতে পার।"

"যথা আজ্ঞা" বলিয়া জীবক বিদায় লইলেন। কিন্তু গুরু স্পষ্টই দেখিলেন, শিষ্যের চোখে মুখে তেমন উৎসাহের চিহ্ন প্রকাশ পাইল না।

গুরুর সহিত শিষ্যের দেখা-সাক্ষাৎ আজকাল কমই হয়। জীবককে এখন লোকালয়ে দেখাই যায় না। বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁহার আজকাল দিন কাটে।

এইভাবে মাসখানেক কাটিলে গুরু একদিন জীবককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। জীবক আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন—"গুরুদেব, এখনও আমার অনুসন্ধান শেষ হয় নাই। আরও কিছুদিন বিলম্ব হইবে।"

দ্বিতীয় মাস অতীত হইলে গুরু আবার খোঁজ লইলেন। জীবক তখনও গুরুর নির্দ্দেশমত গাছপালা খুঁজিয়া পান নাই।

এইভাবে ছয় মাস কাটিয়া গেল। জীবকের দেহ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, মুখে কালিমা পড়িয়াছে, কিন্তু দুই চোখে কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক রকমের উজ্জ্বলতা দেখা যাইতেছে।

এই রকম অবস্থায় একদিন জীবক আচার্য্যের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং নিতান্ত নৈরাশ্যভরে বলিলেন—"গুরুদেব, আজ ছয় মাস কঠোর পরিশ্রম করিয়াও আপনার আদেশ পালন করিতে পারিলাম না। এই তক্ষশিলার চতুর্দ্দিকে আট ক্রোশের মধ্যে এমন একটি উদ্ভিদও পাইলাম না, কোন-না-কোন ঔষধে যাহার প্রয়োজন হয় না।"

আত্রেয় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"আদেশ পালন করিতে পার নাই বলিয়াই আজ হৃদয়ে অপরিমিত আনন্দ লাভ করিতেছি। পুত্র, এই তোমার শেষ পরীক্ষা। ইহাতে তুমি সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছ। যাও, যে শিক্ষা তুমি লাভ করিলে সমস্ত মানবজাতির কল্যাণে তাহা প্রয়োগ কর। আমি আশীর্ব্বাদ করি তোমার বিদ্যা সার্থক হউক।"

গুরুর আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়া জীবক মগধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

চিকিৎসক হিসাবে জীবকের খ্যাতি ইতিমধ্যেই এতখানি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে, মগধে ফিরিবার পথে যেখানে যেখানে বিশ্রাম করেন সেই সকল স্থলেই দুশ্চিকিৎস্য রোগগ্রস্ত বহু লোকই তাঁহার শরণাপন্ন হয় এবং তিনি স্বীয় বিদ্যাবলে সকলকেই নিরাময় করেন।

তক্ষশিলা হইতে মগধ যাইবার পথে শাকেত রাজ্য। এই রাজ্যে তাঁহাকে কয়েক দিনের জন্য অবস্থান করিতে হয়।

সেই সময়ে শাকেত রাজ্যের একটি রমণী শিরঃপীড়া রোগে অত্যন্ত কষ্ট

পাইতেছিলেন। স্থানীয় চিকিৎসকগণ রোগের কোন কারণ নির্ণয় করিতে পারিতে-ছিলেন না। কাজেই তাঁহাদের ঔষধপ্রয়োগ ব্যর্থ হইতেছিল। খ্যাতনামা বৈদেশিক চিকিৎসকও অনেকে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারাও এই কঠিন রোগ সারাইতে পারিতে-ছিলেন না। এমন সময় জীবক আসিয়াছেন শুনিয়া রোগিণীর আত্মীয়-স্বজন আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন।

জীবকের চিকিৎসায় রোগিণী অনতিবিলম্বে ভাল হইয়া গেলেন। বৌদ্ধগ্রন্থে আছে—জীবক একটি ঔষধ চূর্ণ করিয়া গরম মাখনের সহিত মিশ্রিত করেন এবং ঐ মিশ্রিত দ্রব্যটির নস্য লইতে বলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় কয়েকবার ঐ ঔষধের নস্য লইতেই রোগিণীর সেই দারুণ যন্ত্রণা সম্পূর্ণ দূরীভূত হইল।

রাজগৃহে আসিয়া জীবক চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁহার অসাধারণ শক্তির কথা সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচারিত হওয়ায় একস্থানে তাঁহার স্থির হইয়া বসার উপায় ছিল না। দেশ-বিদেশ হইতে তাঁহার আহ্বান আসিতে লাগিল। বারাণসী এবং উজ্জয়িনীতেও তিনি অনেক রোগীকে নিরাময় করিয়াছেন বলিয়া পালিগ্রন্থে উল্লেখ আছে।

শোনা যায় রাজা বিম্বিসার জীবকের বিদ্যাবত্তা দেখিয়া তাঁহাকে প্রধান রাজবৈদ্যের পদ দিয়া সম্মানিত করেন। বিম্বিসার একবার কোন মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলে জীবক তাঁহাকে রোগমুক্ত করেন।

রাজবৈদ্য-পদলাভের সম্মান বড় সহজ সম্মান নয়, কিন্তু জীবকের অদৃষ্টে যে সম্মান লাভ হইয়াছিল তাহা সকলের ভাগ্যে জুটে না। পৃথিবীর সমগ্র মানবসমাজের দুঃখ দূর করিবার জন্য যিনি রাজ্য-ঐশ্বর্য্য, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, বিলাস-বিভব ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই বুদ্ধদেবের পার্থিব রোগ-যন্ত্রণা মধ্যে মধ্যে এই জীবকের চিকিৎসায় উপশম হইয়াছে।

এক সময় বুদ্ধদেব আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন। জীবক একটি পদ্মফুলের মধ্যে ঔষধ রাখিয়া ঐ ঔষধ তাঁহাকে সেবন করিতে দেন। ইহা সেবনে বুদ্ধদেবের আমাশয় রোগ শান্ত হয়।

আর একবার বুদ্ধদেব অসুস্থ হইয়া পড়েন। জীবক এবারও একটি পদ্মফুলের মধ্যে কি এক ঔষধ রাখিয়া উহার গন্ধ লইতে বলেন। এই ঔষধ আঘ্রাণ করিয়া তিনি

রোগমুক্ত হন। বুদ্ধদেবকে সেবা করিবার সুযোগ পাইবেন বলিয়া জীবক স্বীয় উদ্যানে একটি বিহার নির্ম্মাণ করিয়া উহা বুদ্ধদেবকে উপহার দিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের পরিচর্য্যা করিবার সুযোগ পাইয়া তিনি নিজেকে কৃতার্থ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তাঁহার রোগযন্ত্রণা যে দূর করিতে পারিয়াছিলেন—ইহাকেই তিনি বিদ্যাশিক্ষার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার বলিয়া মনে করিতেন।

জীবক, বুদ্ধদেবের নিকট বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। গুরু এবং গুরুর ধর্ম্ম এই উভয়কেই তিনি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা করিতেন। তাই বুদ্ধদেবের জীবনী পর্য্যালোচনা করিতে গেলে জীবকের নাম স্বভাবতঃই আসিয়া পড়ে। আবার বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস চর্চ্চা করিতে গেলেও জীবকের নামোল্লেখ না করিলে চলে না।

এস্কিমো ও তাদের ছেলেমেয়ে

শ্রীভীমাপদ ঘোষ, এম. এ.

"চুপ! চুপ! গোলমাল ক'রো না। দেখলে ত কালোপালিং কেমন ক'রে ছেলেটাকে ধ'রে নিয়ে গেল! কালোপালিং দাঁত বের ক'রে 'বি বি' করে, ছেলেমেয়েদের তাড়া ক'রে আসে! তোমরা এই গল্প শুনলে সবাই ভয়ে জড়সড় হ'য়ে যাবে; তার চাইতে ঐ বুড়ো দাঁড়কাকের গল্পটা খুব ভাল। বুড়ো দাঁড়কাকটার কি বুদ্ধি! সব পাখী ও প্রাণীকে ঠকিয়ে খেত! কেউ তার ফাঁকিবাজি ধরতে পারত না!"—বুড়ো দিদিমা ছেলেমেয়েদের নিয়ে এইরূপ নানাপ্রকার গল্প করছিলেন।

এদিকে মা সীলমাছের ঝোল চড়িয়ে দিয়েছেন। এখুনি বাবা, কাকা, দাদা—সবাই শিকার ক'রে বাড়ী ফিরবেন। তাই মা এখন খুব ব্যস্ত। সীলমাছের ঝোল রান্না হবার একটু পরেই শিকারীরা ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হ'য়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। ওভারকোট, জুতা প্রভৃতি প্রদীপের আলোতে শুকোতে দিয়ে সবাই খেতে ব'সে গেলেন। প্রথমে

একটি শিঙের পাত্রে ক'রে সবাই মিলে একটু ঝোল নিলেন। একটু ঝোলে বাবার কি হবে! তাঁর এত ক্ষিদে পেয়েছে যে, তিনি একখণ্ড বড় কাঁচা মাংস নিয়ে মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে তাই চিবোতে লাগলেন! এস্কিমোরা সীলমাছ ধ'রে চামড়া ছাড়িয়ে ফেলে' প্রথমে তার চর্ব্বি ও পরে কাঁচা মাংস খায়। বড় বড় মাংসখণ্ড মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে কতকটা মাংস ছুরি দিয়ে কেটে নেয়। ওরা এত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে মাংস কাটে যে, মনে হয় বুঝি নাকই কেটে ফেলবে, কিন্তু নাক ওরা কখনও কাটে না। এস্কিমো কথার অর্থ—কাঁচা মাংসখোর লোক; একথাটা বোধ হয় তোমরা জান।

পাথরের প্রদীপে ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে। সীলমাছের চর্ব্বি তেলের কাজ করছে। আলোটি দেখতে ছোট, কিন্তু এতেই ঘরটি বেশ গরম হ'য়ে উঠেছে! বাইরের বাতাস কি ঠাণ্ডা! ঘরের বের হওয়া যায় না। পরদিন একজন ঘরের বাইরে গিয়ে দেখে শুনে এসে বললেন—"এইবার শিকারে যাওয়া যেতে পারে।" অমনি 'সাজ সাজ' রব প'ড়ে গেল। হারপুন, বল্লম, ছিপ, বঁড়শী, লাঠি প্রভৃতি সবই মেয়েরা এগিয়ে দিলেন। সীলমাছের চামড়ার কোট, ভালুকের চামড়ার কোট প্রভৃতি গরম জামা সব গুছিয়ে পরিষ্কার করা হ'ল। বাড়ীশুদ্ধ সবাই ব্যস্ত! আজ মস্তবড় শিকারের অভিযান হবে। এদিকে পুরুষেরা শ্লেজগাড়ীগুলো ঠিক করতে লাগলেন। বড় বড় লোমওয়ালা কুকুরে ওইগুলো টেনে নিয়ে যাবে। কুকুর ত নয় যেন সিংহের বাচ্চা! কি হিংস্র ওরা—অপরিচিত কাউকে দেখতে পেলে একেবারে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে!

একটি এস্কিমো পরিবার

ছেলেরা কতকগুলো কুকুর শ্লেজগাড়ীতে জুড়ে দিল। বাকী কতকগুলো ছাড়া থাকল; তা'রা দলের অগ্রবর্ত্তী হ'য়ে শিকারের সন্ধান করবে। যাক্ আয়োজন সব ঠিক

হ'লে বাড়ীর বালকেরা ও কর্ত্তারা শিকারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। মেয়েরা হাড়ের সূচ দিয়ে সীলের চামড়া, ভালুকের চামড়া ইত্যাদি দিয়ে নানাপ্রকার কোট, পেণ্টালুন প্রভৃতি তৈরী করতে লাগলেন।

এদিকে শিকারীরা সমস্তদিন ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বড় শিকার কিছুই মিলছে না। দ্বিপ্রহর হ'য়ে এল। শীঘ্র সূর্য্য অস্ত যাবে, কিন্তু তা যাক্। তারা, চাঁদ ও উত্তরের আলোতে দিনের মতই হ'য়ে থাকবে। বিকেলবেলায় ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা এক শিকারের সন্ধান পেলেন। একটি কুকুর চুপ ক'রে একটা গর্ত্তের মুখে দাঁড়িয়ে আছে! কারণ সীল-মাছ ঐ গর্ত্তের ভেতর লুকিয়ে আছে। গর্ত্তের মুখে বরফ প'ড়ে যাতে একেবারে বন্ধ হ'য়ে না যায় এইজন্য মধ্যে মধ্যে গর্ত্তের মুখের কাছে এসে সীল-মাছ জোরে নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে যায়। গর্ত্তগুলো এমন প্রছন্নভাবে বরফের মধ্যে লুকান থাকে যে, শিকারীরা তার সন্ধান আদৌ পায় না। দক্ষ ও শিক্ষিত কুকুর তার ঘ্রাণ ও বোধ-শক্তির সাহায্যে শিকারীকে এই বিষয়ের সন্ধান দেয়। এক দক্ষ শিকারী যন্ত্রপাতি ঠিক ক'রে চুপ ক'রে গর্ত্তের মুখে ব'সে থাকলেন। গোলমাল করলেই সীলটা টের পাবে। অনেকক্ষণ ব'সে থাকার পর শিকারী তাঁর হারপুন ছুড়ে মারলেন। সীলটা দৌড়ে গর্ত্তের মধ্যে ঢুকল, কিন্তু অস্ত্র তার দেহে আমূল বিদ্ধ হয়েছিল। শিকারী তখন হারপুনের দড়ি ধ'রে টানতে লাগলেন। অন্য শিকারীরাও তাঁকে সাহায্য করতে ছুটলেন।

সীলমাছ শিকার

মস্ত সীলমাছ ধরা পড়েছে। যাত্রা আজ সফল হয়েছে। আজ ত বাড়ীতে মস্ত ভোজ! কুকুরগুলোরও কি আনন্দ! তা'রাও ত মাংসের ভাগ পাবে।

বাড়ী ফিরে এসে শিকারীরা বরফের ঘরে বিশ্রাম করতে লাগলেন। বরফের ঘরগুলো গরম। শিকারীরা গায়ের জামা, বুট প্রভৃতি খুলে ফেলে দিলেন। মেয়েরা

ঐগুলো প্রদীপের ওপর রেখে শুকোতে লাগলেন। বুটগুলো ঝাড়া হ'ল এবং নরম করবার জন্য চামড়ার ওপর পাথর দিয়ে কিছুক্ষণ ঠোকা হ'ল। তারপর জুতোর শুকনো চামড়া মেয়েরা কামড়ে কামড়ে আরও নরম ক'রে দিলেন। ··· ···

ঐদেশে এত শীত যে, আমরা যদি এক ডজন কোট ও পায়জামা প'রেও সেখানে যাই ত জমে' যাব। ঐদেশের লোকেরা কিন্তু ফ্যাসানের ধার ধারে না। ওদের কোট বা পায়জামা দেখতে বিশ্রী, কিন্তু শীত নিবারণ করে। একটা লোমওয়ালা কোটের লোমের দিকটা দেহের ওপর দিকে পরে ও আর একটা লোমওয়ালা কোটের লোম বাইরের দিকে দিয়ে পরে। পায়জামার নীচের দিকটা বুটের মধ্যে ভরা থাকে। পুরুষ ও মেয়ের পোষাক প্রায় একই রকম। মেয়েরা ত বুটের ফাঁকে কত জিনিস রেখে দেয়। এই হ'ল তাদের পকেট। মেয়েরা আমাদের মত ছেলে কোলে নেয় না, তাদের পিঠে ক'রে নিয়ে বেড়ায়।

'কিয়াক' নৌকো

আমাদের দেশের গ্রীষ্মকালে ও ঐদেশের গ্রীষ্মকালে আকাশ-পাতাল তফাৎ। গ্রীষ্মকালেও সেখানে হাড়ভাঙ্গা শীত; কিন্তু তাও ক্ষণস্থায়ী। সেই সময় ওরা কিছুদিন তাঁবুতে বা মাটির ঘরে থাকে। তখন সকলে 'কিয়াক' নামক নৌকোয় চ'ড়ে শিকার ক'রে বেড়ায়। ছেলেমেয়েরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচে—কিছুদিন বাইরে খেলা-ধূলা করতে পায়। সেই সময় কিছুদিন চব্বিশ ঘণ্টাই সূর্য্যদেব কিরণ দেন। রাত্রি নেই, সে কি মজা!

কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার প্রচণ্ড ভাবে বরফ পড়তে সুরু হয়। সে-দেশের বয়স্ক লোক ত দূরের কথা, ছেলেমেয়েরাও আদৌ তা'তে ভীত হয় না। ওরা যে তুষারময় দেশের অধিবাসী এস্কিমো।

আগমনী

শ্রীনিত্যধন ভট্টাচার্য্য, এম. এ., বি. এল., কাব্য-সাংখ্যতীর্থ

ঝাপ্‌সা মেঘের আঁধার টুটেছে,
থেমেছে অঝোর বৃষ্টি-ধারা,
পূরবীয়া বায়ু ভুলে গেছে পথ,
নিভেছে বিজলী দৃষ্টি-হারা।

কেয়া-কদমের গরব ফুরালো,
কুরচি ঝরেছে গাছের তলে,
কচি ধানগুলি মাথা তুলাইছে
গলায়-গলায় মাঠের জলে।

মেঘ-মহলের পরদা গুটিয়ে
সাত-রঙা রামধনুর ডোরে,
শারদ-রবির সোনালী কিরণ
উজলি' উঠেছে আজকে ভোরে।

ভিজা শ্যাম ঘাসে লতাপল্লবে
ছড়ানো শারদ-রবির সোনা,—
সবুজে ও পীতে—সোনা-মরকতে
প্রকৃতি-রাণীর আঁচল বোনা।

জলে ভরা নদী,—ধানে ভরা মাঠ,—
সোনার আলোয় আকাশ ভরা,
জ্যোছনায় ধোয়া নিশার কালিমা,
বাতাসে শীতল শিশির ঝরা।

রবিকর লাগে ধরণীর গায়—
স্বরগের বাণী মরতে আনে ;
কোন্ দেবতার স্নিগ্ধ আশিস্
জাগে রূপে-রসে-গন্ধে-গানে।

কার চরণের অর্ঘ্য লাগিয়া
ফোটে শতদল সরসী-বুকে,
বনের নিভৃতে অপরাজিতাটি
ফোটে চুপি চুপি সলাজ মুখে।

কিসের আবেশে রজনী না যেতে
আঙিনা বিছায়ে শেফালী ঝরে !
আকাশে-বাতাসে কোন্ দেবতার
না-জানা প্রসাদে হৃদয় ভরে।

রবি-শশী যাঁর স্নিগ্ধ নয়ন,
সমীরণ যাঁর স্নেহের দান,—
প্রাণে প্রাণে বাজে সেই দেবতার
শুভাগমনের মধুর তান।

জগৎ-জননী আসিয়াছেন,—আজি
এত আয়োজন তাঁহারি তরে ;
নিখিল হিয়ার সাথে সাথে এস
প্রণমি তাঁহার চরণ-'পরে।

বিয়ে বিষক্ষয়

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম. এ.

কাঞ্চননগরের অশোক সেনকে এযুগের অভিমন্যু বলা যেতে পারে। তফাৎ শুধু এই যে, অভিমন্যু মাতৃগর্ভে থেকে শিখে এসেছিলেন যুদ্ধ, আর অশোক শিখেছে অভিনয়, অর্থাৎ যাকে বলে অ্যাক্‌টিং। একমাস যখন তার বয়েস, দেখা গেল সে হাত-পা ছোড়ে তাল রেখে, হাসে কাঁদে নাটকের সুরে, আর মুখের ওপর এমন সব ভাব ফুটিয়ে তোলে, সেটা ডগ্‌লাস্ ফেয়ারব্যাঙ্ককেও হার মানাতে পারে। এই সব দেখেই তার ছোটমামা বাজি রেখে বলেছিলেন—"এ ছেলে যদি বেঁচে থাকে, শিশির ভাদুড়ীর নাম ডোবাবে; তোমরা দেখে নিও।"

মামার কথা মিথ্যা হয় নি। বছর পনের-ষোল যেতে না-যেতেই অশোক একজন মস্তবড় অভিনেতা হ'য়ে উঠল। তার ঢেউ-খেলান কোঁকড়া চুল সাপের ফণার মত নেমে এল ঘাড়ের ওপর; কাঁধে-বোতাম পাঞ্জাবীর ঝুল থামল গিয়ে হাঁটুর নীচে। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা হ'লে তোমরা যেখানে বল,—'এই, কেমন আছিস্?' অশোক তেমন স্থলে তার গলাটাকে মধুর ক'রে বলে—'হে বন্ধু, আছ ত ভাল?'

এমনি যখন অবস্থা, তখন একদিন অশোকের বাবা ব্রজেন্দ্রবাবু হঠাৎ বাড়ী ফিরলেন। গুজব রটেছিল, তিনি পাঁচ বছর আসামের জঙ্গলে কাঠের ব্যবসা ক'রে একেবারে লাল হ'য়ে এসেছেন। কিন্তু বাড়ী যখন এলেন তখন দেখা গেল, তিনি একজন কালো ভদ্রলোক, মাথার চুল সাম্‌নে পিছনে সমান ক'রে ছাঁটা, মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, জমকাল গোঁফ নীচের ঠোঁট ঢেকে দিয়েছে। পরণে মোটা কাপড়, গায়ে মার্কিনের হাফ-সার্ট। ব্যাপার দেখে অশোক একটু দূরে দূরে বেড়াতে লাগল।

দু'দিন পরের কথা। দুপুরবেলা ঘণ্টা তিনেক ঘুমিয়ে উঠে, গড়গড়ার নল হাতে নিয়ে ব্রজেন্দ্রবাবু অশোককে ডেকে পাঠালেন। অশোক ধীরে ধীরে দরজার সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। ব্রজেন্দ্রবাবু একবার চোখ তুলে নিয়েই বললেন—"অশোককে ডেকে দাও।"

অশোক বলল—"আজ্ঞে, আমি এসেছি।"

ব্রজেন্দ্রবাবুর হাত থেকে নলটা প'ড়ে গেল; চমকে উঠে বললেন—"অ্যাঁ, তুমি! যাও, সেমিজটা ছেড়ে এস।"

অশোক বলতে যাচ্ছিল—"আজ্ঞে, এটা সেমিজ নয়, পাঞ্জা—"

—"হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি; ছেড়ে এস, আর নিধে ব্যাটাকে ডেকে দাও।"

নিধে আসতেই হুকুম হ'ল—নাপিতকে ডেকে দেবার জন্য। আধঘণ্টার মধ্যেই নাপিত এল এবং সেই অবেলায় অশোকের থিয়েটারী চুলের বোঝা উড়ে গিয়ে, মাথাটা হ'য়ে দাঁড়াল কদমফুল! পাঞ্জাবীগুলোও দর্জ্জির বাড়ী ঘুরে এসে হ'য়ে গেল বেঁটে, খাট হাফ-সার্ট।

ব্রজেন্দ্রবাবু চোখ তুলে বললেন—"অশোককে ডেকে দাও"

সে-রাত্রে অশোক না খেয়েই শুয়ে পড়ল। মা এলেন বোঝাতে—হাত ধ'র বললেন—"চল, খাবি চল।"

অশোক নাটকের সুরে বলল—"মা, মানুষের জীবনে এমন জিনিস আছে যেটা অন্নের চেয়েও বড়; সেটা হচ্ছে আদর্শ। তাই যদি না রইল, তুচ্ছ অন্ন না হ'লেও চলবে।"

গভীর রাত্রে অশোক যেন স্বপ্নের ঘোরে দেখতে পেল, তার মা শিয়রে ব'সে ডাকছেন—'আয় বাবা, দুটো খাবি আয়।' ভীষণ রোষে তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল ছন্দ—

"ভাত নাহি খাব আমি
ধরিয়াছে মাথা,
যাও মাতঃ, বিরক্ত ক'রো না মোরে।"

এই গর্জ্জন পাশের ঘরে তার বাবার কানে গিয়ে পৌঁছল। তিনি সমস্ত রাত না ঘুমিয়েই কাটালেন এবং ভোর না হ'তেই সহরের সব চেয়ে বড় ডাক্তারকে ডেকে পাঠালেন। ডাক্তার এসে অশোকের আপাদমস্তক পরীক্ষা করলেন। বুকে ষ্টেথিস্কোপ, বগলে থার্ম্মোমিটর ইত্যাদি লাগিয়ে, নাড়ি ধ'রে, পেট টিপে, পিঠ ঠুকে বললেন—"মাথাটা ওপেন (open) করতে হবে।"

ব্রজেন্দ্রবাবু চমকে উঠে বললেন—"বলেন কি?"

—"হ্যাঁ, মাথার খুলিটা খুলে, বাঁ-দিকে গোটা দুই স্ক্রু ঢিলে হ'য়ে আছে, সে-দুটোকে একটু এঁটে দিতে হবে।"

ব্রজেন্দ্রবাবু বললেন—"বাঁচবে তো?"

ডাক্তার একটু হেসে তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন—"তা বলা যায় না। নাও বাঁচতে পারে। তবে অসুখ সেরে যাবে।"

অশোকের বাবা তা'তে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু মা কান্নাকাটি সুরু করলেন। ফলে, অপারেশন হ'ল না। তার বদলে স্থির হ'ল, অশোক আপাততঃ তার বাবার সঙ্গে আসামের জঙ্গলে গিয়ে কাঠের কারবারে হাত পাকাবে। অশোকের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল, কিন্তু তার বাবার সঙ্কল্প ভাঙ্ল না। ··· ···

বনের পর বন চ'লে গেছে। যতদূর দেখা যায়, শাল আর সেগুনের সারি। সেইদিকে চেয়ে অশোকের চোখে জল এসে যায়। কিন্তু সে জল ফেলবার অবসর নেই। হুকুম বড় কড়া। ব'সে থাকবার উপায় নেই। ভোরে উঠেই যেতে হবে মাইল তিনেক দূরে, যেখানে কুলীরা গাছ কেটে কেটে স্তূপ ক'রে রাখছে। খেয়ে আবার বেরোতে হবে—নদীর ঘাটে, যেখানে বড় বড় নৌকো বোঝাই ক'রে সেই গাছ চ'লে যাচ্ছে দেশ-বিদেশের বন্দরে। এর পর আছে মিস্ত্রীখানা এবং রাত্রে লম্বা হিসাবের খাতা।

মাঝে মাঝে অশোকের মন বিদ্রোহ ক'রে ওঠে—মরিয়া হ'য়ে বলে—"আর পারি না।" এমনি একদিন,—শালের বনে নেমেছিল অকাল-বর্ষণ। মেঘে আকাশ ছিল ঘেরা, আর নদীর জলে ঢেউ উঠেছিল ক্ষেপে। অশোক বনের ধারে দাঁড়িয়ে কুলীদের কাজ দেখছিল। হঠাৎ তার কি মনে হ'ল; চিৎকার ক'রে ডাকল—"সর্দ্দার!"

সর্দ্দার এগিয়ে এলে অশোক বলল—"বাড়ী চ'লে যা। তোদের আজ ছুটি।"

কিছুক্ষণ পরেই সরকার মশাই এসে বললেন—"এ করেছেন কি? বাবু যে একেবারে খেয়ে ফেলবেন! অনেক টাকা লোকসান হ'য়ে যাবে।"

"টাকা!"—অশোকের ঠোঁট দুটো কুঁচকে উঠল ঘৃণায়। হাত মুঠো ক'রে গর্জ্জে উঠল— "টাকা! সে টাকা চাই না সরকার মশাই, মানুষের হাড় গুঁড়িয়ে যার জন্ম।"

কথাটা কর্ত্তার কানে গেল, তিনি চুপ ক'রে রইলেন। সেই রাত্রে অশোকের টেবিলের ওপর পাঁচখানা বড় বড় খাতা এসে গেল এবং বাবা জানিয়ে গেলেন—"হিসেবগুলো সকালেই চাই।"

হিসাব যখন শেষ হ'ল, রাত দুটো বেজে গেছে। বাইরে শালের বনে তখন চলেছিল অবিশ্রান্ত অকাল-বর্ষণ।

এই ঘটনার দিন তিনেক পরে ব্রজেন্দ্রবাবু ঘুম থেকে উঠে দেখলেন, অশোকের ঘর খোলা— অশোক নেই। জিনিসপত্র সব যেমনটা তেমনি আছে, শুধু কয়েকখানা নাটক নেই। দিন গেল, রাতও গেল। অশোক ফিরল না। ব্রজেন্দ্রবাবু ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন। চারদিকে খোঁজাখুঁজি চলল; কোন ফল হ'ল না। বাড়ীতে চিঠি লেখা হ'ল। উত্তর এল—সেখানেও নেই। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে যাবেন, এমন সময় একজন লোক খবর নিয়ে এল যে, মাইল দশেক দূরে যে চা-বাগান আছে, তারই ক্লাবে অশোককে দেখা গেছে।

ব্রজেন্দ্রবাবু জিজ্ঞেস করলেন—"কি করছিল সেখানে?"

—"আজ্ঞে, থিয়েটারের মহড়া দিচ্ছিলেন। দাদাবাবু এমন সুন্দর অ্যাক্‌টো—"

—"চোপ রাও!"—ব্রজেন্দ্রবাবু গর্জ্জে উঠলেন।

সেই রাত্রেই হুকুম হ'য়ে গেল, ভোর না হ'তেই দশজন কুলী গিয়ে 'হতভাগাকে' ধ'রে নিয়ে আসবে। ছেলে যে একেবারেই যেতে বসেছে, তা'তে আর ব্রজেন্দ্রবাবুর সন্দেহ ছিল না। কবিরাজ মশায়ের সঙ্গে সেই কথাই আলোচনা করছিলেন। কবিরাজ সব শুনে বললেন—"দেখুন ব্রজেনবাবু, কলেরা-বসন্তের মত এই থিয়েটারটাও একটা ব্যাধি। এরও চিকিৎসা দরকার। আপনি যদি বলেন ত আমি একবার চেষ্টা করতে পারি।"

বাবা জানিয়ে গেলেন—"হিসেবগুলো সকালেই চাই।"

ব্রজেন্দ্রবাবু হতাশভাবে বললেন—"সে চেষ্টা কি আর না করেছি মশাই! কিন্তু মাথার খুলিটা না ভেঙে আর কিছু করা যাবে না।"

কবিরাজ বললেন—"ডাক্তাররা বলেছে ত? ওদের কথা ছেড়ে দিন। আমাদের পবিত্র আয়ুর্ব্বেদ যখন এখনও বেঁচে রয়েছে, তখন ওদের কাছে যাবার দরকারটা কি?"

—"আপনাদের আয়ুর্ব্বেদে এর কোন বিধান আছে নাকি?"

—"নিশ্চয়ই আছে। আয়ুর্ব্বেদে না আছে কি?"

—"তা' হ'লে একবার দেখুন। কি কি জিনিস লাগবে তার একটা ফর্দ্দ—"

—"আজ্ঞে, আপাততঃ কিছুই লাগবে না। ঐ থিয়েটারটা চুকে যাক।"

—"চুকে যাক! আপনি বলেন কি? এই আপনার চিকিৎসা!"—ব্রজেন্দ্রবাবু রুখে উঠলেন।

—"উত্তেজিত হবেন না। এ-ও আয়ুর্ব্বেদের বিধান—বিষে বিষক্ষয়! ঐ থিয়েটার দিয়েই থিয়েটারের বীজাণুকে মারতে হবে।" ... ...

জোর রিহার্সাল চলছে। চন্দ্রগুপ্ত অভিনয় হবে। ডিরেক্‌সন দিচ্ছে অশোক। চাণক্যের পার্টেও তাকেই নাবতে হবে। তার অ্যাক্‌টিং শুনে সাহেব ম্যানেজার পর্য্যন্ত মুগ্ধ হ'য়ে গেছেন। খাতির-সমাদর আদর-যত্নের আর অন্ত নেই। সেদিন রিহাসাল শেষ ক'রে অশোক সবে ক্লাবের বাইরে পা দিয়েছে; অমনি সাম্‌নে দেখে কবিরাজ মশাই। অশোক চমকে উঠল।

কবিরাজ মশাই তার পিঠ চাপড়ে বললেন—"সাবাস! তোমার অভিনয় দেখে দু'চোখ জলে ভ'রে গেছে, অশোক। মনে হচ্ছে—সেই বিশ্রুত-কীর্ত্তি মহাপণ্ডিত চাণক্যকে যেন চোখের ওপর দেখছি। কিন্তু বাবা, গলাটা আরও একটু গম্ভীর করতে হবে। অতবড় দার্শনিক—"

সেটা অশোকও বুঝতে পারছিল। চাণক্যের পক্ষে গলাটা তার একটু কোমল হ'য়ে পড়ছিল।

কবিরাজ মশাই বললেন—"কণ্ঠের গাম্ভীর্য্যকে বাড়াবার মত ওষুধ আমার কাছে রয়েছে।"

অশোক যেন হাতে স্বর্গ পেল; বলল—"দিন্ না আমাকে।"

—"নিশ্চয়ই দেব। কিন্তু আজ নয়। থিয়েটার সুরু হবার আধঘণ্টা আগে কয়েকটা বড়ি পর পর খেতে হবে।"

কবিরাজ ঐখানেই র'য়ে গেলেন। পরদিনই বোঝা গেল ক্লাবে একটা দল আছে—যারা অশোকের শত্রু। তাদের নেতা হচ্ছে রজত পুরকায়স্থ। তা'কেই হঠিয়ে অশোককে ডিরেক্টর করা হয়েছে; কিন্তু সে খুশী মনে হঠে নি। কবিরাজ মশাই পুরকায়স্থের সঙ্গে দেখা ক'রে গোপনে জানিয়ে দিলেন—"এ আর কেউ নয়—ব্রজেন সেনের ছেলে। পাঁচ-ছ' বছর আগে চা-বাগানের সঙ্গে একটা মামলায় ব্রজেন্দ্র হেরে যান। কে জানে তার ছেলে তার শোধ নিতে এসেছে কিনা? হয়ত থিয়েটারটাকে শেষ মুহূর্ত্তে পণ্ড করাই তার মতলব।"

কথাটা অনেকেরই মনে ধরল। একটা চাপা আন্দোলনও হ'ল। কিন্তু সাহেব ম্যানেজার এক ধমকে সব থামিয়ে দিলেন।

তারপর, থিয়েটারের দিন এসে গেল। মস্ত বড় ষ্টেজ্। সিন্, ড্রেস্, পেণ্টার, ড্রেসার সব এসেছে কলকাতা থেকে। টাকা ঢালা হচ্ছে জলের মত। কুড়ি-পঁচিশ মাইল দূর থেকে দলে দলে লোক এসেছে—ছেলে, বুড়ো কেউ বাদ নেই। পিঠে চিড়ে আর গুড় বেঁধে গ্রামের চাষীরাও ভিড় কম করে নি। মহিলাদের দলটাও বেশ ভারী। অশোক তৈরি হচ্ছে। এতদিন যে সাধনা ক'রে এসেছে, আজ তার পরীক্ষা। আজকার সাফল্যের ওপর তার সমস্ত ভবিষ্যৎ দাঁড়িয়ে আছে। কবিরাজ মশাই দশ মিনিট অন্তর চায়ের সঙ্গে তাঁর বড়ি দিয়ে চলেছেন।

ড্রপ্ উঠে গেল। সেকেন্দরশাহ্ এলেন, আর এলেন তাঁর সেনাপতি সেলুকস। অভিনয় বেশ হচ্ছে। কিন্তু সেদিকে কারুর বিশেষ লক্ষ্য নেই। সকলের সাম্‌নে সাহেব ম্যানেজার এবং তাঁর পিছনে বিশাল জনতা সময় গুণছে—কখন চাণক্য আসবে—মহাপণ্ডিত চাণক্য।

অবশেষে সময় হ'ল—চাণক্য দেখা দিলেন। সমস্ত লোক হাততালি দিয়ে উঠল এবং পরমুহূর্ত্তেই অত বড় হল একেবারে স্তব্ধ হ'য়ে গেল। কিন্তু একি? এ যে শুধু মুখ নাড়ছে, হাত-পা চালাচ্ছে, কথা ত বলছে না! অশোক দাঁত মুখ খিঁচিয়ে প্রাণপণে চিৎকার করছে, কিন্তু স্বর ফুটছে না। আর একবার সমস্ত জোর দিয়ে চেষ্টা করল—চোখ দুটো যেন ঠিকরে পড়ছে, মুখ রক্তবর্ণ; কিন্তু কথা বেরোল না। গলা দিয়ে শুধু একটা সাঁই-সাঁই আওয়াজ ফুটল, কেউ শুনতে

পেল না। এদিকে সমস্ত লোক অধীর হ'য়ে উঠছে। চিৎকার উঠল—"জোরে বলুন; লাউডার প্লিজ; শুনতে পারছি না।" কি করবে অশোক! তার মাথা ঝিম্-ঝিম্ ক'রে উঠল; গা দিয়ে দরদর ক'রে ঘাম ব'য়ে যেতে লাগল—কিন্তু গলা দিয়ে একটা শব্দও বেরোল না।

এইবার এগিয়ে এল পুরকায়স্থের দল। তা'রা আস্তিন গুটিয়ে চিৎকার ক'রে বলল—"বিশ্বাস-ঘাতক, বেরিয়ে যাও। Down with the Traitor! আমাদের থিয়েটার পণ্ড করতে এসেছে!" সঙ্গে সঙ্গে হৈ-হৈ ক'রে পাঁচশ' লোক উঠল রুখে। মেয়েরা যে যেদিকে পারলেন স'রে পড়তে লাগলেন। চিড়ে আর গুড় নিয়ে চাষীরা ভেগে পড়ল। ম্যানেজার বেগতিক দেখে চম্পট দিলেন।
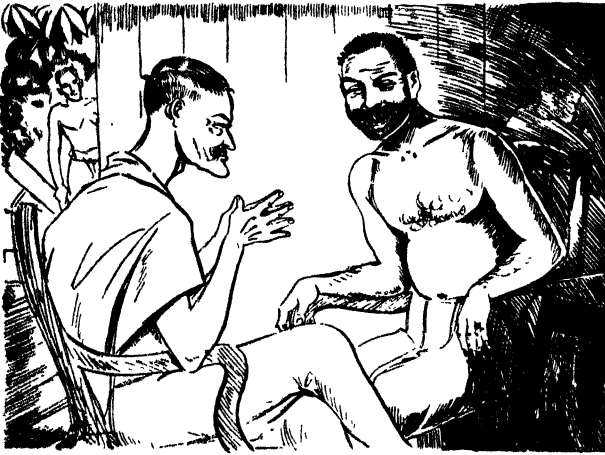
পুরকায়স্থের দল এগিয়ে চলল ষ্টেজের দিকে—চেয়ার ভেঙে, আলো ভেঙে—অশোককে ধরবার জন্যে। চারদিকে ভীষণ অন্ধকার। সেই সুযোগে অশোক তার প্রাণ নিয়ে কোনরকমে হলের বাইরে এসে দাঁড়াল এবং এদিক ওদিক চেয়ে সোজা ছুটতে আরম্ভ করল। যতক্ষণ গোলমাল শোনা গেল, ততক্ষণ সে নিঃশ্বাস নিতেও একবার থামে নি।

দিন পাঁচেক পরে ব্রজেন্দ্রবাবু আর কবিরাজ মশাই ব'সে আলাপ করছেন। দু'জনেই বেজায় খুশী। অশোক পাশের ঘরে ব'সে খুব মন দিয়ে একটা 'এষ্টিমেট্' পরীক্ষা করছে। কাঠের কারবারটা বাড়িয়ে তুলতে হবে, তারই প্ল্যান্। ব্রজেন্দ্রবাবু সেদিকে একবার তাকিয়ে বললেন—"এই অসম্ভব কাণ্ডটা আপনি কেমন ক'রে করলেন বলুন ত?"

কবিরাজ মৃদু হেসে বললেন—"বিশেষ কিছুই না। শুধু কয়েক মাত্রা ব্যাঘ্রতিন্তিড়-বটিকা। গলা এমন বসল যে, কিছুতেই উঠল না।"

—"কি বললেন! কি বটিকা?"—ব্রজেন্দ্রবাবু বিস্মিত হ'য়ে বললেন।

—"ব্যাঘ্রতিন্তিড়; অর্থাৎ আপনারা যাকে বলেন বাঘা তেঁতুল।"

—"ওঃ, তাই নাকি!"—ব'লে ব্রজেন্দ্রবাবু হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন।

দু'চারজন চাকর ছুটে এল। কর্ত্তাকে এত জোরে হাসতে তা'রা কখনও দেখে নি।

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত

চল আমার পাঠক-পাঠিকার দল, সেই আদিম পৃথিবীর বুকে একবার ঘুরে আসি।

কল্পনা কর সেই পৃথিবী। এখন অবিশ্যি কোন মতেই কল্পন৷ ক'রে উঠ্‌তে পার্‌বে না—সেদিনকার পৃথিবীর অবস্থা কেমন ছিল! তবে একটু বল্‌ছি, শোন:—প্রথমেই জলময় পৃথিবী। যেদিকে চাও সমুদ্র আর সমুদ্র। তার পাশেই পৃথিবীর স্থলভাগ—মরুভূমির চেয়েও শূন্য ও রুক্ষ। সেখানে গাছ নেই, প্রাণী নেই—আছে কেবল বৃষ্টি আর বৃষ্টি, তার সাথে পাল্লা দিয়ে বইছে ক্ষ্যাপা হাওয়া সোঁ-সোঁ-সোঁ! স্থলের যেদিকে চাও—দেখ্‌বে কেবল উলঙ্গ পাথর আর বিশ্রী বালি!

এমনি ক'রে বহুদিন পৃথিবী একাকী সঙ্গিহীন সাথিহীন হ'য়ে কাটাল। তারপর সমুদ্রের জলে দেখা দিল প্রথম প্রাণের স্পন্দন—সাগুদানার মত প্রাণকোষ!

কোথাও সমুদ্রের বুকে সাগুদানার মত প্রাণকোষগুলো একা একা অসহায়ের মত ভেসে বেড়াত, আবার কোথাও হয়ত কতকগুলো একত্রিত হ'য়ে বাস কর্‌ত। তাদেরই কেউ কেউ হয়ত সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মধ্যদিয়ে বাঁচ্‌বার মত আহার পেয়ে, পুষ্ট হ'য়ে আকারে বেড়ে উঠ্‌ত। ঐ সাগুদানার মত প্রাণকোষগুলোকে বৈজ্ঞানিকেরা এক একটি 'সেল' (cell) বলেছেন।

আবার কতকগুলো একত্রিত সেল হয়ত অন্যগুলো হ'তে পৃথক্ হ'য়ে বিচিত্র জীবনযাপন করেছে এবং আত্মরক্ষার জন্য বালি ও চূণ দিয়ে কোটর বা বাসগৃহ তৈরী ক'রে বাইরের বিপদ-আপদ হ'তে সযত্নে নিজেদের রক্ষা করেছে। কালে তাদের ঐ সব বালি ও চূণ দিয়ে তৈরী বাসগৃহ সমুদ্রের তলদেশে গিয়ে জলের নীচে মাটির পলির মত পরতে পরতে জমে' পাহাড়ের সৃষ্টি করেছে!

কেউ কেউ বলেন—পৃথিবীতে প্রথম আবির্ভূত হয় উদ্ভিদ। আবার কারও কারও মতে—প্রাণিজগৎই পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের স্পন্দন আনে। তবে যতদূর

মনে হয় উদ্ভিদই হয়ত প্রথম দেখা দিয়েছিল; কেননা, প্রাণিজগৎকে উদ্ভিদের ওপর অনেকখানি নির্ভর কর্‌তে হয়। যা-হোক, প্রথম ঐ সাগুদানার মত অসহায় এককোষ (unicellular) প্রাণী পৃথিবীতে দেখা দেয় এবং তার থেকে ক্রম-বিবর্ত্তনে বহুকোষ প্রাণী ধীরে ধীরে জন্ম নিয়েছিল। কেমন ক'রে যে ধীরে ধীরে প্রাণিজগতে মেরুদণ্ডহীন প্রাণী দেখা দিয়েছিল তার ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া কষ্টকর। মেরুদণ্ডহীন ও মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে বর্ত্তমানে কত প্রকারের জীবজন্তু ও প্রাণী দেখ্‌তে পাই, হয়ত এরা সবাই কোন মূল প্রাণধারার বা প্রাণিবংশের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা।

স্পঞ্জ

বহুকোষ প্রাণীর মধ্যে হয়ত সর্ব্বপ্রথম 'সূর্য্য পোকা' (sun animalcula) পৃথিবীতে দেখা দেয়। ওদের বংশধরদের এখনও অনেক বদ্ধ জলাশয়ের মধ্যে কিল্‌বিল্‌ ক'রে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়।

তাদের পরে দেখা দিল স্পঞ্জ (sponges)। ওদেরই পরবর্ত্তী বংশধর হয়ত জেলিমাছ ও প্রবাল জাতীয় প্রাণী এখন সাগরের জলে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

স্পঞ্জ জাতীয় প্রাণী কিন্তু বেশী দিন সাগরের জলে ভেসে থাক্‌তে বা সাঁতরে বেড়াতে পার্‌ল না—দেহের ভারে ডুব্‌তে ডুব্‌তে সমুদ্রের তলায় গিয়ে আশ্রয় নিল এবং গাছের মত শাখা-প্রশাখা বাড়াতে লাগ্‌ল। গায়ের রং ছিল ওদের সবুজ শেওলার মত। সমুদ্রের তলায় বাস কর্‌তে কর্‌তে তাদের দেহের আকারে ও ব্যবহারে অনেক পরিবর্ত্তন দেখা দিল। সমুদ্রের তলদেশে এক জায়গায় তা'রা স্থির হ'য়ে থাকৃত। জলের মধ্যে নানাপ্রকারের খাদ্যবস্তু থাকে; সেগুলোকে তা'রা তাদের মুখের চারপাশের

সূক্ষ্ম শুঁড়ের মত অঙ্গ দিয়ে টেনে এনে মুখগহ্বরে প্রবিষ্ট করাত। তাদের বলা হ'ত সামুদ্রিক এ্যানিমোন জাতীয় প্রাণী। সেগুলো দেখ্‌তে অনেকটা ফুলের মত—নানা বিচিত্র রংয়ের। অনেক সময় ওই জাতীয় প্রাণীকে 'সামুদ্রিক পুষ্প'ও বলা হয়।

এভাবে সামুদ্রিক পুষ্প, স্পঞ্জ ও প্রবাল জাতীয় প্রাণী হাজার হাজার বছর ধ'রে পৃথিবীতে প্রাণধারার অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। ঐ জাতীয় প্রাণীদের মাথা

সামুদ্রিক পুষ্পের সৌন্দর্য্যে মাছ আকৃষ্ট হয়েছে

ছিল না—ছিল শুধু দেহ ও খেয়ে বাঁচ্‌বার জন্য মুখগহ্বর। ওদের দেহে রক্ত ব'লেও কোন জিনিস ছিল না।

অতীত যুগে সমুদ্রের তলদেশ বড় বড় 'তারামাছ', 'সামুদ্রিক কোকনদ' প্রভৃতিতে ভ'রে থাক্‌ত। তারপর সমুদ্রের জলে দেখা দিল ঝিনুক জাতীয় প্রাণী ও সামুদ্রিক বিছা। ঝিনুক জাতীয় প্রাণীরা আবর্ত্তনের সাথে সাথে হয়ত একদিন ডাঙ্গায় গিয়ে উঠেছিল; কেমন ক'রে, তা কে জানে? ওদেরই বংশধর হয়ত সমুদ্র-দানব—অক্টোপাস্‌ এবং কাটল মাছ ও শামুক জাতীয় প্রাণী। আজ তা'রা পারাপার-হীন নীল সাগরের অতল-তলে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

ডাঙ্গার প্রাণী ও জলের প্রাণীর মধ্যে প্রধানতঃ দুটি প্রভেদ বর্ত্তমান। ডাঙ্গার প্রাণীদের শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য বাতাস থেকে অক্সিজেন নিতে হয়, তাই ফুস্‌ফুস্‌ না হ'লে তাদের চলে না। তা ছাড়া তাদের চলা-ফেরার জন্য হাত-পায়ের দরকার। অবিশ্যি জলের প্রাণীরও বাঁচ্‌তে হ'লে অক্সিজেনের দরকার এবং সেটা তা'রা সংগ্রহ করে জল থেকে। তোমরা হয়ত জান যে, জলের মধ্যেও অক্সিজেন আছে এবং ঐ জল হ'তে অক্সিজেনটা তা'রা সংগ্রহ করে ফুল্‌কোর সাহায্যে। আর তা'রা এক জায়গা হ'তে অন্য জায়গায় চলাচল করে ডানার সাহায্যে।
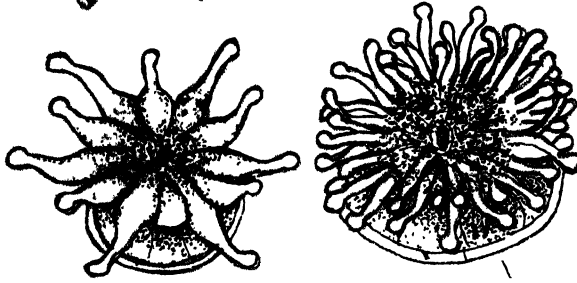
সামুদ্রিক এ্যানিমোন থেকে প্রবালের উৎপত্তি

ডানা থেকে পা ও ফুল্‌কো থেকে ফুস্‌ফুস্‌ হওয়া খুব একটা কঠিন ব্যাপার নয়। জলের প্রাণীকে ডাঙ্গায় উঠ্‌তে ডানার বদলে পা ও ফুল্‌কোর বদলে ফুস্‌ফুসের উদ্ভাবন কর্‌তে হয়েছিল। কেমন ক'রে কি ভাবে যে সেটা সম্ভব হয়েছিল তা অবিশ্যি সঠিকভাবে জানা যায় না। মধ্যযুগে সৈনিকেরা যেমন ভারী ভারী চর্ম্মে নিজেদের ঢেকে রাখ্‌ত, তখনকার যুগের জলের কোন কোন মাছও তাদের সর্ব্বাঙ্গ পুরু খোলসে ঢেকে রাখ্‌ত এবং ঐ জাতীয় মাছের শরীরেই হয়ত প্রথম পট্‌কা গোছের একটা অঙ্গ গড়ে' ওঠে। সেই পট্‌কা থেকেই আধুনিক প্রাণীদের ফুস্‌ফুসের সূত্রপাত।

জেলিমাছ ও তারামাছ

বৈজ্ঞানিকেরা কল্পনা করেন, হয়ত অতীতে কোন একদিন হঠাৎ কোন এক অগভীর

জায়গায় জল গেল শুকিয়ে। সেখানে যেসব জলচর প্রাণী ছিল তাদের দারুণ দুর্দ্দশা দেখা দিল; জলের মধ্যে বাঁচ্‌বার মত খাদ্য পায় না, পরিমাণ মত অক্সিজেন পায় না—অথচ জল ছেড়ে ডাঙ্গায়ও উঠ্‌তে পারে না। কেননা শরীরটা তাদের এমনভাবে তৈরী যে, জল ছেড়ে উঠ্‌লেই মৃত্যু অনিবার্য্য! সেই সময়েই হয়ত হাঙ্গর জাতীয় কোন কোন মাছের মধ্যে পট্‌কা উদ্ভাবনের প্রেরণা জেগেছিল এবং শরীরটাকে বাইরের আবহাওয়া ও বিপদ-আপদ হ'তে বাঁচাবার জন্য শরীরের ওপর হাড়ের বর্ম্ম গড়ে তুলেছিল। এ ব্যাপারটা হয়েছিল আনুমানিক ত্রিশ কোটি বছর আগে। আবার কেউ কেউ বলেন—ঝিনুক আগে ডাঙ্গায় উঠেছিল, এবং বাইরের বিপদ-আপদ হ'তে আপনাদের বাঁচাবার জন্য তাদের দেহের ওপরে অমন শক্ত খোল গড়ে' ওঠে। অতীতের সাগর-জলে আজকালকার হাঙ্গরের জ্ঞাতি এক জাতের অস্থিবহুল মাছের সন্ধান পাওয়া যায়। ক্রমে যত দিন যেতে লাগ্‌ল, কাঁকড়া, ঝিনুক ও বর্ম্মপরা হাঙ্গর জাতীয় মাছ ডাঙ্গা ছেয়ে ফেল্‌ল। ধীরে ধীরে তাদের দেহে মেরুদণ্ড সৃষ্টি হ'তে সুরু কর্‌ল; শরীরের নানা অংশ পরিবর্ত্তিত হ'য়ে দেহের ভার রক্ষার উপযোগী শক্ত হাড়ের আকার ধারণ কর্‌তে লাগ্‌ল।

অক্টোপাস

ক্রমে পৃথিবীতে আর এক ধরণের প্রাণী—যেমন, পোকা-মাকড় ইত্যাদি দেখা দিতে সুরু করে। তাদের দেহেই প্রথম ফুস্‌ফুসের সূত্রপাত হয় টিউবের মত হ'য়ে।

তারপর এল আরশুলা। এদিকে উদ্ভিদ্-জগতেও সে-সময় অনেক পরিবর্ত্তন

হয়েছিল এবং পোকা-মাকড় হ'তেই উচ্চিংড়ে জাতীয় পোকা দেখা দিল। তা'রা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াতে সুরু কর্‌ল। ডাঙ্গার প্রাণীর সম্ভবতঃ সেই প্রথম হাঁটা সুরু হ'ল। ওই পোকাগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে এখানে ওখানে বেড়াত আর তাদের শুঁড়ওয়ালা পা ডানার গায়ে ঘষে' একপ্রকার অদ্ভুত শব্দ কর্‌ত—প্রাণিজগতে তখনই বোধ হয় শব্দের প্রথম সৃষ্টি হয়। পৃথিবীতে সে-সময় নানারকম পরিবর্ত্তন আসে এবং সেই ওলট-পালটে
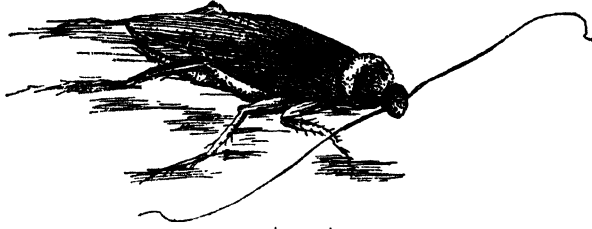
আরশুলা

অনেক প্রাণী টিকে থাক্‌তে পার্‌ল না—মৃত্যুকে বরণ ক'রে নিল। ডাঙ্গার প্রাণীরা তখন লাফালাফি ক'রে ডাঙ্গাকে শব্দ-মুখর ক'রে তুলেছে; জলে যারা তখন থাকৃত তা'রা কিন্তু ঐ সব সহ্য কর্‌তে পার্‌ত না, তাই সব সময়ই স্থলচর প্রাণীদের বিষ নজরে দেখ্‌ত। জলের কাছে উচ্চিংড়েরা লাফিয়ে এলেই আর রক্ষে ছিল না—জলের মাছ এগিয়ে গিয়ে খপ্ ক'রে তাদের খেয়ে ফেল্‌ত। শিশু যেভাবে প্রথম হাঁট্‌তে শিখে, সেইভাবে এগিয়ে যেতে যেতে, জলের কোন কোন মাছ হয়ত হাঁট্‌তে শিখ্‌ল। যখন মাছ হাঁট্‌তে সুরু কর্‌ল, তাদের দেহের গঠন এবং আকারও সঙ্গে সঙ্গে বদলাতে লাগ্‌ল। ক্রমে হয়ত তাদের থেকেই
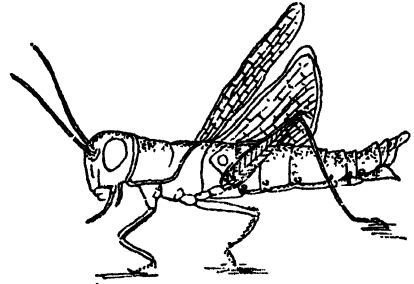
উচ্চিংড়ে জাতীয় পোকা

আদিম সরীসৃপের সৃষ্টি হয়েছিল। ব্যাঙজাতীয় প্রাণীর মধ্যে ওদের পূর্ব্বপুরুষের কতকটা আভাষ পাই—ওরা জলেও থাকে, স্থলেও থাকে। আদি সরীসৃপ জলে স্থলে দু'জায়গাতেই থাকৃত। আদিম সরীসৃপগুলো লম্বায় মস্ত মস্ত হ'ত—ছয় হ'তে দশ ফুট পর্য্যন্ত! ক্রমে তাদের মুখে শক্ত খাবার চিবিয়ে খাবার জন্য দাঁত জন্মাল। গায়ের চামড়া শক্ত হ'ল দেহকে বিপদ-আপদ হ'তে রক্ষা কর্‌বার জন্য, এবং হেঁটে বেড়াবার জন্য দেখা দিল পা।

সেই যুগের পৃথিবীর আর একটু পরিচয় দিয়েই এই প্রবন্ধ শেষ কর্‌ব। হঠাৎ কোন দিন আমরা যদি সে যুগে গিয়ে উপস্থিত হ'তে পার্‌তাম তবে দেখ্‌তাম ভিজে-ভ্যাপসা এক ঘন জঙ্গল ঢালু হ'য়ে অগভীর সমুদ্রে নেমে গেছে। সে জঙ্গলে আমাদের পরিচিত শাল, মহুয়া বা ফুল-ফলের গাছ নেই; আছে কেবল শেওলা জাতীয় একরকম গাছ আর বুনো গুল্মলতা। জঙ্গলে হাওয়া বইলে ধূলোর মত একপ্রকার

ক্রম-বিবর্ত্তনের ফলে জলচর থেকে স্থলচরের উৎপত্তি

রেণু চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সে জঙ্গলে যেসব প্রাণী দেখ্‌তে পাব সেগুলো ব্যাঙেরই সগোত্র, কিন্তু তাই ব'লে তা'রা সবাই তত ছোট নয়। কারও চেহারা বিশাল কুমীরের মত, কারও বা পেট মোটাগাটা, পা খাটো—বামনবীর! টিকটিকি বা সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীও আছে। শামুক আর ঝিনুকও হয়ত পাব। কিন্তু সে-বনে পাখী নেই, ফুল-ফল নেই, মৌমাছির গুঞ্জন নেই, প্রজাপতির রঙিন পাখার মনভোলান সৌন্দর্য্য নেই!

পাঠক, যাবে সে বনে? কী বল?···

কাঠবিড়ালী

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

কাঠবিড়ালি, কাঠবিড়ালি,
কাটুর কুটুর কুট্,—
লেজটি যেন চামর-কসা,
চোখ ছুটি ফুট্-ফুট্।
তুড়ুক ক'রে লাফিয়ে পড়ো,
এ ডাল থেকে সে ডাল ধরো,
আমাদেরি খোকার মত
কেবলই ঘুট্-ঘুট্,
কাঠবিড়ালি, কাঠবিড়ালি,
কাটুর কুটুর কুট্।

কাঠবিড়ালি, কাঠবিড়ালি,
কাটুর কুটুর কুট্,—
দিব তোমায় চীনের বাদাম,
ছোলা, মটর, বুট্;
ব'সে ছুটি পায়ের ভরে,
সমুখদিকের হাত দে' ধ'রে
কচি দাঁতে চিবিয়ে খাবে
মুটুর মুটুর মুট্,—
কাঠবিড়ালি, কাঠবিড়ালি.
কাটুর কুটুর কুট্।

কাঠবিড়ালি, কাঠবিড়ালি,
কাটুর কুটুর কুট্,—
কচি গাছের আতা আমার
সব ক'রেছ লুট্;
তবু তোমায় ভালবাসি,
বারে বারে দেখ্তে আসি,
আমায় দেখে সদাই তুমি
পালাও দিয়ে ছুট্,
কাঠবিড়ালি, কাঠবিড়ালি,
কাটুর কুটুর কুট্।

কাঠবিড়ালি, কাঠবিড়ালি,
চিঁকির চিঁকির চিঁক্,—
মাথা নেড়ে চোখ ঘুরিয়ে
দেখো সকল দিক্।
কুকুর যদি আসে তেড়ে,
উঠ্‌বে গাছে লেজটি নেড়ে,
কিচির মিচির ভাষায় তোমার
বক্‌বে তা'কে ঠিক্,
কাঠবিড়ালি, কাঠবিড়ালি,
চিঁকির চিঁকির চিঁক্। *

---

* অপ্রকাশিত রচনা হইতে

দিয়াশলাই

শ্রীপ্রতিমা ঘোষ

দিয়াশলাই বা দেশলাই আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিস, কিন্তু তাহার বিষয় আমরা খুব অল্পই খোঁজ রাখি।

আজ আমাদের আগুন জ্বালাইবার দরকার হইলে আমরা একটি দেশলাইয়ের কাঠির সাহায্যে অতি শীঘ্র এবং সহজেই আগুন জ্বালাইতে পারি। কিন্তু পূর্ব্বে মানুষ যখন এতটা সভ্য হয় নাই, তখন দেশলাই ছিল না। সেই যুগের লোকে পাথরে পাথরে বা কাঠে কাঠে ঘসিয়া আগুন জ্বালাইত। পরবর্ত্তী কালের লোকেরা, পাথরে ও লোহায় ঘসিলে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উঠিত, তাহা দ্বারা একপ্রকার চূর্ণে আগুন ধরাইত। আমাদের দেশে চূর্ণের বদলে সোলা ব্যবহৃত হয়। এই আগুন হইতে আবার গন্ধকের দেশলাই

পুরাকালে অগ্নি উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত চকমকি পাথর, কাষ্ঠখণ্ড প্রভৃতি

জ্বালা যাইত। চকমকি পাথরের বদলে আজকাল আগুন জ্বালাইবার নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর যন্ত্র তৈয়ারী হইয়াছে। পেট্রোল পাইপ লাইটার নামে একটি সুন্দর যন্ত্র আজকাল অনেকে ব্যবহার করেন।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত উপায়ে দেশলাই জ্বালান হইত। ওই সময়

ক্যাগনিয়ার্ড-ডি-লা-টুর নামে একজন ফরাসী ভদ্রলোক একপ্রকার দেশলাই আবিষ্কার করেন। ম্যাস্টিক্ ফস্‌ফরাস ও ফস্‌ফরাস অক্সাইড একটি বোতলের মধ্যে মিশ্রিত করিয়া রাখা থাকিত ও দেশলাইয়ের কাঠিটি তাহার মধ্যে ডুবাইয়া জ্বালিতে হইত। কিন্তু ঠিক দেশলাই বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা একজন ইংরাজ ভদ্রলোক বাহির করেন, তাঁহার নাম জন ওয়াকার। তিনি যে দেশলাই আবিষ্কার করেন তাহা ফস্‌ফরাস দ্বারা নির্ম্মিত ছিল না, পরন্তু কোন পাথরে বা অসমান জায়গায় ঘসিলেই তাহা জ্বালান যাইত।

কাষ্ঠখণ্ড হইতে 'স্লিলেট' বা পাতলা তক্তা তৈয়ারী হইতেছে

সেই সময় একশতটি দেশলাই-কাঠির দাম ছিল এক শিলিং। দোকানদারেরা প্রত্যেক কৌটা দেশলাইয়ের সঙ্গে এক টুকরা করিয়া শিরিস কাগজ দিত। ঐ শিরিস কাগজে ঘসিয়া দেশলাই জ্বালাইতে হইত।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সময় হইতে দেশলাই তৈয়ারী করিবার জন্য ফস্‌ফরাসের ব্যবহার আরম্ভ হয়। সেই সময় দেশলাইয়ের অনেক রকম নাম ছিল। এই দেশলাইগুলি বেশীক্ষণ রোদে থাকিলে জ্বলিয়া উঠিত। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চালান দিবার সময় গাড়ীর ঝাঁকানিতেও অনেক সময় সেগুলিতে আগুন লাগিয়া যাইত।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ হইতে যে দেশলাই তৈয়ারী হইতে লাগিল—তাহাতে আর সে ভয় ছিল না।

সেই সময় হইতে দেশলাইয়ের কাঠি বাক্সের পাশে ঘসিয়া জ্বালাইবার প্রথা প্রচলিত হয়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে দেশলাই-কাঠি শীঘ্র জ্বলিয়া যাইবার ভয় আরও কমিয়া গেল। দেশলাই-কাঠির গন্ধক আর যাহাতে সহসা জ্বলিয়া না যায় তখন হইতে তাহার ব্যবস্থা হইল।

এখন দেশলাই কলেই তৈয়ারী হয়। সবরকম কাঠের দ্বারা দেশলাই হয় না। আমাদের দেশে দেবদারু ও পিঠেলী এবং ইউরোপে পাইন ও এ্যাসপেন বৃক্ষের কাঠ
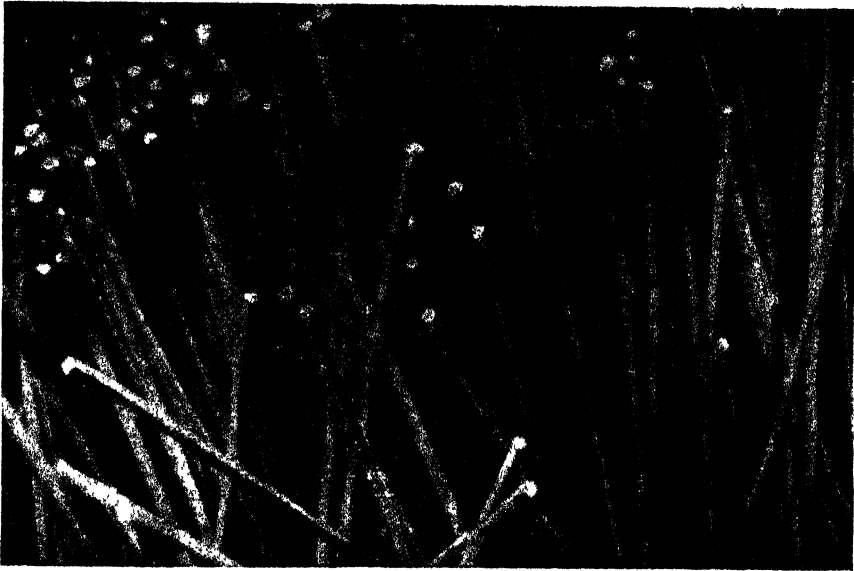
এই কাঠিগুলিই দিয়াশলাইর কাঠিতে পরিণত হইবে

দেশলাইয়ের কাঠির জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রথমে মোটা মোটা কাঠগুলির ছাল ছাড়াইয়া সেগুলিকে কলের সাহায্যে পাতলা পাতলা তক্তার মত করিয়া কাটা হয়। সেগুলিকে 'স্কিলেট' বলা হয়। স্কিলেটগুলিকে আঠার ইঞ্চি বা ছ'ফুট উঁচু করিয়া সাজান হয়। সেই অবস্থায় ঐগুলি আর একটি কলের মধ্যে যায় এবং সেখানে ছোট ছোট ছুরির দ্বারা দেশলাইয়ের কাঠির মাপে ঐগুলিকে কাটা হয়। তাহার পর আবার আর একটি কলের দ্বারা ছোট ছোট কাঠিগুলির ধুলা ঝাড়িয়া লওয়া হয়। কাঠিগুলি পরিষ্কার হইয়া একটি ফুটোওয়ালা কলের মধ্যে যায়, সেখানে ঐগুলি প্যারাফিনে ডুবাইয়া লওয়া

হয়। প্যারাফিনে ডুবানর পরেই উহাদের মাথাগুলি তৈয়ারী হইয়া যায়। সেখান হইতে অনেক ঘুরিয়া তবে কাঠিগুলি বাক্সে ভর্ত্তি হয়। বাক্সে ভর্ত্তি হইবার পূর্ব্বেই ইহাদের মাথাগুলি শুকাইয়া যায়। তাহার পরে তাহাদের উপরের খাপগুলি তৈয়ারী হইলে কলের সাহায্যেই দেশলাই প্যাক করা হইয়া যায়।

কল হইতে বাহির হইয়া দেশলাইগুলি গুদামে ও সেখান হইতে দেশ-বিদেশে চালান যায়। দেশলাই প্রস্তুতের প্রত্যেকটি কাজই কলে হয়, কিছুই হাতে করিতে হয় না।

দোয়াত ও কলম

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, এম. এ.

কবির লেখার ঘরে টেবিলের ওপরকার দোয়াতদানি দেখে একদিন একজন বল্‌ল—"এর ভেতর থেকে কি সমস্ত আশ্চর্য্য লেখা বেরিয়ে আসে, ভাব্‌তেই অবাক্ লাগে। এর পরে কি লেখা বেরিয়ে আস্‌বে কে জানে! সত্যিই আশ্চর্য্য!"

"ঠিক তাই," টেবিলের ওপরকার দোয়াতটা সেই সুরে সুর মিলিয়ে বল্‌ল—"ঠিক তাই। ব্যাপারটা এত আশ্চর্য্য যে, ধারণা করাই কঠিন। এ কথাই আমি বরাবর ব'লে থাকি।" টেবিলের ওপর অন্য যে সমস্ত জিনিস ছিল তা'রা যাতে শুন্‌তে পায় এই ভাবে একটু জোর দিয়েই সে কথাগুলো বল্‌ল, বিশেষ ক'রে তার নিকট-সঙ্গী পালকের কলমটা যাতে শুন্‌তে পায়। দোয়াত আবার বল্‌তে লাগ্‌ল—"আমার ভেতর থেকে যা বেরিয়ে আসে তা সত্যিই আশ্চর্য্য, বিশ্বাস করাই কঠিন। আমি ঠিক জানি না, এর পরে লোকটা যখন আমাকে নিয়ে কাজে বস্‌বে তখন কি লেখা ফুটে উঠ্‌বে। আমার থেকে এক ফোঁটা নিয়ে অনায়াসে সে আধপাতা লিখে ফেলে! আর তা'তে কি নেই? আমি এই সৃষ্টির পরমাশ্চর্য্য বস্তু। আমার ভেতর থেকে কবির সমস্ত রচনার জন্ম; সেই

সমস্ত জীবন্ত নরনারী. গভীর অনুভূতি, হাল্কা ঠাট্টা, প্রকৃতির আশ্চর্য্য রূপবর্ণনা, আরও কত কি! কি ক'রে যে এসমস্ত লেখা হয় তা আমি ভেবেই পাই না। কারণ, নিজেকে তো আমি জানি। আমি তো কৈ প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু জানি না। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি সমস্তই আমার ভেতর ছিল, আমি জানতুম না। আমার ভেতর থেকেই সেই সমস্ত সুন্দর রাজকন্যার জন্ম, আর সেই সমস্ত দুঃসাহসী রাজপুত্রের—যারা আগুনের মত তেজী ঘোড়ার পিঠে চ'ড়ে যুদ্ধে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু বিশ্বাস কর, কি ক'রে এরা আসে নিজেই আমি ঠিক বুঝ্‌তে পারি না। এদের কথা আমি খুব অল্পই ভেবে থাকি।"

"তোমার কথা খুবই সত্যি", পালকের কলমটা উত্তর দিল—"খুবই সত্যি। সত্যিই তুমি কখনো কিছু ভাব্‌বার চেষ্টা কর না। ভাব্‌লে দেখ্‌তে তোমার ভেতর থেকে যা বেরিয়ে আসে তা মহৎ কিছুই নয়, কেবলমাত্র খানিকটা তরল জিনিস—কালি। তুমি শুধু খানিকটা কালি দিয়ে আমাকে ভিজিয়ে দাও আর যা কিছু কাগজের ওপর ফুটে ওঠে তা আমারই কথা, আমার অনেক দিনের চিন্তার ফল। মন দিয়ে শোন, সত্যি কথাটা ব'লে রাখি; কলমই লিখে, অন্য কেউ নয়। এমন কাউকে দেখ্‌বে না যে আমার কথা অবিশ্বাস করে। আমার তো মনে হয় কাব্যজগতে একটা পুরোনো দোয়াতের যতটা প্রবেশ করার অধিকার, বেশীর ভাগ মানুষেরও ঠিক ততটাই—তার বেশী নয়।"

"অনেক কিছুই তোমার জানা আছে দেখ্‌ছি", দোয়াতটা খোঁটা দিয়ে উঠ্‌ল—"যদিও মাত্র সপ্তাহখানেক হ'ল তুমি কাজে বহাল হয়েছ এবং যদিও ইতিমধ্যেই আধ্যেকটা তোমার ক্ষয়ে' গিয়েছে—এতেই তুমি নিজেকে কবি ব'লে ভাব্‌ছো, না? তাজ্জব ব্যাপার! তুমি? তুমি তো নগণ্য চাকর ছাড়া আর কিছুই নও! এর আগে তোমার মত কত জনেই এল, কতজনেই গেল! কেউ এসেছিল তোমারই মত কুলীন হাঁসবংশ থেকে, কেউ বা বিলিতি কারখানা থেকে। পালকের আর ষ্টীলের, এই দুই জাতকেই আমার আর জান্‌তে বাকি নেই। আমার কাছে তোমার মত অনেকেই চাকর ছিল, অনেকেই থাকবে। যে লোকটা আমার হ'য়ে শুধু খাটে, পরের বার কি যে সে লিখ্‌বে সে কথাই শুধু ভাব্‌ছি।"

"মাথামোটা মুখ্‌খু একটা দোয়াত"—অস্পষ্ট স্বরে কলমটা বল্‌ল। ··· ···

অনেক রাত্রে কবি বাড়ী ফির্‌লেন। তিনি এক জায়গায় গানের মজলিশে গিয়েছিলেন। সেখানে বিখ্যাত এক বেহালা-বাজিয়ের বাজনা তিনি শুনেছেন এইমাত্র।

সেই আশ্চর্য্য সুরের আগুন তাঁকে জ্বালিয়ে দিয়েছে। সৃষ্টির অপূর্ব্ব বেদনায় তিনি উত্তেজিত। সেই অদ্ভুত শিল্পীর হাতের চাপে বেহালাটা বেঁচে উঠেছিল, কথা কয়েছিল! কখনো যেন সুরের ঝর্ণা থেকে অনেক ধরণের সুর আকাশে ছড়িয়ে পড়্ছিল—কখনো মুক্তোর মত এক এক ফোঁটা টুং-টাং জলের শব্দ যেন, কখনো যেন পাখীর ডাক, কখনো বা পাইন বন ছিঁড়ে-দেওয়া ঝড়ের উন্মত্ত গতি! কখনো কবির মনে হয়েছিল—তিনি বুঝি তাঁর নিজের অন্তঃকরণের কান্না শুন্‌তে পাচ্ছেন, কখনো বা মনে হয়েছিল, একটি কচি শিশু বুঝি ধীরে ধীরে নিঃশ্বেস ফেল্‌ছে। আর মনে হয়েছিল

বেহালার শুধু তারগুলোই কথা বলে নি, তার কান, তার স্ক্রু, তার সবকিছুই গান গেয়ে উঠেছে। খুব শক্ত সুর সে বাজিয়েছিল, কিন্তু এমন অদ্ভুত তার ক্ষমতা যে, বারবার মনে হয়েছিল তারের ওপর বেহালার ছড়টা যেন আলগোছে খেলা কর্‌ছে! আর কোনও অজ্ঞ সাধারণ লোক তাই দেখে হয়তো মনে করেছিল—ওটা এত সহজ যে, চেষ্টা কর্‌লে সে নিজেই ওরকম বাজাতে পারে। মনে হয়েছিল বেহালা আর ছড়টা নিজে থেকেই গান গেয়ে উঠ্‌ছে, শিল্পী যেন কেউই নয়। কিন্তু কবি আসল শিল্পীকে ভুলে যান নি; মনে মনে তাঁর নাম তিনি উচ্চারণ কর্‌লেন আর ছোট্ট একটা কাগজে লিখে নিলেন।

"যদি বেহালা আর ছড়টা আজ বুক ফুলিয়ে ওই আশ্চর্য্য সুরের জন্যে গর্ব্ব

করত তা হ'লে কি অসহ্যই না লাগত! কিন্তু তবুও এই মারাত্মক ভুল কত মানুষেই না করে। শিল্পী, কবি, আবিষ্কারক, যুদ্ধের অধিনায়ক—এরা সমস্ত প্রশংসাই নিজেরা নিতে চায়। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমরা কতকগুলো যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়; আমাদের এই যন্ত্রকে সেই আসল শিল্পী বাজাচ্ছেন। সমস্ত প্রশংসা শুধু তাঁরই প্রাপ্য। আমাদের নিজেদের গর্ব্ব করার কিছুই নেই।"—এই কথাগুলোই বারে বারে কবির মনে আনাগোনা করতে লাগল, আর ছোট্ট একটি রূপকথার ভেতর দিয়ে এই কথাগুলোকেই তিনি রূপ দিলেন; তার নাম হ'ল—'শিল্পী আর তাঁর যন্ত্র'।"

"হে রাজ্ঞি! আপনি কি শুনতে পেলেন?"—কবি উঠে' যেতেই ঠাট্টার সুরে কলমটা আরম্ভ করল; "আমি যা লিখলুম কবিকে তা পড়তে শুনলে তো? ঠিক তোমার উপযুক্ত শিক্ষা হয়েছে।"

"তবে যা আমি লিখতে দিয়েছিলুম তাই পড়তেই শুনেছি"—দোয়াতটা বলল: "তোমার গর্ব্বকেই আসলে আঘাত করা হয়েছে। ভাবতেই হাসি পায়, তোমাকে নিয়ে লোকে যখন ঠাট্টা-তামাসা করে তুমিই তা বুঝতে পারো না! তোমাকে খুব এক হাত নেওয়া গেছে!"

"তুমি একটি আস্ত গাধা"—কলমটা রেগে বলল।

"আর তোমাকে গরু বললেও গরুকে অপমান করা হয়"—দোয়াতটা পাল্টা জবাব দিল।

তা'রা দু'জনেই মনে মনে খুশী হ'ল এই ভেবে যে, যাক্—এমন বলা গেছে যে এর আর কোনো উত্তর নেই। দু'জনেই তর্ক-যুদ্ধে নিজেকে জয়ী ভেবে বেজায় খুশী হ'য়ে উঠল; আর মনের আনন্দে অল্পক্ষণের মধ্যেই তা'রা ঘুমিয়ে পড়ল।

কিন্তু কবির চোখে আজ আর ঘুম নেই। বেহালার ভেতর থেকে যে রকম অদ্ভুত সুরের ঝঙ্কার বেরিয়েছিল, তাঁর মন থেকেও সে-রকম আশ্চর্য্য কল্পনার জাল বেরিয়ে তাঁকে ঘিরে ফেলল। কখনো তা দামী টলটলে মুক্তোর মত সুন্দর, কখনো বা গভীর অরণ্যে উন্মুক্ত ঝড়ের মত বিক্ষুব্ধ। *

* একটি বিদেশী গল্প অবলম্বনে।—লেখক

কিং কং কোথা হইতে আসিল ?

(ফিল্‌ম্‌-এর যাতুবিদ্যা)

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, বি. এ.

পঞ্চাশ ফুট লম্বা প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী এপ্‌—"কং" কোথা হইতে আসিল এবং কি করিয়া সিনেমা-গৃহের রূপালী পর্দ্দায় ধরা পড়িল তাহা সমস্যা ও বিস্ময়ের বিষয়! বাস্তবিক এড্‌গার ওয়ালেস্‌ এবং মেরিয়ান কুপার-এর উপন্যাসখানি লোকে গল্প-হিসাবেই পড়িয়াছে —অর্থাৎ ইহা কখনও সত্য হইতে পারে বলিয়া কেহ কল্পনাও করে নাই; কিন্তু কিছুকাল পরেই দেখা গেল, এই অদ্ভুত এবং অলৌকিক ঘটনাপূর্ণ কাহিনীটি কিছুমাত্র অসম্ভব নয়—ইহার প্রাগৈতিহাসিক অতিকায়, ভীষণ-দর্শন জীবগুলি জীবন্ত রূপ লইয়া নিউ ইয়র্কে দেখা দিয়াছে!

আমরা জানি, ফিল্‌ম্‌-এর ছবিগুলি জ্যান্ত মানুষ ও পশুপক্ষীর অভিনয় ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু 'কিং কং' ফিল্‌ম্‌এ সেই সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বের জন্তুগুলির ছবি কি করিয়া উঠিল? কি করিয়া বিরাট কং, ভীষণ-দর্শন টায়রানোসরাস এমন অভিনয় করিল?

আমাদের দেশে যখন ছবিখানি প্রথম আসে তখন কিং কংএর 'টেক্‌নিক'—অর্থাৎ তুলিবার কৌশল সম্বন্ধে কত আলোচনাই না শোনা গিয়াছিল! কেহ বলিয়াছিলেন— "কিং কংএর মধ্যে পঁচিশজন মানুষ বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে বসিয়া কাজ করিতেছে।" কেহ বলিয়াছিলেন—"ওগুলি চোখের ধাঁধা বা ভেল্কীবাজী ছাড়া আর কিছুই নয়!"

লিউইস কেরল্‌স "এলিস্‌ ইন ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ড" (Alice in wonder land) নামে একখানি অদ্ভুত উপন্যাস লেখেন। বাঙ্গলায় "আজব দেশে অমলা" বইখানি তাহারই অনুবাদ বলিয়া মনে হইতেছে। যাহা হউক, এই "এলিস্‌ ইন ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ড" বইখানির ছবি আঁকেন স্যার্‌ জন্‌ টেনিয়েল। হলি উড্‌এ যখন এই বইখানির ফিল্‌ম্‌ তোলা হয় তখন ঐ টেনিয়েল সাহেবের আসল ছবিরই অনুরূপ ছবি করা হইয়াছিল। আসলে কিন্তু সেগুলি ছবি হইতেই ফটো তোলা হয় নাই। মিস্‌ চারলোট্‌ এই

কিং কং ফিল্‌ম্‌-এর খুঁটিনাটি

কিরূপে পটভূমিকার উপর 'কিং কং'এর ছবি সংযোজন করা হইল।

১। প্রথমে দরকারী পটভূমিকার দৃশ্য তোলা হয়।

লাল আলোদ্বারা পটভূমিকা আলোকিত হওয়ায় ছবিতে পটভূমিকার কিছুই উঠিবে না।

মাইক্রোফোন

নীল আলো

লাল
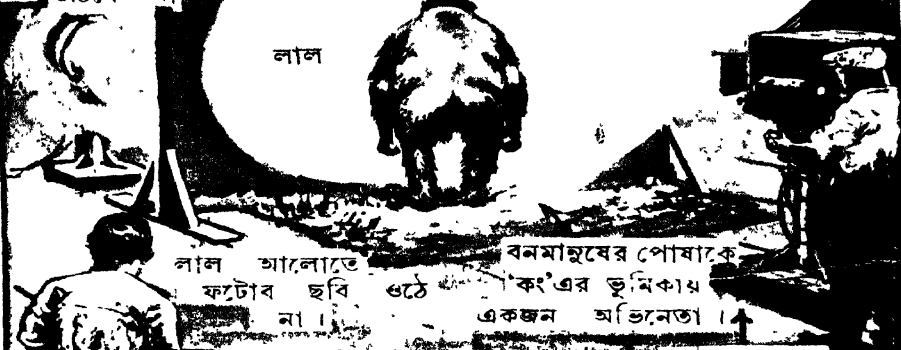
লাল আলোতে ফটোর ছবি ওঠে না।

বনমানুষের পোষাকে 'কং'এর ভূমিকায় একজন অভিনেতা।

২। ক্যামেরাতে তোলা ছবি ডেভেলপ্ না করিয়া পুনরায় তাহা গুটাইয়া নীল আলোকে 'কং'এর ছবি তোলা হয়।

৩। এখন এই ফিল্মটি ডেভেলপ্ করিলে দেখা যাইবে—তুইবার ছবি তোলার দরুণ পূর্ব্বেকার তোলা ছবির সঙ্গে বিরাটকায় 'কং'এর ছবি যুক্ত হইল।

(ক)
এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং
(ক) কয়েকটি মনোনীত স্থান হইতে নিউ ইয়র্কের উপরিভাগের ছবি তোলা হইল।
(খ)
ক্যামেরা ও মাইক্রোফোন
(খ) যুদ্ধরত এরোপ্লেনের শব্দের ছবিগ্রহণ
(গ)
"B"
(গ)
(ক)
সব কয়টির মিলিত আলেখ্য
যে কাচের পর্দার উপর নিউ ইয়র্কের উপরিভাগের স্থিরচিত্র আছে, সেই পর্দার ভিতর দিয়া ক্যামেরাতে উপযুক্ত মাপের 'কং' ও এরোপ্লেনগুলির গতিবিধির ছবি তোলা হয়।
পর্দার আড়ালে প্রজেক্টার
বনমানুষের রূপসজ্জায় অভিনেতা
কাচের পর্দা।
ক্যামেরা
'এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং'-এর শীর্ষদেশের মডেল এরূপভাবে গঠিত, যাহাতে 'কং'এর আকার আপাতদৃষ্টিতে ৫০ ফুট দেখা যায়।
'ষ্টেট বিল্ডিং'এর চূড়াটির শূন্যস্থানটি।
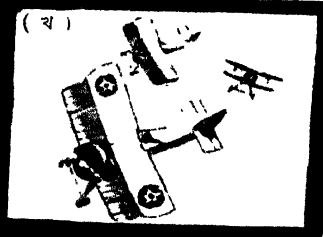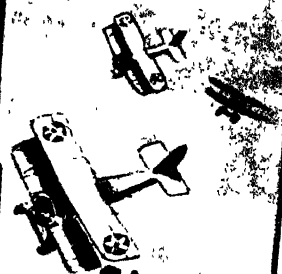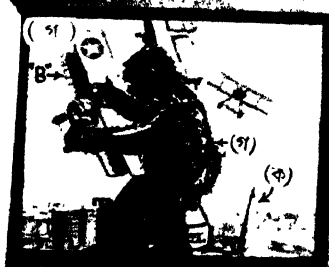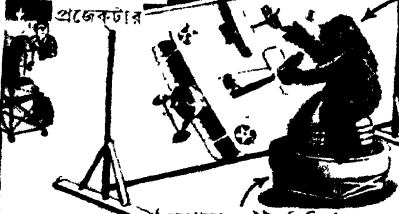
প্রথম একটি ছবি তোলার পর বিশেষজ্ঞ জন্তুটির যুদ্ধভঙ্গী কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া দেয়, তারপর পরবর্ত্তী ছবি তোলা হয়।

৩। বহু কষ্টসাধ্য কাজের পর এক-একটি ছবিকে পর পর সাজাইয়া প্রাগৈতিহাসিক জন্তুটিকে প্রাণবন্ত করা হয়।

এলিসের অভিনয় করেন এবং আরও অনেকে অন্যান্য চরিত্রগুলির অভিনয় করিয়াছিলেন। এই দৃষ্টান্তের ভুল ধারণা লইয়া কিং কং সম্বন্ধে অনেকে ইহাও বলিলেন—"ওগুলি আসল জীব নয়—হাতে আঁকা ছবি !" কেহ বলিলেন—"কাগজের ছবি হইলে তাহাতে কখনও ফিল্মের একৃশন্ হয় !—সত্যিই একটা শিম্পাজী কোথায়ও আসিয়াছিল হয়ত।"

কিং কংএর প্রকৃতিটাই যে কেবল অলৌকিক তাহা নয়; তাহার প্রত্যেক কার্য্য-কলাপ দর্শকের মনে একটা ভীতি ও বিস্ময় আনিয়া দেয়।

ছবিখানি বাহির হইবার পরেই আমেরিকার 'Modern Mechanix and Inventions' নামক পত্রিকায় ঐ ছবিখানি তোলার সমস্ত গোপন রহস্য প্রকাশিত হয়।

কত যুগ যুগান্তর পূর্ব্বে যেসব প্রাণী এই জগতে ছিল এবং এখন যাহাদের অস্তিত্ব একেবারেই নাই, তাহাদের 'মডেল' মিষ্টার উইলিস ও' ব্রয়েন (Mr. Willis O' Brien)-এর প্রযোজনায় তৈরী হইয়াছিল। ব্রিয়েন সাহেব আমেরিকার মিউজিয়মের প্রাকৃতিক ইতিহাস বিভাগে অনেক কাজ করিয়াছেন। তিনি ঐ সব প্রাণীর যথাযথ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া মডেলগুলি তৈরী করেন। কিন্তু মডেলগুলি ত আর প্রকৃত জীব নয়, কাজেই তাহাদের চলাফেরা, ক্রোধ, পলায়ন ইত্যাদি দেখাইবার জন্য তাঁহাকে এক একটি ছবিতে কয়েকবার 'শট' লওয়ার পর আবার ঐগুলিকে নূতন করিয়া তৈরী করিতে হইয়াছে। এইরূপ এক এক সেট ফটোর ক্রমিক ছবি লইয়া ফিল্মে তুলিয়া তবে ইহার জীবন্ত রূপ দেওয়া হইয়াছে। ব্যাকগ্রাউণ্ড (Back ground)-এর ছবি এবং কং-এর কার্য্য-কলাপের বিভিন্ন ছবি আলাদা করিয়া তুলিয়া তবে উহার সহিত যোগ করা হইয়াছে। কংএর ছবি তুলিবার সময় উহার পেছন দিকে একটা লাল পর্দ্দা টানাইয়া লওয়া হয়—যাহাতে পেছনের ব্যাকগ্রাউণ্ডটা না ওঠে। নীল আলো ফেলিয়া সেজন্য পেছনটা আবার কুয়াসার মত করা হয়—ফলে, যখন ছবিটাকে 'ডেভেলপ' (develop) করা হয় তখন দেখা যায়, বিরাট কং ক্ষুদ্র ঝোপ-জঙ্গল বা নিউ ইয়র্ক সহরের সম্মুখে অভিনয় করিতেছে! শেষের দিকের এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং-এর ছবিগুলিও এইভাবে লওয়া হয়। এই সময়ে 'কং' এরোপ্লেন দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল।

এই ছবিখানি তুলিতে কত সময় ও ধৈর্য্যের প্রয়োজন হইয়াছে তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়! মেয়েটিকে চুরি করিবার জন্য সামান্য টেরোডকটাইলকে

(Pterodoctyl) হত্যা করিবার দৃশ্যটি তুলিতেই দীর্ঘ ছয় সপ্তাহ সময় লাগিয়াছিল! ইহার প্রত্যেকটি অঙ্গচালনার ফটোই আলাদা করিয়া তুলিতে হইয়াছে।

ঐ বিরাট দৈত্যটির গর্জ্জন তুলিবার মত বৈজ্ঞানিক কোনও যন্ত্র পাওয়া যায় নাই। সেইজন্য চল্লিশটি স্বতন্ত্র-শব্দ-বিশিষ্ট যন্ত্র বিশেষভাবে তৈরী করিয়া টেরোডকটাইল-এর হিস্-হিস্ শব্দ ধরিতে হইয়াছিল। আর্সিনোথেরিয়ামের (Arsinotherium) ভীষণ শব্দ ধরিবার জন্য অরগ্যানের vox humana pipe নিযুক্ত ছিল। 'কং'এর অভ্রভেদী গর্জ্জন ধরিবার জন্য এসকল ত আছেই—তার উপর সিংহ এবং গরিলার গর্জ্জনও ধরা হইয়াছে! 'কিং কং' ছবিখানি মানুষের ধৈর্য্য এবং বিজ্ঞান-কৌশলের চরম নিদর্শন।

আমাদের আশা

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

আমরা দেশের নতুন মানুষ তরুণ ছেলে-মেয়ে;
উঠছি গড়ে', জীবন-পথে আমরা যাবো ধেয়ে।
পূর্ণ করি' জাতির আশা মুক্ত জীবন করবো খাসা,
ভাতের অভাব রাখবো না আর বাঁচবে সবাই খেয়ে;
খেদিয়ে দিয়ে ব্যাধির আপদ চলবো নেচে গেয়ে—
আমরা ছেলে-মেয়ে।

ভবিষ্যতের বীর যে মোরা, ঘুচাবো সব দুখ;
গৌরবে আর গর্ব্বে মোদের ভরবে মায়ের বুক।
আমরা হিন্দু মুসলমান পার্শী এবং কৃশ্চিয়ান
প্রাণে প্রাণে বাঁধবো জমাট্, নইরে আহাম্মুক;
ঐক্যে মোদের সখ্যে মোদের আসবে অসীম সুখ,
ঘুচাবো সব দুখ।

দলাদলি দূর ক'রে ভাই করবো গলাগলি;
মোদের মিলন দেখে' ওরা করবে বলাবলি।
ভেদাভেদের প্রস্তাবনা থাকবে না এই উন্মাদনা,
হাসির চোটে উড়িয়ে দোবো এসব ঢলাঢলি;
ভা'য়ে ভা'য়ে করবে কে আর কর্ণ মলামলি?
করুক্ বলাবলি।

হারিয়ে গেছে যে-সব 'মানুষ' হবো তাদের মত;
জ্ঞানে পুণ্যে ধর্ম্মে কর্ম্মে সদাই রবো রত।
দূর-বিদেশে যাবো উড়ে, ছুটবো বিশাল পৃথ্বী জুড়ে,
লুপ্ত বিভব আনতে দেশে পালবো জীবন-ব্রত;
মনুষ্যত্ব দেখে' মোদের বিশ্ব হবে নত,
রইবো সমুন্নত।

আমাদের এই জন্মভূমি ফুল্ল ফুলময়;
আর কোনো দেশ মায়ের তুল্য দীন-দুখিনী নয়!
এর আকাশে চন্দ্র হাসে, বাতাস বিভোর পুষ্পবাসে,
বর্ষা-মেঘে বিষাণ বাজে ভুলিয়ে দিয়ে ভয়;
কমল-কোমল মা আমাদের কুলিশ-কঠোর হয়,
মায়ের হবে জয়।

রেল-টিকেটের ইতিকথা

শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী
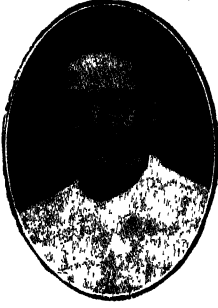
রেলগাড়ী চল্‌বার পূর্ব্বে যাতায়াত চল্‌ত নৌকোয়, অশ্বারোহণে, গরুর গাড়ীতে এবং সব যানের সেরা যান পদব্রজে! আমাদের দেশে সম্রাট্ সাজাহানের আমল থেকে ঘোড়ায় ডাক যাতায়াত সুরু হয়। পাশ্চাত্ত্য দেশেও পূর্ব্বে ঘোড়ার গাড়ীতে ডাক যাতায়াত কর্‌ত। এই ডাক-গাড়ীতেই ওদেশে মানুষের যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল প্রথমে। ডাক-গাড়ীর ঘোড়া বদলাবার জন্যে নির্দ্দিষ্ট সরাইখানায় গাড়ী থাম্‌ত আর এই সব সরাইখানাই ছিল ডাক-গাড়ীর ষ্টেশন। এই সব ষ্টেশনে লোক ওঠানামা কর্‌ত। কিন্তু ঘোড়ার ডাক-গাড়ীতে ক'জনেরই বা স্থান হ'তে পারে?—তাই অনেক সময় দু'এক দিন আগে থাক্‌তেই জায়গা 'রিজার্ভ' ক'রে রাখ্‌তে হ'ত। সরাইখানার কর্ম্মচারীর কাছেই টিকেট পাওয়া যেত—ভাড়ার টাকা টিকেট কেনার সময়ও দেওয়া যেত—নয় তো যাত্রা শেষ ক'রে গাড়ীর গার্ডের হাতে দেওয়া যেত। টিকেটগুলো ছিল 'ট্রিপ্লিকেট' (Triplicate), অর্থাৎ তাদের তিনটি ক'রে অংশ থাক্‌ত; তার এক অংশ যেখান থেকে টিকেট বিক্রি হ'ত সেই অফিসে থাক্‌ত, আর এক অংশ যাত্রীর কাছে থাক্‌ত, অপর অংশ থাক্‌ত গার্ডের কাছে। টিকেট 'ইস্যু' করাও কম হাঙ্গামার ব্যাপার ছিল না—প্রত্যেক অংশে যাত্রীর নামধাম, গাড়ীর নাম, সিটের নম্বর, গন্তব্যস্থানের নাম, ভাড়ার অঙ্ক ইত্যাদি সাত-সতের বিবরণ লেখা থাক্‌ত।

এরপর জর্জ্জ ষ্টিফেন্‌সনের আবিষ্কারের ফলে 'ষ্টিম্ ইঞ্জিন'-এর সৃষ্টি হ'ল—রেলগাড়ী চল্‌তে সুরু কর্‌ল।

রেলগাড়ী যখন চল্‌তে সুরু কর্‌ল তখনও তার কর্ত্তৃপক্ষেরা ডাক-গাড়ীর প্রচলিত টিকেটের ব্যবস্থাই বহাল রেখে কাজ চালাতে লাগ্‌লেন—সরাইখানার স্থান অধিকার কর্‌ল 'বুকিং অফিস্'। যাত্রীর সংখ্যা দিন দিন বাড়্‌তে লাগ্‌ল; তখন কর্ত্তৃপক্ষ দেখ্‌লেন যে, টিকেট বিক্রির চলিত ব্যবস্থায় কুলিয়ে ওঠা যাচ্ছে না—এক একখানা টিকেট 'ইস্যু' কর্‌তে যথেষ্ট সময় লেগে যায়। কাজেই এমন কিছু পরিবর্ত্তন দরকার যা'তে আরও তাড়াতাড়ি টিকেট 'ইস্যু' করা চলে। তার ফলে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে 'লিসেষ্টার এণ্ড্ সোয়ানিংটন রেলওয়ে কোম্পানি' (Liecestor & Swaunington Railway Co)

চিরাচরিত পন্থা পরিত্যাগ ক'রে এক নূতন ধরণের টিকেটের প্রচলন করলেন। তাঁরা কাগজের চিরকুটের পরিবর্ত্তে পিতলের আটকোণা চাকৃতির প্রচলন করলেন—তা'তে কোম্পানির নাম, গন্তব্যস্থানের নাম আর ক্রমিক নম্বর লেখা থাকৃত—যাত্রীর সাত-সতের পরিচয় লেখার হাঙ্গামা তুলে দিলেন। কিন্তু কেবল তৃতীয় শ্রেণীর জন্যই এই ব্যবস্থা হ'ল। নগদ টাকা দিয়ে টিকেট কিনতে হ'ত। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা নূতন ব্যবস্থা করলেন—টিকেটের ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী যাত্রীদের গাড়ীতে উঠতে হ'ত; অর্থাৎ যে আগে টিকেট কিনৃত সে আগে গাড়ীতে উঠে' নিজের পছন্দসই জায়গা বেছে বসতে পারত। এখন যেরকম 'টিকেট কলেক্টর' আছে, তখন সেরকম লোক ছিল না—গার্ডসাহেবই সেই কাজ করতেন। সেই সংগৃহীত টিকেট সর্ট (sort) হ'য়ে যেগুলো যেখান থেকে 'ইস্যু' হয়েছে, ভিন্ন ভিন্ন চামড়ার ব্যাগে ভর্ত্তি হ'য়ে সেই সেই স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ত। সেগুলো আবার বিক্রি হ'ত। তখনকার দিনে থার্ড ক্লাসের ভাড়া ছিল মাইল প্রতি ১¼ পেন্স—আর ফার্ষ্ট ক্লাসের ২½ পেন্স অর্থাৎ ডবল।

টমাস্ এডমণ্ডসন্

কিন্তু এই চাকৃতি-টিকেটের আয়ু বেশীদিন স্থায়ী হ'ল না—যদিও এখনও দেখা যায় বড় বড় রেলকর্ম্মচারীদের জন্য হাতীর দাঁত বা সোনা-রূপার চাকৃতির ব্যবস্থা আছে। তখনকার দিনে কাগজের টিকেটই লোকে পছন্দ করত বেশী।

তারপর ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে রেল-টিকেটের জীবনে এল একটা অভিনব পরিবর্ত্তন। এই পরিবর্ত্তন যাঁর দ্বারা সাধিত হ'ল সেই স্মরণীয় ব্যক্তির নাম 'টমাস্ এডমণ্ডসন্' (Thomas Eudmondson)। তাঁর এই পরিবর্ত্তিত পন্থা যে কতদূর কার্য্যকরী ও বিজ্ঞানসম্মত ছিল তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, আজ একশ' বছরেরও বেশী হ'য়ে গেল, তাঁর প্রচলিত পন্থাই সগৌরবে বহাল রয়েছে।

১৭৯২ খৃষ্টাব্দে এড্‌মণ্ডসনের জন্ম হয়। তিনি প্রথমে কিছুদিন মুদীর ও ছুতোর-মিস্ত্রির কাজ করেন। তারপর স্মরণীয় ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি মিল্‌টন (বর্ত্তমান ব্রাম্প্‌টন) রেলওয়ে ষ্টেশনের ষ্টেশনমাষ্টার নিযুক্ত হ'ন। রেলের চাকরিতে ঢুকেই তখনকার প্রচলিত টিকেট-বিক্রির নানা অসুবিধার দিকে তাঁর চোখ পড়ে। ট্রেন যাতায়াতের মধ্যে তখন তাঁর হাতে প্রচুর অবসর। সেই অবসর সময়কে তিনি একটা নূতন সহজ পন্থা আবিষ্কারের চেষ্টায় নিয়োজিত কর্‌লেন। চেষ্টার ফলে একটি যন্ত্র তৈরী হ'ল। এক একটা কাঠের ফলকে, যে সকল জায়গার টিকেট বেশী বিক্রি হয় সেই সেই জায়গার নাম আর ক্লাসের নাম খোদাই ক'রে নেওয়া হ'ল এবং তারই সাহায্যে তিনি অনেকগুলো টিকেট ছেপে ফেল্‌লেন, তারপর সেগুলোতে পর পর নম্বর লিখে নিলেন।

এরপরে তিনি টিকেটগুলো সাজিয়ে রাখ্‌বার ব্যবস্থার দিকে মন দিলেন। তিনি ভেবে দেখ্‌লেন—প্রত্যেক ষ্টেশনের টিকেটগুলো যদি নম্বর অনুযায়ী পরপর থাক ক'রে সাজিয়ে রাখা যায় তবে কাজের খুবই সুবিধা হয়। তিনি চোঙের মত খাঁজকাটা কতকগুলো ঘর কর্‌লেন। চোঙের নীচের দিকটা বন্ধ—সেখানে একটা স্প্রিং আঁটা রইল, তার ওপর পরপর নম্বর অনুযায়ী টিকেট সাজান হ'ল; চোঙের ওপরের দিকটা রইল খোলা। সব চেয়ে কম নম্বর রইল ওপরে,—যেই সেখানা সরিয়ে নেওয়া হ'ত অমনি নীচেকার স্প্রিংয়ের ঠেলায় তার পরের নম্বরের টিকেটখানা চোঙের মুখে এসে হাজির হ'ত। আজ-কালকার ব্যবস্থা একটু অন্যরকম। একটা কাঠের বাক্সের গায়ে ভিন্ন ভিন্ন ঘর কাটা আছে—সেই আগেকার দিনের মতই প্রায়। প্রত্যেক ঘরের নীচের দিকে একটু খাঁজকাটা, তারই ফাঁক দিয়ে সকলের নীচেকার টিকেটখানা বেরিয়ে থাকে; সেটার নম্বর থাকে সবচেয়ে কম। তার ওপর ক্রমশঃ পরপর বেশী নম্বরের টিকেট সাজান থাকে; ওপরের মুখটা খোলা থাকে, নীচেকার টিকেটগুলো আপনার ভারে নেমে আসে। এতে আগেকার দিনের মত স্প্রিং লাগাবার কোন প্রয়োজন হয় না।

এড্‌মণ্ডসনের প্রথম আমলের তারিখ ছাপা যন্ত্র

টিকেট ছাপা ও সাজান তো হ'ল; এখন বাকি রইল টিকেটে তারিখ ছাপা। এতদিন তারিখ হাতে লিখে দেওয়া হচ্ছিল—তা'তে অনর্থক কিছুটা সময় নষ্ট হ'ত। এড্‌মণ্ডসন্ ভেবেচিন্তে তারও ব্যবস্থা ক'রে ফেল্‌লেন। তিনি একটি তারিখ ছাপার যন্ত্র তৈরী কর্‌লেন। দু'খানা কাঠ ওপরে-নীচে এমনি ভাবে লাগান হ'ল যাতে দুই কাঠের মাঝে একটু ফাঁক থাকে—সেই ফাঁকে টিকেটখানা ঢুকিয়ে সাম্‌নের দিকে একটু চাপ দিলেই কাঠ দু'খানা টিকেটটিকে কাম্‌ড়ে ধর্‌ত। ওপরের কাঠখানায় থাক্‌ত তারিখের অক্ষর—তার ওপর থাক্‌ত একটা কালির ফিতে। টিকেটখানা কাঠের মুখে দিয়ে ঠেলা দিলেই তারিখ ছাপা হ'য়ে যেত। এড্‌মণ্ডসনের তৈরী প্রথম যন্ত্রটি আজও ল্যাঙ্কাষ্টার মিউজিয়মে সযত্নে রক্ষিত আছে। পরে এই যন্ত্রেরই সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হ'য়ে বর্ত্তমান রূপে এসে দাঁড়িয়েছে। এখন আর কালির দরকার হয় না—রঙীন টিকেটের ওপর সাদা অক্ষর ছাপা হয়।

আধুনিক টিকেট ও নম্বর ছাপার যন্ত্র

আগে টিকেট ছাপার কল চালান হ'ত হাতে—তা'তে ঘণ্টায় হাজার টিকেটের বেশী ছাপা যেত না, আর বর্ত্তমান যুগে বৈদ্যুতিক-শক্তিতে চালিত যন্ত্রে ঘণ্টায় দশ হাজার টিকেট ছাপা হয়!

সাধারণ টিকেটের মাপ হচ্ছে—লম্বায় ২¼ ইঞ্চি, পাশে ১৯/১৬ ইঞ্চি। এড্‌মণ্ডসনই এই 'সাইজে'র প্রবর্ত্তক এবং আজ পর্য্যন্তও অধিকাংশ স্থলেই তা চল্‌ছে। তবুও স্থানে স্থানে ভিন্ন মাপের টিকেটও দেখা যায়। ইউরোপের কোন কোন রেলে ১½×৳ ইঞ্চি টিকেট চল্‌ছে। লিথুয়ানিয়াতে টিকেট আছে প্রায় ৫ ইঞ্চি লম্বা। মাল্টাতে ১×১ ইঞ্চি টিকেটই প্রচলিত। গোল আকারের টিকেট দেখ্‌তেই পাওয়া যায় না—কেবল ব্রিটিশ বোর্ণিও দেশে ছাড়া। আমাদের দেশে 'রিটার্ণ টিকেট' আর 'অর্ডিনারি টিকেট' একই সাইজের, কিন্তু জাপানে
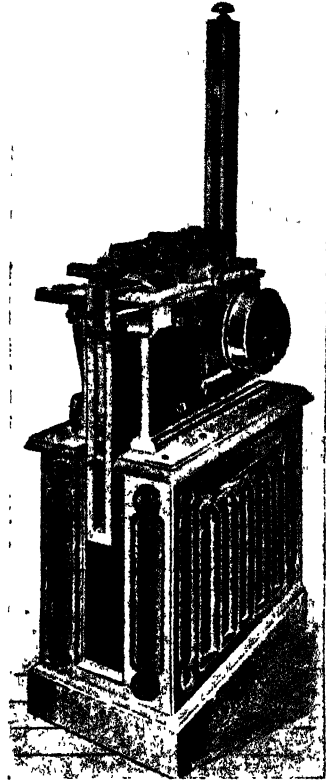
রিটার্ণ টিকেটের সাইজ অর্ডিনারির ডবল—টিকেটের দাম যে ডবল! সবচেয়ে বড় টিকেট হচ্ছে পারস্যদেশের রাজকীয় রেলপথের। যদিও ঐ রেলপথটির দৈর্ঘ্য মাত্র মাইল ছয়েক, কিন্তু তার টিকেটগুলো লম্বায় ৮ ইঞ্চি আর পাশে ৪ ইঞ্চি।

প্রথম আমলে 'ম্যাঞ্চেষ্টার এণ্ড্ লিড্স্ রেলওয়ে'তে ভারি মজার মজার টিকেট বিক্রি হ'ত। এক এক জায়গার টিকেটে এক এক রকম ছবি ছাপা থাকৃত। ম্যাঞ্চেষ্টার সহর কাপড়ের কলের জন্য বিখ্যাত—তাই সেখানকার টিকেটে থাকৃত তূলার বস্তার ছবি।
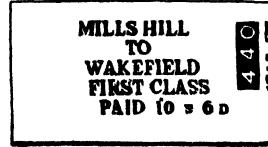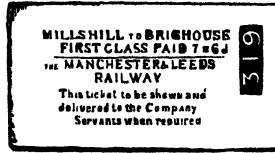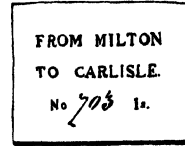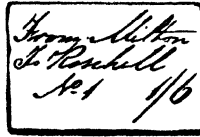
এড্মণ্ডসনের নিজ হাতে লেখা ও ছাপা কয়েকখানি টিকেট

লিড্স্ সহর উলের কাজের জন্য প্রসিদ্ধ—তাই সেখানকার টিকেটে ভেড়ার দলের ছবি থাকৃত; এমনি আরো কত কি!

রেল কোম্পানির জনপ্রিয়তা ও ভবিষ্যৎ আয় বাড়াবার জন্যে কতরকম ফন্দী করা হ'ত। রেল লাইনের পাশে যারা নূতন বাড়ী করবে তাদের জন্যে সস্তায়, অনেক সময় বিনামূল্যেও সিজন্ টিকেট (Season Ticket) দেওয়া হ'ত। এই তো কয়েক বছর আগেই বোম্বাইতে জি. আই. পি. রেলওয়ে এমনি ব্যবস্থা করেছিল।

অনেক বড় বড় ষ্টেশনে—যেখানে কাজকর্ম্ম অত্যন্ত বেশী সেখানে যন্ত্রে টিকেট বিক্রি হয়। পাঁচ-দশ মাইলের মধ্যে কোন স্থানের কমদামী টিকেট কিনতে হ'লে যন্ত্রের মধ্যে

নির্দ্দিষ্ট ভাড়ার পয়সা ফেলে দিলেই নির্দ্দিষ্ট ষ্টেশনের টিকেট আপনিই বেরিয়ে আসবে। আমাদের দেশে এমনি যন্ত্র আছে ব'লে শুনি নি—ওদেশে আছে যথেষ্ট। এদেশে প্লাট্‌ফর্ম্ম টিকেট বিক্রির জন্য যন্ত্র আছে বটে!

কয়েক রকম বিশেষ ধরণের টিকেটও কোন কোন দেশে চল্‌তি আছে। যেমন নিজামবাহাদুরের রেলওয়েতে সৈন্যদের যে টিকেট দেওয়া হয়, তা'তে 'সকালের খাবার দেওয়া হবে' এমনি নির্দ্দেশ থাকে! এমনি আরো নানারকম বিশেষ টিকেট ওদেশে আছে।

নষ্টচন্দ্র

শ্রীসুবোধ রায়

বলরামপুর নদীয়া জেলার বিখ্যাত গণ্ডগ্রাম। রামচন্দ্র সেই বিখ্যাত গ্রামের বিখ্যাত ছেলে। ব্রাহ্মণ-বংশের এই সুদর্শন তরুণ কিশোর—চোখে মুখে তাহার বুদ্ধির দীপ্তি। গ্রামের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক ক্লাশের ছাত্র সে। কোথায় কাহার অসুখ করিয়াছে, কাহার বাড়ীতে মড়া উঠিতেছে না—রামচন্দ্র অমনি সেখানে হাজির। বাস্তবিক, এইটুকু বয়সে পরোপকারে সে গ্রামের মধ্যে সকলের অগ্রণী। কিন্তু তাহার পরিচয় শুধু পরোপকারের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তাহার উপদ্রব, অপরকে জব্দ করিবার অশেষ কলা-কৌশলের খ্যাতি গ্রাম ছাড়াইয়া গ্রামান্তরেও গিয়া পৌছিয়াছে। বহু গ্রামবৃদ্ধ তাহার পরোপকার-বৃত্তির মধ্যে যথেচ্ছাচারিতার গন্ধই খুঁজিয়া পান। কিন্তু যখনই দরকার তখনই রামকে ডাকিয়া নিজেদের কাজ গুছাইয়া নেন এবং রাম যে বাঁড়ুয্যে বংশের তথা গ্রামের মুখোজ্জ্বল করিয়াছে সেকথা শুনাইতেও ভুলেন না!

তাহার উপদ্রবের একটি মাত্র নমুনা দিতেছি।

অল্পদিন পূর্ব্বের কথা। রাম স্কুলে যাইতেছে দেখিয়া একটি দরিদ্র বর্ষীয়সী রমণী পাড়ার এক সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ী হইতে তাড়া খাইয়া কাঁদো-কাঁদো মুখে বাহির হইয়া আসিল। রাম থমকিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কি হয়েছে, কাঁদ্‌ছ কেন গো?"

রামের এই সহানুভূতিপূর্ণ প্রশ্নের উত্তরে রমণী কাঁদিয়া ফেলিল। অশ্রু মুছিয়া সে ধীরে ধীরে বলিল—"ক'দিন থেকে বাবুরা বড়ি দিচ্ছে; আজ গিয়ে বলেছিনু—'মা আমায় দুটো বড়ি দেবে?'

অমনি বাড়ীশুদ্ধ লোক চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—বাবু ছুটে এলেন, তারপর অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিলেন। কেবল মার্‌তে বাকী রেখেছেন!"

উত্তরে রাম শুধু বলিল—"হুম্‌।"

এইরূপ ইতরতা ও সঙ্কীর্ণতা রামের অসহ্য। তাহার সমস্ত মন বিদ্রোহী হইয়া ইহার প্রতীকার খোঁজে। সে ভাবিতে লাগিল—'মানুষ এত নীচ, এরকম স্বার্থপর হয় কেন? এই গরীব মেয়েটিকে দুটো বড়ি দিলে ওদের কি এমন ক'মে যেত? অথচ এই গরীব ঐ সামান্য জিনিসটুকু পেয়ে আনন্দে কেমন দু'হাত তুলে ওদের জন্য ভগবানের কাছে কল্যাণ কামনা কর্‌ত।' এইভাবে চিন্তা করিতে করিতে সে স্কুলে গেল।

স্কুলে সেদিন কিছুতেই আর পড়ায় মন বসে না—কিরূপে ঐ বড়ির বংশ ধ্বংস করা যায় এই মতলবই রামের মাথায় ঘুরিতেছে। টিফিন হইবামাত্র সে তাহার দলের কয়েকজনকে লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। সহচরদের বাড়ীর পিছনদিকে দাঁড় করাইয়া সে ভিতরে গেল। পাড়ার সকল বাড়ীতেই তাহার অবাধ গতি। দুপুরে মেয়েরা প্রায় সকলেই ঘুমায়। সেই ফাঁকে উপরে ছাদ হইতে বড়িসমেত কলাপাতা সে পিছনের বাগানে ফেলিয়া দিবে এবং তাহার সহচরেরা তাহা লইয়া সরিয়া পড়িবে। পরে সেই বড়ি সকালের প্রত্যাখ্যাত দরিদ্র স্ত্রীলোকটিকে দিয়া আসিলেই চলিবে।—ইহাই ছিল রামের উদ্দেশ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ছাদে গিয়াই রাম দেখিল—বাড়ীর দুইটি মেয়ে ছড়ি-হাতে বড়ি-পাহারায় রত। হঠাৎ রামের পদশব্দে তাহারা চমকিয়া উঠিল এবং তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল—"কে? রামদা'? তাই ভাল! যা' ভয় পেয়েছিলাম।"

—"তা তোরা এখানে ব'সে কি কর্‌ছিস্‌?"

—"আর বল কেন রামদা',—হনুমানের যা উপদ্রব। ঐ দেখ না সব দলে দলে বাগানে ব'সে আছে। একটা কাজ কর্‌বে ভাই, লক্ষ্মীটি! তোমারই তো অনুচর ওরা—ওদের যদি একটু তাড়িয়ে দিয়ে যাও তো আমরা বাঁচি।"

মেয়েদের এই ব্যঙ্গোক্তিতে বিদ্যুৎ-চমকের মত রামের মাথায় একটা মতলব খেলিয়া গেল।

সে ছাদের আলিসার উপর দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল—তখনও একদল হনুমান বাগানে বসিয়া আছে। "আচ্ছা, দেখ্‌ছি"—বলিয়া সে আর কালবিলম্ব না করিয়া নামিয়া গেল। নামিবার সময় মেয়েদুইটির অট্টহাস্য ও কথা তাহার কানে আসিল—"ওরে, রামদা' যে সত্যিই গেলরে!"

রামচন্দ্র ফিরিয়া সহচরদের লইয়া বাগানে চলিয়া গেল এবং এমনভাবে একটি ব্যূহ রচনা করিল যার ফলে ঐ বাড়ীর ছাদ ছাড়া অন্য তিনদিকের পথ বন্ধ হইল। তাহার পরই সমবেতভাবে আরম্ভ হইল হনুমানদের তাড়া! চক্ষের নিমিষে সে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল। হঠাৎ তাড়া খাইয়া হনুমানের দল পলাইতে চেষ্টা করিল—অন্য সবপথ বন্ধ দেখিয়া তাহারা সদলবলে সেই বাড়ীর ছাদে লাফাইয়া পড়িল। একদল হনুমানকে ছাদে পড়িতে দেখিয়া মেয়ে দুইটি—"ওরে বাবারে, খেয়ে ফেল্‌ল রে" বলিয়া, চীৎকার করিতে করিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইল। চীৎকার শুনিয়া বাড়ীর লোকজন যখন ছাদে আসিল ততক্ষণে রামের অনুচরগণ বড়ির বংশ ধ্বংস করিয়া ছাড়িয়াছে! ... ...

এই ধরণের উপদ্রবসত্ত্বেও রামকে কেহ বড় বেশী ঘাঁটাইতে সাহস করিত না। শুধু সময়ে অসময়ে তাহার নিকট উপকার পাইত বলিয়া নয়, পরন্তু সে ছিল পাড়ার ডানপিটে ছেলেদের অবিসংবাদী নেতা। "যমের মুখে যেতেও ভয় পায় না"—এই জনপ্রবাদটি এই একান্ত দুঃসাহসী ছেলেটির সম্বন্ধে অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

নদীয়া জেলায় "নষ্টচন্দ্রের" তাণ্ডব-উৎসব এখনও পালিত হয়। এই উৎসবে বিশেষভাবে যোগ দেয় বালক ভোলানাথের দল। ওই তিথির চন্দ্র দেখিলে পাপ হয় এবং সেই পাপক্ষালনের একমাত্র উপায় অপরের নিকট হইতে গালি খাওয়া। তাই রাত্রে একদিকে পাড়ার ছেলের দল প্রতিবেশীর বাগান হইতে শাকসব্জী, ফল প্রভৃতি না বলিয়া লইবার চেষ্টা করে এবং অপর দিকে যাহার দ্রব্য সেও এই অপূর্ব্ব পাপক্ষালন প্রচেষ্টায় বাধা দিতে তৎপর হয়। ফলে উৎসবটা জমিয়া উঠে ভাল।

সেবারে নষ্টচন্দ্রের দিন পাড়ার হরি সামন্তের কলার বাগানের উপর রামচন্দ্রের চোখ পড়িল। দুই কাঁদি খুব ভাল মর্ত্তমান কলা আছে—কয়েকদিন পরেই পাড়িবার মত হইবে। একটু আগে ভাগে সেই কাজটা সারিয়া রাখিতে ক্ষতি কি? কিন্তু রামচন্দ্র তো ছিঁচ্‌কে চোর নয়। সে হরি সামন্তকে বলিয়া পাঠাইল—সেই রাত্রে তাহার কলার কাঁদি যেন সে সামলায়। হরি সামন্তও লোক মারফত বলিয়া পাঠাইল যে, সে নিজে লাঠি লইয়া বসিয়া সারা রাত্রি পাহারা দিবে। যদি কাহারও প্রাণের মায়া থাকে, তবে সে যেন তাহার বাগানের ত্রিসীমানার মধ্যে না আসে।

রাম এই "চ্যালেঞ্জ" গ্রহণ করিল এবং রাত্রে দলের সকলকে অন্যত্র পাঠাইয়া দিয়া নিজে একমাত্র সাহসী পার্শ্বচর হরিশকে লইয়া 'কদলী-অভিযানে' বাহির হইল।

ভাদ্রের আকাশ ঘন-ঘটাচ্ছন্ন—বৃষ্টি নাই, কিন্তু সারাদিনই আকাশের মুখ ভার। রাত্রে চাঁদ একবার দেখা দিয়া কখন মেঘের আড়ালে লুকাইয়াছে।

রামের রূপসজ্জা বড় চমৎকার হইয়াছে। তাহার নিজের ও হরিশের মুখ কালি-মাখা। দুইটি লাঠিতে সাদা নেকড়া জড়ান হইয়াছে। দুইটি নারিকেলের মালার মধ্যে কড়ি পুরিয়া লাঠির আগায় বাঁধিয়া লইয়াছে এবং দুইটি সাদা চাদরে তাহারা আপাদমস্তক ঢাকিয়া লইয়াছে।

হরি সামন্তের বাগানের পিছনেই একটা পোড়ো বাগান—তাহাতে বেশ ঝোপঝাড়। সেই বাগানে একটা আমড়াগাছ ছিল; তাহার নাম ছিল 'ভুতুড়ে গাছ'। দিনের বেলাতেই সেই গাছের তলায় কেহ যাইত না। দুই বন্ধু সেই গাছতলায় আশ্রয় লইল। কারণ রাম ভাল করিয়াই জানিত যে, সে-দিকে কেহই যাইবে না। অতএব ধরা পড়িবার কোনও ভয় তাহাদের নাই। সেখান হইতে তাহারা দেখিল হরি সামন্ত বাম পাশে একটি লণ্ঠন ও ডান পাশে একটি লাঠি লইয়া বাগানের বেড়ার কাছাকাছি একটা পরিষ্কার জায়গায় বসিয়া দুলিয়া দুলিয়া কাশীরাম দাসের মহাভারত পড়িতেছে এবং তাহার পিছনে তাহার নেড়ি কুত্তা ভুলো নিশ্চিন্তমনে ঘুমাইতেছে।

রাত্রি বারটা বাজিয়া গেল। হরিশ বলিল—"রামদা', মশার কামড়ে আর তো পারি না।"

রাম চাপা-গলায় ধমক দিয়া কহিল—"চুপ্, না পারিস্ তো বাড়ী যা।"

ধমক খাইয়া হরিশ চুপ করিয়া গেল।

তখন রাত্রি সাড়ে বারটা। চারিদিক নিস্তব্ধ। হরিশ ও রাম উভয়ে আপাদমস্তক সাদা চাদরে ঢাকিয়া বেড়ার ধারে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর উভয়ে সাদা নেকড়া জড়ান লাঠি দুইটিকে দুই হাতে ধরিয়া তালি দিবার মত করিয়া বাজাইতে লাগিল। তাহাতে মালার মধ্যের কড়ি ঝম্-ঝম্ শব্দ করিয়া উঠিল।

হরির একটু একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। হঠাৎ চমকিয়া চাহিতেই দেখে অদূরে নিকষ অন্ধকারের মধ্যে দুইটি শ্বেতমূর্ত্তি—প্রায় চারি হাত লম্বা হাতে ঠিক তাহার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া তালি বাজাইতেছে। পলকে প্রলয় ঘটিয়া গেল। আচম্‌কা ঘুম ভাঙ্গিয়া এই অপরূপ মূর্ত্তি দেখিয়া, হরি সামন্ত ভয়ে দিগ্বিদিক-জ্ঞান-শূন্য হইয়া "বাবা গো" বলিয়া, পিছন দিকে এক লাফ মারিল; লাফাইয়া পড়িল একেবারে নিদ্রিত কুকুরের ঘাড়ে। ঘুমন্ত কুকুর এই অতর্কিত আক্রমণে প্রথমেই আত্মরক্ষার্থ হরির পায়ে খাঁক করিয়া এক কামড় বসাইয়া দিল। কুকুরের কথা হরির তখন আর

মনেই ছিল না। তাহার মনে হইল নরম কি একটা জিনিসের উপর যেন পা পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে পায়ে অসহ্য কামড়ের যন্ত্রণা।

তাহার পর মানুষ ও কুকুরের ভয়ার্ত্ত চীৎকার মিলিয়া নৈশ আকাশে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য এক নারকীয় তাণ্ডবের সৃষ্টি হইল! তারপর কে যে কোন্ দিকে ছুটিয়া পলাইল তাহা বোঝাই গেল না। অনেকক্ষণ পরে প্রতিবেশীরা দলে পুরু হইয়া কয়েকটা লাঠি ও লণ্ঠন হাতে যখন অকুস্থলে হাজির হইল, তখন দেখিল হরির মর্ত্তমান কলার গাছ দুইটি ধরাশায়ী এবং সদ্য-কাটা দুইটি কাঁদির বোঁটা হইতে তখনও আঠা ঝরিতেছে!

কলার কাঁদি লইয়া রাম ও হরিশ আড্ডায় পৌছিয়া দেখিল তাহাদের দলের অনেকেই ফিরিয়াছে বটে, কিন্তু রামের দুই-একজন পার্শ্বচর তখনও ফিরে নাই। আর সকলকে সেখানে থাকিতে বলিয়া রাম একাই তাহাদের সন্ধানে বাহির হইল।

অন্ধকারে থাকিতে থাকিতে চোখ অভ্যস্ত হইয়া গেলে, অস্পষ্ট হইলেও চোখে বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। রামদের একটি বড় আমবাগান ছিল এবং তাহার গায়েই তাহাদের একটি বড় পুকুর। সেই বাগানের ভিতরের চলা-পথ দিয়া গেলে সহজেই ভিন্ন পাড়ায় যাওয়া যায় বলিয়া রাম সেই পথেই চলিয়াছিল। হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল পুকুরের অপর পাড়ে কে একটা লোক মাথায় একটা মোট এবং হাতে একটা লাঠি লইয়া পুকুরের দিকেই আসিতেছে। চোর নাকি! ব্যাপার কি দেখিবার জন্য রাম গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিল। লোকটি পুকুরের পশ্চিম কোণে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টিপাত করিয়া সে আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া পুকুরে নামিয়া হাঁটুজল পর্য্যন্ত গেল এবং মাথার মোটটি অতি সন্তর্পণে জলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়া, আবার আস্তে আস্তে উঠিয়া আসিল। রাম দেখিল যাহা সে লাঠি মনে করিয়াছিল তাহা একটি ছোট শাবল। লোকটি শাবল দিয়া একটি গর্ত্ত খুঁড়িল এবং গামছার মধ্য হইতে একটি গোজকাঠি বাহির করিয়া সেই গর্ত্তে তাহার অর্দ্ধেকটা পুঁতিয়া মাটি চাপা দিয়া চলিয়া গেল।

লোকটি অদৃশ্য হইবার পরে রাম গাছের অড়াল হইতে বাহির হইয়া পুকুরের সেই কোণের ঘাটে আসিল এবং জলে নামিয়া, লোকটি কি রাখিয়াছে তাহা খুঁজিতে লাগিল। তাহাকে অধিক পরিশ্রম করিতে হইল না—পায়ে একটা শক্ত কি ঠেকিল। পা দিয়া ঠেলিয়া আনিতে দেখিল জিনিসটা বিষম ভারী। জিনিসটা যখন জলের উপর তুলিল, তখন রামের আর বিস্ময়ের অন্ত রহিল না। উহা একটা বড় পাথরের নুড়ি—ওজন প্রায় দশ-বার সের। তাজ্জব ব্যাপার! এই একটা পাথরের নুড়ির জন্য এত সাবধানতা—এত কাণ্ড! গভীর রাত্রির অন্ধকারে চোরের মত ইহাকে এইভাবে লুকাইয়া রাখিয়া যাইবারই বা মানে কি? প্রকৃত মানে বুঝিতে না পারিলেও রাম এইটুকু বুঝিল যে, ইহার মধ্যে একটা গভীর রহস্য লুকান আছে। সেজন্য সে নুড়িটিকে তুলিয়া

লইয়া তাহার বিপরীত দিকে অর্থাৎ পূর্ব্ব কোণে ডুবাইয়া রাখিয়া ফিরিয়া গেল এবং এই সংবাদ বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজন কাহারও নিকট ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করিল না। ... ...

দুই দিন পরের কথা। সে-দিন শনিবার। রামচন্দ্র স্কুল হইতে বাড়ীতে আসিয়াছে। এমন সময় তাহাদের বড় বাগানের ধারে ঢোল-কাঁসির বাজনা ও প্রচণ্ড কোলাহল শুনা গেল। রাম ছুটিয়া গিয়া দেখে কালু কুমোরের রক্ত চক্ষু, উস্কোখুস্কো চুল—সে কখনও হাসিতেছে, কখনও কাঁদিতেছে, কখনও ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছে। তাহার পিছনে ঢোল-কাঁসি বাজিতেছে এবং গ্রামের ছেলেমেয়ে ইতর-ভদ্র সকলেই চীৎকার করিয়া বলিতেছে—"জয় বাবা মহাদেব।"

ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে, কালু কুমোরের উপর মহাদেবের ভর হইয়াছে, মহাদেব স্বপ্নে বলিয়াছেন—তিনি এখানেই কোথাও গুপ্তভাবে আছেন। অদৃশ্যভাবে তিনি তাঁহার গোপন স্থানের দিকে কালুকে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন। এই মহাদেবকে খুঁজিয়া পাইলে কালু গ্রামের কল্যাণকল্পে স্বগৃহে দেবতার প্রতিষ্ঠা করিবে।

দেখিতে দেখিতে শোভাযাত্রা রামদের বড় পুকুরের পশ্চিম কোণে আসিয়া থামিল—কালু গড়াইতে গড়াইতে পুকুরে পড়িল। তাহার পর সে কি ডুব! ডুবের পর ডুব! প্রতিবার যখন সে ডুব দেয় তখন বাজনা বন্ধ হইয়া যায়, জন-কোলাহল স্তব্ধ হইয়া যায়—সকলেই যেন অধীর প্রতীক্ষায় দম বন্ধ করিয়া থাকে। অনেকক্ষণ পরে সে যখন জলের উপর মাথা উঠায় তখন দ্বিগুণ জোরে বাদ্যভাণ্ড বাজিয়া উঠে। আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত করিয়া সকলে একসঙ্গে চীৎকার করে —"জয় বাবা মহাদেব।" কিন্তু কোথায় মহাদেব! জনতা ক্রমে বিরক্ত ও অধীর, কালুর মুখেও হতাশার ছাপ সুপরিস্ফুট।

এমন সময়ে এক বিচিত্র কাণ্ড ঘটিল। রাম হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িল এবং অবিলম্বে উঠিয়া কালুর ভঙ্গী অনুকরণ করিয়া, মাথা নাড়িয়া নাচিতে নাচিতে বলিতে লাগিল—"আমি কুমোরের হাতে উঠ্‌ব না—আমি বামুনের হাতে উঠ্‌ব।"

ঠিক যেন ম্যাজিক! চক্ষের নিমেষে বাদ্যভাণ্ড ও জনতা কালুকে ত্যাগ করিয়া রামের পশ্চাদনুসরণ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে পুকুরের পূর্ব্ব কোণ হইতে পাথরের নুড়ি মাথায় করিয়া রাম উঠিয়া আসিল এবং যখন সে স্বগৃহে প্রস্থান করিল, তখন তাহার পিছনে সারাগ্রাম যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—আশাভঙ্গে অর্দ্ধমৃত ভূলুণ্ঠিত কালুকে দেখিবার জন্য একজনও রহিল না।

পাথরের নুড়ি সযত্নে এবং সগৌরবে দেবতার স্থান অধিকার করিয়া বসিল! রামের খাতির এবং সেই পরিবারের প্রতিষ্ঠা বিষম বাড়িয়া গেল। দূরদূরান্তর হইতে লোক আসে, মানত করে, পূজা ও পয়সা দিয়া যায়। রামের তো পথে ঘাটে চলাই দুষ্কর। এক দিক হইতে এক জন ডাকে—"দাদাবাবু, আশীর্ব্বাদটা একটু দিও।" ওদিক হইতে আর একজন বলে—"ছেলেটার অসুখ সারুছে না—পাদোদক একটু দিয়ে যাও।"

প্রথম প্রথম রামের মনে হইত—বাঃ এ তো মজা মন্দ নয়! কিন্তু তাহার পর ক্রমে আসিল বিরক্তি এবং অবশেষে সে একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল।

ঠাকুর প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরের অমাবস্যায় বিছানায় শুইয়া রাম ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে তাহার মাথা গরম হইয়া উঠিল—কতরকম এলোমেলো চিন্তা! ভাবনায় কি তাহার শেষ আছে? সে গ্রামের লোকদের বোকা বলিয়াই জানিত, কিন্তু তাহারা যে এত বোকা তাহা তো সে জানিত না। কত সহজেই তাহাদের ঠকান যায়। তাহার মনে হইল, তাহারা না হয় বোকা সরল, তাই বলিয়া তাহাদের ঠকাইয়া যে ভাবে পয়সা লওয়া হইতেছে ইহাতে প্রশ্রয় দেওয়া কি তাহার উচিত? ঈশ্বর এই পাপের জন্য তাহাকে এবং তাহার বাড়ীর লোকদের শাস্তি দিতে পারেন। নাঃ, একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে—আজই—এখনই!

নুড়ি মাথায় করিয়া রাম উঠিয়া আসিল

*　　*　　*　　*

পরদিন সকালে পুরোহিত ঠাকুর ঘরের দরজা খুলিয়া বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেলেন। কোথায় ঠাকুর? বাড়ীতে হৈ-চৈ পড়িয়া গেল—সকলে ছুটিয়া আসিল। রাম তখনও ঘুমাইতেছে। একজন ছুটিয়া গিয়া রামকে ডাকিয়া আনিল।

রামের বাবা কাঁদিয়া বলিলেন—"বাবা রাম, ঠাকুর আমাদের ছেড়ে গেছেন।"

গম্ভীর গলায় রাম বলিল—"তিনি নিজে যান নি, আমি তাঁকে দিয়ে এসেছি।"

—"কোথায়?"

—"চূর্ণী নদীর জলে।"

ক্রোধে, বিস্ময়ে, ভয়ে কাহারও মুখে কথা নাই।

ঠাকুর গিয়াছেন তাহাতে কাহার কতটুকু ক্ষতি বোধ হইতেছিল বুঝা গেল না। তবে রামের বাবার চোখে ভাসিয়া উঠিল একটা সুবৃহৎ আয়ের অঙ্ক—যাহা ঠাকুরের কল্যাণে এক মাসেই দেখা গিয়াছিল এবং যাহা ঠাকুরের সঙ্গেই চূর্ণীর জলে ডুবিল! রামের বাবা চীৎকার

করিয়া উঠিলেন—"হতভাগা, পাজী, কুলাঙ্গার, সংসারের শনি।" বলিয়া তাহাকে মারিবার জন্য পায়ের জুতা খুলিলেন। বাড়ীর মেয়েরা ভয়ে আড়ষ্ট!

পুরোহিত মহাশয় রামের বাবাকে বাধা দিয়া রামকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এরকম কর্‌বার মানে?"

রাম অবিচলিত কণ্ঠে বলিল—"তিনি আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছেন—তাঁর সেবার ত্রুটি হচ্ছে। এখানে থাকলে সংসারের অকল্যাণ হবে। তাই তিনিই আমাকে আদেশ দিয়েছিলেন চূর্ণীর জলে তাঁকে বিসর্জ্জন দিয়ে আস্‌তে।"

একথা কেহ বিশ্বাস করিল কিনা কে জানে, কিন্তু রামের বাবার শিথিল মুষ্টি হইতে জুতা পড়িয়া গেল।

ফাউণ্টেন্ পেন্

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত

একশত বৎসর পূর্ব্বেও পালকের কলমই মানুষের লেখনী-রূপে ব্যবহৃত হইত। গত শতাব্দীর প্রারম্ভেই যদিও নিব আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তথাপি ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে নিবের প্রচলন হয় নাই। তারপরেই সহসা দেখা গেল, প্রায় সকলেই নিব ব্যবহার করিতে সুরু করিয়াছে। নিবের চাহিদা অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাইল। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের অন্তর্গত বার্মিংহামে দুই হাজার লোক নিব তৈরীর কাজে নিযুক্ত হয়; তখন সপ্তাহে গড়ে ৬৫ হাজার গ্রোস্ নিব তৈরী হইতেছিল।

সোনার কলম—ফাউণ্টেন্ পেন্—প্রথম তৈরী হয় আমেরিকায় ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে; বাজারে বাহির হয় ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু তখন জনসাধারণের নিকট উহা সমাদর লাভ করে নাই। তখন উহার ব্যবহার-প্রণালী ছিল জটিল; তা' ছাড়া, দামও ছিল খুব বেশি। গত শতাব্দীর শেষভাগে ফাউণ্টেন্ পেনের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়; কিন্তু তখনও সেল্‌ফ্-ফিলিং কলম ছিল না। গত বিশ বৎসরের মধ্যে ফাউণ্টেন্ পেনের প্রচলন অসম্ভব রকম বাড়িয়া

গিয়াছে। আজকাল য়ুরোপ-আমেরিকার স্কুল-কলেজের প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীই ফাউণ্টেন্ পেন্ ব্যবহার করে। বলা বাহুল্য, আমাদের দেশেও ইহার ব্যবহার বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ফাউণ্টেন্ পেনের চারিটি অংশ—নল, নিব, জিভ্ আর ক্যাপ্। এই অংশগুলি খুব যত্নের সহিত তৈরী করা হইয়া থাকে; ব্যবহারোপযোগী করিবার পূর্ব্বে প্রায় ১৩০ রকমে ঐ অংশগুলি পরীক্ষা করা হয়।

নল আর ক্যাপ্ তৈরী করিতে অতি উৎকৃষ্ট রবারের আবশ্যক। প্রথমতঃ রবার একপক্ষ কাল জলে ভিজাইয়া, পরে যন্ত্রের সাহায্যে পেষণ করিয়া চূর্ণ ও পরিশ্রুত করা হয়। অতঃপর আগুনে রাখিয়া উহার সঙ্গে গন্ধক মিশানো হয়। এই কাজটা খুব শক্ত, তাই খুব সাবধানতার সহিত করা দরকার। কেননা, রবারটা শক্ত হওয়া প্রয়োজন, এবং উহার স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity) যেন বজায় থাকে তাহাও দেখিতে হইবে। রবার সাধারণতঃ নরম; সুতরাং উহাকে কোন কাজে লাগাইবার জন্য শক্ত করিবার উদ্দেশ্যে উহার সঙ্গে গন্ধক মিশাইয়া একত্রে জ্বাল দেওয়া হয়। এই প্রণালীর নাম ভাল্‌কেনিজেসন্ (Vulcanisation); ইহার আবিষ্কারক মিঃ গুড্ইয়ার, যাঁহার নামে বাজারে মোটর টায়ার বিক্রয় হইতেছে।

রবারটা এইভাবে প্রস্তুত হইবার পরে ফাউণ্টেন্ পেনের সমস্ত অংশ তৈরী সুরু হয়। বড় বড় কারখানায় এই সমস্ত কাজ হাতে করা হইয়া থাকে। তারপর বিভিন্ন অংশগুলি পালিশ করিয়া পরীক্ষা করা হয় এয়ার্-টাইট্ হইল কি না—অর্থাৎ দেখিতে হইবে যাহাতে উহার মধ্যে বায়ু চলাচলের কোন পথ না থাকে। এই পরীক্ষা-কার্য্যের প্রণালী হইল—কলমটাকে জলের মধ্যে রাখিয়া একটা সিরিন্‌জ্ দ্বারা উহার মধ্যে বায়ু প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করা।

খাঁটি সোনা অত্যন্ত নরম, উহা দ্বারা নিব তৈরী করা সম্ভব নয়। তাই ফাউণ্টেন্ পেন্ নির্ম্মাণকল্পে উহার সঙ্গে রৌপ্য-মিশ্রিত করিয়া ১৪ ক্যারাট্ সোনায় পরিণত করা হয়। নিব তৈরী করার পক্ষে সোনার আর একটা অসুবিধাও আছে। এই ধাতু এত নরম যে, সহজেই ক্ষয় পায়। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য ফাউণ্টেন্ পেনের অগ্রভাগে দুষ্প্রাপ্য এবং বহুমূল্য ধাতু 'ইরিডিয়ম্' ব্যবহার করা হয়।

১৭৯২ খৃষ্টাব্দে রবিন্‌সন্ নামক জনৈক ইংরেজ কলম-ব্যবসায়ী কেবলমাত্র ইরিডিয়ম্ দ্বারাই কলম তৈরী করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু ধাতুটা নিতান্ত কঠিন

বলিয়া কাজে লাগাইতে পারেন নাই। ত্রিশ বৎসর পরে আইজাক্ হকিন্স্ নামে এক ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার ইরিডিয়ম্‌কে কাজে লাগাইবার পন্থা আবিষ্কার করেন। দেখা গেল, ইরিডিয়মের একটি অতি সূক্ষ্ম কণা সোনার নিবের অগ্রভাগে এমনভাবে লাগাইয়া দেওয়া যায় যে, তাহা আর কখনও খসিয়া পড়িবে না।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সোনার পাতকে প্রথমতঃ পিটাইয়া লইয়া তারপর প্রয়োজন মত বাঁকানো হয়; অতঃপর যন্ত্রের সাহায্যে নিবের অগ্রভাগ চিরিয়া দেওয়া হয়। আসল সূক্ষ্ম কাজ হইল—নিবের আগায় ইরিডিয়ম্ লাগানো; কেননা, ঐ শক্ত এবং বহুমূল্য ধাতুর মাত্র দুইটি গ্রেন্ ব্যবহার করা দরকার। অত্যন্ত ক্ষমতাশালী আতস্ কাঁচ বা ম্যাগ্‌নিফাইয়িং গ্লাস্ চোখে লাগাইয়া অগ্নিশিখার সাহায্যে সোনায় আর ইরিডিয়মে মিশ খাওয়াইতে হয়। অতঃপর নিবটা পালিশ করিয়া কলমের মধ্যে লাগান হয়।

যে ঘরে সোনার নিব তৈরী হয় সেখানে স্বর্ণরেণু বা গোল্ড্-ডাষ্ট্ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে—কতক ঘরের মেঝেতে, কতক দেওয়ালে, কতক বা কারিকরদের গায়ে। কারিকরেরা এক বিশেষ রকমের জামা পরিয়া কাজ করে। ঐ জামা ধোয়া হয় না; একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে জামাগুলি পোড়াইয়া ছাইএর ভিতর হইতে সোনা সংগ্রহ করিয়া লওয়া হয়।

সোনার নিবের বিশেষত্ব এই যে, উহাতে মরিচা পড়ে না, যেমন নাকি ষ্টিলের নিবে পড়ে। তুমি একমাস কিংবা একবৎসরকাল একটা ফাউণ্টেন্ পেনের নিব কালিভরা দোয়াতে ডুবাইয়া রাখ না কেন, উহার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হইবে না। অথচ, একটা ষ্টিলের নিব একেবারে মরিচা পড়িয়া নষ্ট হইয়া যাইবে।
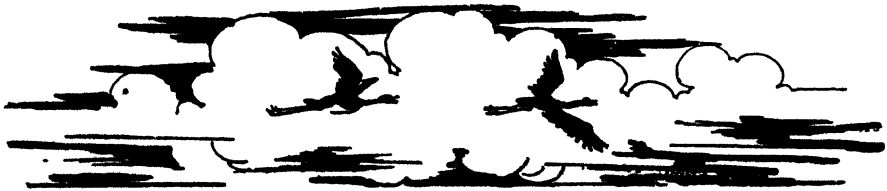
শরৎ

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মৌলিক, এম. এ., বি. এল.

বিজয়-কেতন উড়িয়ে কাশের বনে,
শ্যামল শোভা ছড়িয়ে আপন মনে,
কমল-বনে নাম্‌লো কে আজ আসি ?
নীহার ঝরে শ্যামল দূর্ব্বাদলে,
শিউলী রাশি রাঙা চরণতলে,
চাঁপার কলি উঠ্‌লো জেগে হাসি !!

দোয়েল শ্যামার মধুর গানে গানে
তরুণ তপন উজল প্রভাত আনে,
ধানের শীষে পরশ জাগে কার ?
উঠ্‌ছে জেগে কোমল কিশলয়,
আলোর ধারা সারা ভুবনময়,
আকাশ-গলে দুল্‌ছে তারার হার !!

অতিকায় সাপ

শ্রীবরদাকুমার পাল

সাপ সকলেরই পরিচিত। কখনও সাপ দেখে নাই এমন লোক আছে কি ? যাহারা গ্রামে বাস করে তাহারা পথে-ঘাটে, এমন কি ঘরের কোণেও সাপ দেখিতে পায়। আর যাহারা বড় বড় সহরে থাকে তাহারা যেখানে-সেখানে সাপ দেখে না বটে, কিন্তু চিড়িয়াখানায় আবদ্ধ সাপ দেখা তাহাদের ভাগ্যেও ঘটে। সাপের আকৃতি কুৎসিত এবং প্রকৃতি হিংস্র বলিয়াই আমরা তাহাকে ঘৃণার চোখে দেখি। সাপ সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী।

সারা পৃথিবীতে কত রকম সাপ আছে তাহা সঠিক বলা অসম্ভব। ছোট-বড়, সরু-মোটা—এইরূপ নানা আকারের সাপ দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ আমেরিকায় এক শ্রেণীর সাপ আছে তাহার দৈর্ঘ্য মাত্র চারি ইঞ্চি, দেখিতে উহা মোটা সূচের মত ; আবার সেই দেশেই এনাকোণ্ডা নামে যে সাপ আছে তাহার দৈর্ঘ্য ত্রিশ হইতে পঁয়ত্রিশ ফুট, আর দেহখানি তালগাছের গুঁড়ির মত !

সাপ বিষধর প্রাণী হইলেও সব রকম সাপের বিষ নাই। আমাদের দেশে স-বিষ সাপের মধ্যে গোক্ষুরই প্রধান। আর নির্ব্বিষ সাপের মধ্যে ঢোঁড়া সাপ ত পথে-ঘাটে প্রায়ই দেখা যায়। ঢোঁড়া ছাড়া দোমুখী, দাঁড়াশ, নলডুগী প্রভৃতিও নির্ব্বিষ বলিয়া পরিচিত। কোন্ সাপ স-বিষ আর কোন্ সাপ নির্ব্বিষ তাহা ঠিক করা সহজ ব্যাপার নয়। কাজেই সব রকম সাপকেই বিষধর মনে করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে দূরে থাকা ভাল।

যাহা হউক, সকল রকম সাপের কথা এখানে আলোচনা করা হইবে না—কেবল মাত্র অতিকায় সাপ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা হইতেছে।

অতিকায় সাপের সাধারণ নাম অজগর। অজগর শব্দে সেই প্রাণীকেই বুঝায়—যে অজ বা ছাগল গিলিয়া খাইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে অজগরেরা শুধু ছাগলই খায় না—ছাগলের চেয়ে ছোট ও বড় অনেক প্রাণীই খাইয়া থাকে। ইঁদুর, খরগোস হইতে আরম্ভ করিয়া গরু, মহিষ, হরিণ প্রভৃতি বড় বড় প্রাণীকেও তাহারা উদরস্থ করে। বাগে পাইলে জীবশ্রেষ্ঠ মানুষকে গিলিয়া ফেলিতেও তাহারা কসুর করে না। এমন যে অদ্ভুত শক্তিশালী প্রাণী—তাহার জীবন-কথা জানিতে কৌতূহল হয় না কি ?

অজগরেরা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; তাহাদের নাম—ময়াল বা পাইথন (Python), আর বোড়া বা বোয়া (Boa)।

ময়াল সাপের ইংরাজি নাম 'পাইথন'। এই নামটির উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের অভিমত এই যে, গ্রীক্ দেবতা এপোলো পিথিয়ান উপত্যকায় (Pythian Vale) একটি অতিকায় দৈত্যকে বধ করেন; সেই দৈত্য ছিল সর্পাকৃতি। পিথিয়ান উপত্যকার দৈত্য বলিয়া উহার নাম দেওয়া হইয়াছিল 'পাইথন'। বলা বাহুল্য, তখন হইতে ঐরূপ বিরাটবপু সাপকেই পাইথন বলা হয়।

প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের চেষ্টার ফলে জানা গিয়াছে—পৃথিবীতে নয় রকমের ময়াল এবং চল্লিশ রকমের বোড়া সাপ আছে।

বোড়া সাপ

মাটিতে গর্ত্তের ভিতরে, বৃক্ষকোটরে, জঙ্গলের মধ্যে লতাপাতার আড়ালে সাপেরা থাকে—একথা আমরা জানি। যাহাদের আকার ছোট তাহারাই এইভাবে বাস করে। অজগরের দেহ নেহাৎ ছোট নয়—এক একটি দশ-বার ফুট হইতে পঁয়ত্রিশ বা চল্লিশ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে; আবার সেই অনুপাতে দেহের স্থূলতাও কম-বেশি হয়। এই সব কারণে লোকালয়ের কাছে—যেখানে গাছপালা কম, সেখানে অজগরেরা থাকে না—থাকিতে পারেও না। যেস্থান গভীর জঙ্গলে ঢাকা—যেখানে কেবলই পশু-পক্ষীর রাজত্ব, তেমন স্থানে আস্তানা করে অজগরেরা। দুঃসাহসী লোকেরা খেয়াল-বশে অথবা শিকারের নেশায় সেই সব নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করিলে উহাদের দেখা পায়।

আমাদের দেশে সুন্দরবনে, তরাই অঞ্চলে, আসাম, মধ্যপ্রদেশ ও দাক্ষিণাত্যের জঙ্গলময় স্থানে ময়াল দেখা যায়। বোড়া সাপ এই দেশে খুবই কম—একরূপ নাই

বলিলেই চলে। এই দেশের ময়াল বিশ ফুট পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণস্থ কয়েকটি দেশে (যেমন—মালয় উপদ্বীপ, শ্যাম, ইন্দোচীন, ব্রহ্মদেশ) ত্রিশ ফুট দীর্ঘ ময়ালও আছে। আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জঙ্গলে যে সব ময়াল থাকে উহারা সাধারণতঃ পনের ফুট পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউগিনি দ্বীপেও ময়াল আছে, কিন্তু তাহারা অত বড় হয় না। পূর্ব্বোক্ত কয়েকটি দেশ ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোথাও ময়াল সাপ বিশেষ দেখা যায় না।

উত্তর আফ্রিকায়, দক্ষিণ আমেরিকার কোন কোন স্থানে, ইউরোপের গ্রীসদেশে এবং ভারত মহাসাগরের কোন কোন দ্বীপে বোড়া সাপের বাস।

ময়াল ও বোড়া সাপের দেহের গঠনে কয়েকটি পার্থক্য দৃষ্ট হয়। সকল রকম সাপের চর্ম্ম আঁইসযুক্ত হইলেও ময়ালের লেজের নীচে দুই সারি আঁইস থাকে; বোড়ার তাহা নাই। ময়ালের অক্ষিকোটরের উপরে দুইটি হাড় আছে, বোড়ার চোখের সাম্‌নে তাহার বদলে বিস্তৃত শল্ক দেখা যায়। উভয় জাতীয় সাপের বর্ণেও কিছু কিছু পার্থক্য আছে। কোন অজগরেরই বিষদাঁত নাই। ময়ালের মুখে থাকে তিন সারি দাঁত।

উহাদের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য এই যে—ময়াল খুবই হিংস্র ও উগ্র-স্বভাব, আর বোড়া কিছু শান্ত-প্রকৃতি। আহার্য্য বিষয়েও কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। ময়াল সর্ব্বভুক—উহার সম্মুখে ছোট-বড় যে-কোন প্রাণী পড়িলে তাহার আর নিস্তার নাই, কিন্তু বোড়া ছোট ছোট প্রাণী শিকার করিতেই ভালবাসে।

অজগরের দেহ যেমন বৃহৎ সেই দেহের পোষণোপযোগী প্রচুর খাদ্যও তো চাই। অথচ আহার সংগ্রহের জন্য একমাত্র মুখই উহাদের প্রধান সহায়। এই কারণেই উহাদের মুখের গঠনে পরম কারুণিক পরমেশ্বর এক অদ্ভুত নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। সকল রকম জীবের মাঢ়ী জোড়া; অথচ অজগরদের মাঢ়ী ছোট ছোট হাড়ের সমবায়ে গঠিত। এইজন্য উহারা যতটুকু আবশ্যক মুখব্যাদান করিতে পারে। তা' ছাড়া, অজগরের এবং অন্যান্য সাপেরও দাঁতগুলি ভিতরের দিকে বাঁকানো।

দাঁতের ও মাঢ়ীর বিশেষত্ব থাকাতে অজগরেরা খুব বড় বড় প্রাণীকেও অনায়াসে গিলিতে পারে এবং কোন প্রাণী একবার উহাদের মুখগহ্বরে প্রবিষ্ট হইলে কোনমতে বাহির হইতে পারে না। বলা বাহুল্য, দাঁত ভিতর দিকে বাঁকানো থাকায়, সাপেরা কোন শিকারকে ছাড়িয়া দিতে চাহিলেও তাহাতে সফলকাম হয় না। সম্ভবতঃ ঐ কারণেই

আমাদের দেশে "সাপের ছুঁচো গেলার" প্রবাদটা প্রচলিত হইয়াছে। সাপ প্রথমতঃ ছুঁচোকে বাগে পাইয়াই খাইতে থাকে, পরে উহার উগ্র গন্ধ যখন অসহ্য মনে হয়, তখন উগরাইয়া ফেলিতে চেষ্টা করে, কিন্তু শিকারটি বাঁকানো দাঁতে আটকাইয়া যায় বলিয়া, তাহাতে কৃতকার্য্য হয় না।

অজগরেরা—বিশেষতঃ অতিকায় ময়ালগুলি শৃগাল, শূকর, হরিণ প্রভৃতিকে অনায়াসে গিলিয়া ফেলে। বড় বড় মহিষ, গবয় এবং বাঘকে আক্রমণ করিতেও তাহারা পশ্চাৎপদ হয় না। অবশ্য বৃহদাকার শিকার ধরিতে যাইয়া সময় সময় উহাদের যথেষ্ট দুর্ভোগ হয়—কোন কোন সময় প্রাণহানিও ঘটে। অনেক সময় অজগর বড় বড় শৃঙ্গযুক্ত হরিণকে পেছনদিক হইতে গিলিতে আরম্ভ করে; হরিণের গলা পর্য্যন্ত উদরস্থ হইলে, বিরাট শৃঙ্গযুক্ত মাথাটার কোন কিনারা করিতে পারে না, কাজেই তখন অচল অবস্থায় পড়িয়া থাকে। ঐরূপ-ভাবে তাহাকে দেখিলে শৃঙ্গধর সাপ বলিয়া ভ্রম হয়। সেই অবস্থায় অনেক দিন পড়িয়া থাকার পর সে প্রাণ হারায়।
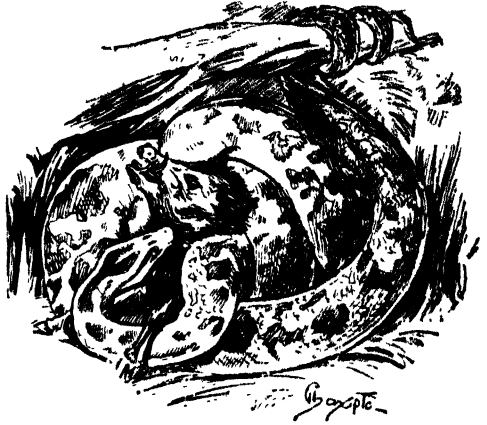
ময়ালের কবলে শূকর

অজগরদের এইরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা যে, একটি পরিণত-বয়স্ক মানুষকে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সাবাড় করিতে পারে! বড় বড় জানোয়ারকে কাবু করিতেও উহাদের দশ-পনের মিনিটের বেশি সময় লাগে না। কোনও বড় প্রাণীকে উদরস্থ করিলে উহারা কয়েকদিন চুপচাপ পড়িয়া থাকে। বলা বাহুল্য, তখন উহাদিগকে হত্যা করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না।

জঠরজ্বালা বাড়িতে থাকিলে ময়াল নিকটবর্ত্তী হ্রদ বা জলা-জায়গার ধারে কোনও গাছে উঠে, তারপর উহার শাখায় লেজ জড়াইয়া ঝুলিতে থাকে। বনের কোনও তৃষ্ণার্ত্ত জানোয়ার সেই পথ দিয়া জলপানের জন্য অগ্রসর হইলে, সে অতর্কিতভাবে ঐ হতভাগ্য জানোয়ারের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং লেজ দ্বারা শিকারের গলায় অথবা বুকে পেঁচ

কসিতে থাকে। সেই চাপে প্রাণীটির প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যায় এবং দেহের হাড় চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া দেহখানি পিণ্ডাকার হয়। তখন সুরু হয় ভোজন-পর্ব্ব।

অজগরেরা ক্রমাগত অনেক দিন অনাহারেও থাকিতে পারে। উহাদের গায়ে মেদের প্রাচুর্য্য হেতু উপবাসের ফলে শরীরের কোন ক্ষতি হয় না।

ডিম্ব প্রসবের সময় হইলে স্ত্রী-অজগর কোনও নিভৃত স্থানে যায় এবং ক্রমান্বয়ে ডিম পাড়িতে থাকে। যাহার দেহ বড় সে বেশি সংখ্যক ডিম পাড়ে। অজগরী এক একবারে পনেরটি হইতে ষাটটি পর্য্যন্ত ডিম পাড়িয়া থাকে। কোন কোন বৃহৎ অজগরী একশত ডিমও পাড়ে। ডিমগুলি আকারে হাঁসের ডিমের মত।

ডিম পাড়া শেষ হইলে আরম্ভ হয় তা'-দেওয়ার কাজ। তা'-দেওয়ার জন্য ডিমগুলিকে স্তূপীকৃত করিয়া সর্পী আপন দেহ তাহাদের চারিদিকে কুণ্ডলী পাকাইয়া

ময়ালের কবলে গবয়

রাখে, এবং মাথাটিকে সকলের উপরের ডিমের উপর রাখিয়া অচলভাবে পড়িয়া থাকে। ডিম ফুটিয়া বাচ্ছা হইবার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। কোন কোন সময়ে একমাসেও ডিম ফোটে, আবার কখনও তাহাতে তিন-চারি মাসও লাগে। যতদিন পর্য্যন্ত ডিম ফুটিয়া বাচ্ছা বাহির না হয় ততদিন সর্পী অনাহারে নিশ্চল অবস্থায় পড়িয়া থাকে। ডিম হইতে বাহির হওয়ার সময় অজগর-শিশু দুই ফুটের বেশি বড় হয় না।

সাধারণতঃ সাপেরা বৎসরে একবার মাত্র খোলস বদলায়; কিন্তু পর্য্যবেক্ষণের ফলে জানা গিয়াছে, অজগরেরা প্রত্যেক ঋতুতেই খোলস বদলায়। অজগর কতদিন বাঁচিয়া থাকে তাহা সঠিক জানা যায় নাই। তবে চিড়িয়াখানায় উহাদের কোন কোনটিকে পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্তও বাঁচিতে দেখা যায়।

আফ্রিকার আদিম অধিবাসী কাফ্রিরা অজগরের মাংস খাইতে ভালবাসে। তা' ছাড়া উহাদের চামড়ায় সৌখীন জুতা তৈয়ারী হয়। এই জন্য কাফ্রি শিকারীরা ময়াল শিকার করিয়া থাকে। কয়েকখানি কম্বল লইয়া উহারা ময়াল ধরিতে যায় এবং ময়াল দেখিলেই খুব সন্তর্পণে উহার সামনে একখানা কম্বল ধরে। কম্বলকে আততায়ী মনে করিয়া ময়াল তাহাতে ছোবল মারে এবং তার ফলে উহার বাঁকা দাঁত কম্বলে আটকাইয়া

এনাকোণ্ডা

যায়। অমনি অন্য কম্বল দ্বারা শিকারীরা ময়ালের মাথা চাপিয়া ধরে এবং উহার গলায় ফাঁস লাগাইয়া দেয়। শিকারীরা গুলী করিয়াও অজগর হত্যা করে।

অজগরের মধ্যে বোড়া কতকটা শান্ত-স্বভাব হইলেও দক্ষিণ আমেরিকার এনাকোণ্ডা নামক বোড়া সাপ খুবই হিংস্র। অজগরের মধ্যে সম্ভবতঃ উহারাই বৃহত্তম। উহারা জলে স্থলে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে পারে। উহাদের আড্ডা মেক্সিকো হইতে ব্রেজিল দেশে—প্রধানতঃ আমাজন নদীর তীরস্থ জঙ্গল ও জলাভূমিতে। আবশ্যক হইলে উহারা লোকালয়ে প্রবেশ করিয়া মানুষ ও গৃহপালিত পশু হত্যা করিয়া থাকে। যে সব

হ্রদ বা বিলে এনাকোণ্ডা বিচরণ করে, সেখানে যে কোন রকম মৎস্য বা জলচর প্রাণী থাকিতে পারে না তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। সুখের বিষয় ঐ রাক্ষুসে প্রাণী আমাদের দেশে আস্তানা করে নাই।

ময়াল-শিশুগণে পরিবেষ্টিত অধ্যক্ষ চার্লস লে

দুই-তিন বৎসর আগে একটি সাময়িক পত্রিকায়, দুরন্ত ময়াল সাপকে পোষ মানানো সম্বন্ধে একটি মনোরম প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। তাহা হইতে জানিতে পারা যায়, মাদ্রাজ লয়োলা কলেজ মিউজিয়মের অধ্যক্ষ চার্লস লে আটটি ময়াল-শিশু পুষিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, অজগর-শিশুদের পুষিবার কালে, সময় সময় উহাদের দংশন-যন্ত্রণাও তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল। তাহা হইলেও শেষ পর্য্যন্ত তাহারা হিংস্র স্বভাব অনেকটা ভুলিয়া গিয়াছিল এবং কোনও অনিষ্ট না করিয়া তাঁহার বুকে পিঠে ঘুরাফিরা করিত। অবশ্য অধ্যক্ষ সাহেব যেরূপ ধৈর্য্য সহকারে উহাদের চালচলন ও আহার্য্য সম্বন্ধে যত্ন লইয়াছিলেন, সেইরূপ করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

ইহা হইতে বুঝা যায়, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের সহিত চেষ্টা করিলে এবং সঙ্গে সঙ্গে একটু ভালবাসা দেখাইতে পারিলে হিংস্র প্রাণীও কতক পরিমাণে স্বধর্ম্ম ভুলিতে পারে।

মুক্তার কথা

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম এস্-সি

যে জিনিস যত দুর্লভ সে জিনিস তত দামী। তার উপর যদি সেই জিনিসের চেহারায় একটু জলুস থাকে তবে তো কথাই নাই। হীরা, পান্না, মণি, মুক্তা, চুনী প্রভৃতি সব রকম রত্ন সম্বন্ধেই এ কথা খাটে। অথচ গোড়া খুঁজিয়া দেখ,—আসলে উহার কোনটাই এমন কিছু "আহা মরি" গোছের জিনিস নয়। পণ্ডিতেরা বলেন, হীরা আর কয়লা আসলে একই জিনিস দিয়া তৈরী। চুনী-পান্নাও পাথরের টুক্‌রা ছাড়া আর কিছুই নয়; রাসায়নিকের চোখে একটা বালির দানা আর এই সব রত্নের উপাদানে খুব বিশেষ তফাৎ নাই।

মুক্তা সম্বন্ধেও অনেকটা ঐ কথা খাটে। মুক্তার জন্ম-কাহিনী খুঁজিলে দেখা যাইবে—হয় এক টুক্‌রা বালির দানা, নয় একটা পাথরের বা ভাঙ্গা কাঠের কুচি কিংবা বড় জোর কোন মরা জন্তুর কঙ্কালের একটুখানি গুঁড়া—এই রকম কিছু একটার উপর আস্তর বসাইয়া মুক্তা তৈরী হইতেছে, আর সভ্য মানুষ তাহাই হাজার হাজার—লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়া কিনিয়া লইতেছে!

মুক্তার জন্ম কাহিনী বাস্তবিকই ভারি অদ্ভুত। মুক্তা পাওয়া যায় শুক্তি বা এক জাতের ঝিনুকের পেটে—এ খবর হয়তো অনেকেই রাখ। আমাদের পুরাণে এবং অনেক সংস্কৃত গ্রন্থে কিন্তু আরও অনেক জায়গা হইতে মুক্তার উৎপত্তির উল্লেখ আছে। যেমন—হাতীর মাথায়, সাপের মাথায়, তিমি মাছের মধ্যে, শূয়োরের দাঁতে, শঙ্খের ভিতর, অভ্রে, বেণু বা বাঁশে, এমন কি বাঘের শরীরে এবং আকাশের মেঘেও নাকি মুক্তা পাওয়া যাইতে পারে। হাতীর মাথার মুক্তাকে বলা হয় গজমুক্তা। তোমরা বড় হইয়া যখন কালিদাসের মহাকাব্য 'কুমারসম্ভব' পড়িবে তখন তার একজায়গায় এই গজমুক্তার ভারি চমৎকার বর্ণনা পাইবে। হিমালয়ের শিকারীরা সিংহের খোঁজে ঘুরিতেছে, কিন্তু সিংহের পদচিহ্ন পাওয়ার উপায় নাই—তুষারে সেই পদচিহ্ন ধুইয়া গিয়াছে। কিন্তু শিকারীরা তা সত্ত্বেও সিংহের গমনপথ খুঁজিয়া পাইতেছে তাহাদের পায়ের নখ হইতে খসিয়া পড়া গজমুক্তা লক্ষ্য করিয়া। হিমালয়ের উপর সিংহ ও হাতীতে সর্ব্বদাই যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের সময় সিংহেরা হাতীর মাথায় (গজকুম্ভে) থাবা মারিবার চেষ্টা করে এবং সেই সময় হাতীর মাথার গজমুক্তা তাহাদের নখে আটকাইয়া যায়। তারপর পাহাড়ের উপর দিয়া ফিরিয়া যাইবার সময় সিংহদের রক্তমাখা পায়ের চিহ্ন বরফ-গলা জলে ধুইয়া গেলেও ঐ মুক্তাগুলি নখ হইতে খসিয়া গিয়া সমস্ত পথময় ছড়াইয়া পড়ে, আর তাই দেখিয়া শিকারীরা বুঝিতে পারে এইখান দিয়া সিংহ গিয়াছে।

কিন্তু গজমুক্তা বা ঐ সব রকমারি জায়গার মুক্তার কথা গল্পে-কাহিনীতেই পাওয়া যায়,

তাহাদের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় আমাদের হয় নাই। তবে শঙ্খের মধ্যে মাঝে মাঝে মুক্তা দেখা যায় বটে। শামুক, জোংড়া—এগুলির মধ্যেও নাকি মুক্তা দেখা গিয়াছে—তবে কদাচিৎ। আসল মুক্তার খোঁজ পাইতে হইলে মুক্তা-জননী ঝিনুকের শরণ নেওয়া ছাড়া উপায় নাই।

তোমরা অনেকেই হয়তো পুরীতে সমুদ্রের ধারে ঝিনুক দেখিয়াছ। সমুদ্রতীরে ঝিনুক কুড়ানো একটা বড় রকমের আমোদ। সামুদ্রিক ঝিনুকগুলি দেখিতেও ভারি চমৎকার—তাহাদের গায়ে, পিঠের উপর কত রকমারি কারিকুরি! ভিতরের দিক্‌টাও কেমন উজ্জ্বল! তাহার উপর আলো পড়িলে যেন ঠিকরাইয়া আসিতে চায়। এই ঝিনুকগুলি কিন্তু আসলে এক রকম জলের পোকা;—ঠিক পোকা বলা চলে না, বলিতে হয় সেই পোকার বর্ম্ম। কচ্ছপের যেমন খোল, এও সেই রকম আর কি! এই বর্ম্ম থাকে ঝিনুক পোকার শরীরের দু'ধারে দুইটি,—ঠিক যেন বাক্স আর তার ডালা। ঝিনুক পোকা থাকে এই বাক্সের মধ্যে। ইচ্ছা করিলে এই বাক্স সে খুলিয়া ফেলিতে পারে, আবার দরকার হইলে চট্‌পট্ বন্ধও করিতে পারে।

অষ্ট্রেলিয়ায় প্রাপ্ত অদ্ভুত মুক্তা—'গ্রেট সাউদার্ন ক্রুশ পার্ল'
(ইহা নয়টি মুক্তার সমবায়ে ক্রুশের আকারে গঠিত)

প্রথম অবস্থায় ঝিনুক পোকার শরীর থাকে নরম; বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই খোলস বা বর্ম্ম তৈরী হইতে থাকে, তখন বাধ্য হইয়াই তাহাকে সমুদ্রের তলায় নামিয়া যাইতে হয়। মোটা ভারী শরীর লইয়া ঘোরা-ফেরা যে খুব আরামদায়ক নয় তা তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈশ্বরেচ্ছায় একটু বপুষ্মান্ তাহারাই জান। ঝিনুক পোকার বেলায়ও সেই কথাই খাটে। জলের নীচে কত পাথর, ডুবো পাহাড়, জলজ উদ্ভিদ্ পড়িয়া আছে, সুবিধামত তাহাদের একটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া ঝিনুক পোকা ডালাটি খুলিয়া দেয়। হু-হু করিয়া সমুদ্রের জল ডালার ভিতর দিয়া বহিয়া যায়; তার মধ্যে খাবারের অভাব নাই, সুবিধামত ধরে আর খায়। দিব্যি আরামের জীবন।

কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখ ভগবান্ সকলের ভাগ্যে রাখেন নাই। ঝিনুক পোকার অদৃষ্টেও মাঝে মাঝে আপদ্ আসিয়া জোটে। হঠাৎ হয়তো ছোট্ট এক টুক্‌রা মাটি বা বালির দানা বা ভাঙ্গা কঙ্কালের টুক্‌রা বা ঐ রকম কোন ক্ষুদে জিনিস জলে ভাসিতে ভাসিতে বাক্সরূপী খোলসের মধ্যে গিয়া ঢুকিল, তারপর জলের তোড়ে বাহির না হইয়া সেখানেই মৌরসী পাট্টা গাড়িয়া বসিল। ঝিনুক পোকার দিক্ দিয়া দেখিলে এটি খুব আরামদায়ক ব্যাপার নয়। পিঠের তলায় যদি সর্ব্বক্ষণ একটা "প্রকাণ্ড" খসখসে জিনিস আঁটিয়া বসিয়া থাকে তবে কারই বা ভাল লাগে? কিন্তু উপায় নাই, হাত দিয়া ঐ আপদ্‌কে তাড়াইবার শক্তি ঝিনুক পোকার নাই।

শুক্তির বুকে মুক্তা

কিন্তু সে উপায় না থাকিলেও ভগবান্ আর একটা অদ্ভুত শক্তি তাহাদের দিয়াছেন। ঝিনুক পোকা তাহাদের শরীর হইতে এক রকম অদ্ভুত রস বাহির করিয়া তাই দিয়া ঐ খসখসে জিনিসটাকে ঢাকিতে আরম্ভ করে। ক্রমে সে রস জমিয়া যায়—ঝিনুক পোকা তার উপর আবার নূতন রসের আস্তর বুলাইয়া বুলাইয়া সমস্ত জিনিসটাকে ক্রমাগত মসৃণ করিতে থাকে। ক্রমে সে আস্তরও জমিয়া যায়। এই ভাবে দিনের পর দিন ঝিনুক পোকার বর্ম্মের ভিতর সেই ছোট্ট বালির দানা বা হাড়ের গুঁড়া চেহারা বদলাইতে বদলাইতে হইয়া পড়ে এক অপরূপ সুন্দর, অতি-উজ্জ্বল মসৃণ পদার্থ। ইহারই নাম মুক্তা।

পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন ঝিনুক পোকার ডালার ভিতরের দিকে যে উজ্জ্বল, মসৃণ সাদা অংশ আছে—যাকে ইংরাজী চলতি কথায় বলা হয় "মাদার অব্ পার্ল্" অর্থাৎ "মুক্তা-জননী"—সেগুলি আর এই মুক্তারস একই জাতীয় পদার্থ। তাঁহারা ঐ রসের নাম দিয়াছেন "নেকার"।

সব রকম ঝিনুকের মধ্যে কিন্তু মুক্তা দেখা যায় না। যে সব ঝিনুক একটু এবড়ো-খেবড়ো, কিংবা পোকা-মাকড়ের আক্রমণে সহজেই ক্ষত-বিক্ষত হইয়া পড়ে—মুক্তা সাধারণতঃ সেইগুলির মধ্যেই জন্মে। পৃথিবীর নানা জায়গায় মুক্তা-ঝিনুক পাওয়া যায়। সিংহলের উপকূল, পারস্য-উপসাগর, অষ্ট্রেলিয়ার উপকূল, প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ অঞ্চল, মধ্য আমেরিকা, ক্যালিফোর্ণিয়া উপসাগর—প্রভৃতি নাম-করা মুক্তার জায়গা। সিংহলের মুক্তার নাম খুব বেশী। সেখানে বহু লোক এই মুক্তার কল্যাণে জীবিকা উপার্জ্জন করে। কোন কোন নদীর ঝিনুকেও মুক্তা পাওয়া যায়। বাংলাদেশে ইছামতী নদীতে জেলেরা অনেক সময় মুক্তা সংগ্রহ করে বলিয়া শোনা গিয়াছে। চীনের কোন কোন নদীতে অনেক মুক্তা-ঝিনুক পাওয়া যায়। স্কট্‌ল্যাণ্ডের কোন কোন্ নদীরও এ সম্পদ্ আছে।

আগেই বলিয়াছি মুক্তা-ঝিনুক থাকে সমুদ্রের তলায়। কাজেই মুক্তা সংগ্রহ করিতে হইলে সমুদ্রের তলায় নামা ছাড়া উপায় নাই। ঝিনুক সংগ্রহের জন্য যাহারা সমুদ্রের নীচে নামে তাহাদের বলা হয় ডুবুরী। সিংহলে কি ভাবে মুক্তা সংগ্রহ করা হয় সংক্ষেপে বলিতেছি।

সিংহলের দক্ষিণে তুতকুড়ি একটি বিখ্যাত মুক্তার বন্দর। এখানকার সমুদ্রের মুক্তা গভর্ণমেণ্টের সম্পত্তি, যে কেউ যখন তখন ঝিনুক তুলিতে পারে না। বছরের মধ্যে মাত্র মাস দু'য়েক ঝিনুক শিকার করিতে দেওয়া হয়—সাধারণতঃ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে। সারা বছর সেখানে লোক থাকে না, কিন্তু ওই সময় দেখিতে দেখিতে যেন প্রকাণ্ড সহর গড়িয়া উঠে।

নির্দ্দিষ্ট দিনে কামান দাগিয়া গভর্ণমেণ্টের অনুমতি ঘোষণা করা হয়। তখন দলে দলে ঝিনুক-শিকারী নৌকায় চাপিয়া উপকূল হইতে ক্রোশ তিনেক দূরে নির্দ্দিষ্ট জায়গায় গিয়া হাজির হয়। এক-এক নৌকায় দশ-বারো জন মাঝি ও দশ-বারো জন ডুবুরী থাকে। ডুবুরীরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া জলে নামে—একদল জলে নামিলে আর একদল বিশ্রাম করে।

সিংহলী ডুবুরীদের পোষাক ও সরঞ্জাম অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। সামান্য একটা কৌপীন পরিয়া, কোমরে একটা ছুরি বাঁধিয়া আর নাকে একটা কাঠের বা শিংএর গুঁজি আঁটিয়া, লম্বা একগাছা দড়ি ধরিয়া ইহারা জলে নামিয়া যায়। দড়ির সঙ্গে বাঁধা থাকে একটা ভারী (১৫।২০ সের ওজনের) পাথর, অন্য পাশে থাকে একটা ঝুড়ি বা থলি। পাথরের উপর পায়ের ভর দিয়া ডুবুরী জলে নামে, দড়ির অপর দিক্ ধরিয়া নৌকার লোকেরা বসিয়া থাকে।

সাধারণতঃ চল্লিশ-পঞ্চাশ হাত জলের নীচে মুক্তা-ঝিনুক পাওয়া যায়। জলে নামিয়া ডুবুরী ক্ষিপ্রহস্তে ঝুড়ি বা থলি ঝিনুকদ্বারা বোঝাই করে। যতক্ষণ জলে থাকে ততক্ষণ তাহাকে নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া থাকিতে হয়, সেজন্য দুই-এক মিনিটের বেশী জলের নীচে থাকা সম্ভব হয় না। তা ছাড়া জলের নীচে নানা রকম হিংস্র সামুদ্রিক জানোয়ার—বিশেষতঃ হাঙ্গরের উপদ্রব আছে, ছুরিটা থাকে আত্মরক্ষার জন্য। অবশ্য মুক্তাশিকারে যাইবার পূর্ব্বে ডুবুরীরা হাঙ্গর-দেবতার পূজা করিয়া

খাইতে ভুলে না—কিন্তু বাগে পাইলে হাঙ্গরেরা তবুও রেহাই দেয় না। আধুনিক সভ্য ডুবুরীরা কিন্তু ও রকম অরক্ষিতভাবে জলে নামে না, তাহারা দস্তুরমত ডুবুরী-পোষাক পরিয়া, কঠিন লোহার বর্ম্মের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া তবে জলে নামে; তা ছাড়া নিঃশ্বাস লইবার জন্য তাহাদের পোষাকের সঙ্গে থাকে একটা করিয়া লম্বা নল—নলের উপর দিক্‌টা থাকে জলের উপর। কাজেই জলের তলায় বসিয়াও তাহাদের নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয় না—অনেকক্ষণ ধরিয়া ঝিনুক খোঁজা চলে। শরীর বর্ম্মে ঢাকা থাকায় হিংস্র জন্তুর ভয়ও বিশেষ থাকে না।

সিংহলী ডুবুরীরা দিনে সাত-আট বারের বেশী জলে নামিতে পারে না—সমস্ত দিনে এক-এক জন হাজার দু'য়েক ঝিনুক কুড়াইতে পারে। কিন্তু আধুনিক বেশভূষায় সজ্জিত বিলাতী ডুবুরীরা দিনে ইহাদের প্রায় নয় গুণ বেশী ঝিনুক কুড়াইতে পারে।

আধুনিক ডুবুরী ঝিনুক কুড়াইতেছে

ঝিনুক সংগ্রহের পর সেগুলি গণিয়া ভাগ করা হয়। সরকারপক্ষ পায় তিনভাগের দুইভাগ, ডুবুরী পায় একভাগ। ডুবুরী তাহার অংশ সমুদ্রতীরেই বিক্রী করিয়া দেয়।

সব ঝিনুকের মধ্যে মুক্তা পাওয়া যায় না—পাওয়া যায় কচিৎ দুই-একটিতে। কারণ মুক্তার জন্ম নিতান্ত আকস্মিক ঘটনার ফল। ঝিনুক-ক্রেতা ঝিনুক কিনিবার পর সেগুলি চিরিয়া ফেলিয়া ভিতরে মুক্তা অন্বেষণ করে। ভাগ্য ভাল থাকিলে বহু টাকা লাভ, নচেৎ লোকসান। অনেকে আবার সঙ্গে সঙ্গে ঝিনুক না ভাঙ্গিয়া সেগুলি গুদামে পচাইতে থাকে। উহার ফলে মাছি ও পোকা পড়িয়া ঝিনুকের নরম

অংশ নষ্ট হয়—তখন সেগুলি ধুইয়া ফেলিলে ভিতরে মুক্তা থাকিলে ধরা পড়ে। এই উপায়ে খুব ছোট ছোট মুক্তাও চোখ এড়ায় না,—তবে পচা ঝিনুকের দুর্গন্ধে কাজটি খুব লোভনীয় হয় না, এবং তার ফলে সময় সময় ভীষণ ব্যারাম-পীড়াও দেখা দেয়।

কৃত্রিম উপায়েও মুক্তার চাষ করা যায়। জীবন্ত ঝিনুক পোকা ধরিয়া তাহার ডালা খুলিয়া তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীসার গুলি, বালির বা মাটির দানা অথবা ঐ রকম ছোট্ট কিছু পুরিয়া আবার তাহাকে সমুদ্রে নামাইয়া দিলে কয়েক বছর পরে দেখা যাইবে ঐ সময়ের মধ্যে ঝিনুক পোকা সেই ছোট্ট দানাটিকে মুক্তায় পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিয়াছে। চীন ও জাপানের লোকেরা এ বিদ্যায় খুব ওস্তাদ্। চীনে তো বহুদিন যাবৎ এই প্রণালীতে মুক্তা তৈরী হইতেছে। সেখানে আবার অনেকে সীসা বা টিনের ছোট্ট ছোট্ট—ক্ষুদে ক্ষুদে বুদ্ধমূর্ত্তি তৈরী করিয়া সেগুলি ঝিনুক পোকার খোলে ভরিয়া দেয় এবং কয়েক বছর পরে মুক্তার বুদ্ধমূর্ত্তি বাহির করিয়া চড়া দামে বিক্রী করে। চীনে বড় বড় পুকুর কাটিয়া এই কৃত্রিম মুক্তার চাষ করা হয়, কারণ ঝিনুক তুলিয়া আবার সমুদ্রে নামাইয়া দিলে সব সময় সেই ঝিনুক নিজের ভাগ্যে নাও জুটিতে পারে। জাপানে আজকাল খুব উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মুক্তার চাষ হয়। সেখানকার বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, সুস্থ ঝিনুক ছাড়া অন্য ঝিনুকেরা ভাল মুক্তা তৈরী করিতে পারে না। সরু জালের তৈরী খাঁচার মধ্যে বাছাই-করা ঝিনুকের বাচ্চা পুরিয়া সেই খাঁচা সমুদ্রে নামাইয়া দেওয়া হয়। খাঁচায় পোরার উদ্দেশ্য যাহাতে কোনও সামুদ্রিক জীব তাহাদের ক্ষতি করিতে না পারে। খাঁচা পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা থাকে এবং ঝিনুক-গুলিকেও মাঝে মাঝে তুলিয়া পরীক্ষা করা হয়। জাপানী বৈজ্ঞানিক মিকিমোটোর মতে শুধু বাহিরের কোন কণা জ্যান্ত ঝিনুকের ভিতরে ঢুকাইলেই মুক্তা হয় না, ঝিনুকের শরীরের একটা বিশেষ অংশই কেবল এই মুক্তারস বা 'নেকার' বাহির করিতে পারে; কাজেই কৃত্রিম উপায়ে মুক্তা তৈরী করাইতে হইলে এমন ব্যবস্থা করা দরকার যাহাতে ঐ অংশের সাহায্য ভালমত পাওয়া যায়। জাপানে আজকাল এক জ্যান্ত ঝিনুক হইতে ঐ অংশ কাটিয়া অন্য জ্যান্ত ঝিনুকে তাহা যুড়িয়া কাজ হাসিলের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই উপায়ে নাকি খুব নিখুঁত মুক্তা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

আধুনিক ডুবুরী সমুদ্রে নামিতেছে

তবে আসল মুক্তা আর কৃত্রিম উপায়ে তৈরী মুক্তার মধ্যে তফাৎ কিছুটা আছেই। পাকা জহুরীর কাছে তাহা ধরা পড়ে। আজকাল আবার এগুলি চিনিবার জন্য নানা রকম যন্ত্রপাতিও আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ঝিনুক পোড়াইলে পাওয়া যায় চূণ, মুক্তা পোড়াইলেও সেই চূণই পাওয়া যাইবে। অনেকের ধারণা মুক্তাভস্ম খাইলে স্বাস্থ্য ভাল হয়। নবাব-বাদশা'দের পানের সঙ্গে মুক্তা-পোড়ান চূণ খাওয়ার অনেক কাহিনী আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। মিশরের বিখ্যাত রাণী ক্লিওপেট্রা নাকি একবার একটা আনুমানিক দেড়লক্ষ টাকার মুক্তা পোড়াইয়া খাইয়াছিলেন। ইংলণ্ডেও রাণী এলিজাবেথের আমলে টমাস্ গ্রোসম্ নামে এক ভদ্রলোক আড়াই লক্ষ টাকা দামের এক ছড়া মুক্তার মালা পোড়াইয়া মদের সঙ্গে মিশাইয়া খাইয়াছিলেন।

ব্যবসায়ীরা ঝিনুকের মধ্যে মুক্তা খুঁজিতেছে

বাঁশিটি বাজা

শ্রীঅপর্ণা দেবী

আলোকের রথে এসেছে শরৎ—এসেছে রাজা,
আয় শিশু, নিয়ে বরণের মালা—বাঁশিটি বাজা।
আকাশে নীলিমা, বনে শ্যামলিমা, আলোর হাসি,
বেণু-বীথিকায় সমীর বাজায় আবেশে বাঁশি।

আলোর ঝলকে পলকে পলকে কমল হাসে,
রূপের দীপালী জ্বেলেছে শেফালি সবুজ ঘাসে।
রামধনু আঁকা দোলাইয়া পাখা নাচিয়া চলে
প্রজাপতি দল অধীর চপল—ফুলের দলে।
পথে পথে ফুল ছড়ায় বকুল—এসেছে রাজা,
আয় শিশু, তোরা বনপথে আজ বাঁশিটি বাজা।

আকাশে জেগেছে উৎসব নিশি—জ্বেলেছে তারা
হাজার দীপালী, চাঁদের রূপালী জ্যোছনা-ধারা।
উজল-পর্ণা আলোর ঝর্ণা পরীরা নাচে
চপলচরণে, বায়ু-বীণ্ তার ছন্দে বাজে।
পূবালী বাতাসে যায় ভেসে ভেসে মেঘের ভেলা,
আকাশ-পুরীর রাজকুমারীর চলে কি খেলা!
জ্যোছনা-ধারায় আপনা হারায় শাপলারাণী,
জল-শেফালির নয়নে ভাসিছে তারার বাণী।
আকাশে-বাতাসে পুলকের গান—এসেছে রাজা,
চাঁদের আলোয় পথে পথে আজ বাঁশিটি বাজা।

আকাশপথের ঘোড়সওয়ার

শ্রীমণীন্দ্র দত্ত, এম. এ.
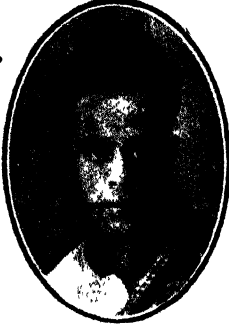
—"তা হ'লে মহারাজ শক্রজিতের পক্ষ তুমি ত্যাগ করবে ?"

—"হ্যাঁ বাবা, শুধু তোমার অনুমতি পেলেই।"

—"আমার অনুমতি ? কিন্তু আমি ত মহারাজকে ত্যাগ করতে পারব না, তরুণ !"

—"কেন বাবা ?"

—"বিদেশীর আক্রমণ থেকে মহারাজ শক্রজিতই একদিন আমাদের বাঁচিয়েছিলেন।"

—"মহারাজ শক্রজিতের সিংহাসন রক্ষা করতে বীরনগরের সন্তানদলও তাদের বুকের রক্ত কম ঢালে নি, বাবা !"

খানিক চুপ ক'রে থেকে রঘুপতি সর্দ্দার বলল—"তবে আজই বা তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে চাও কেন ?"

তরুণ দৃপ্তকণ্ঠে জবাব দিল—"আমাদের স্বাতন্ত্র্য—আমাদের স্বাধীনতা আমরা ফিরে পেতে চাই। বিদেশী যেদিন দেশ আক্রমণ করেছিল, সবাই সেদিন হাত মিলিয়েছিলাম। মহারাজ শক্রজিত শক্তিমান্, বিপুল তাঁর সৈন্যবল। তাই মেনে নিয়েছিলাম তাঁর নেতৃত্ব।—বিদেশী পরাভূত হয়েছে। দেশ আজ বিপদ হ'তে মুক্ত। আর কেন সহ্য করব তাঁর প্রভুত্ব ?"

—"প্রভুত্ব ?"

—"হ্যাঁ বাবা, প্রভুত্ব। মহারাজ শক্রজিতের নেতৃত্ব আজ প্রভুত্বে এসে দাঁড়িয়েছে। বিপদের দিনে সকলে মিলে যে হুকুমের ক্ষমতা তাঁকে দিয়েছিলাম, আজ তিনি জোর ক'রে সেই হুকুম চালাতে চাইছেন।"

রঘুপতি সর্দ্দারের সমস্ত শরীর একবার কেঁপে উঠল। চোখ দুটি জ্বলে উঠল তীব্র আক্রোশে। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য—তারপর ধীর-গলায় সে শুধাল—"এর কোন প্রমাণ পেয়েছ তোমরা ?"

—"প্রমাণ! সবই ত তুমি জান বাবা। আমাদের বিদ্যাপীঠে মহারাজের বংশ-পরিচয় পড়াবার ব্যবস্থা হয়েছে। সীমান্ত অতিক্রম করতে হ'লে মহারাজের অনুমতি নিতে হবে। মহারাজের সাথে দেখা করতে হ'লে নজরানা দিতে হবে। কই—এ সব নিয়ম আগে ত ছিল না বাবা!"

রঘুপতি সর্দ্দার মাথা নীচু ক'রে ব'সে রইল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—"বেশ, আমি প্রাণ খুলে অনুমতি দিলাম—বীর-নগরের স্বাধীনতা রক্ষায় অগ্রসর হও।"

তরুণের শরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠল। তবু সঙ্কোচ-জড়িত কণ্ঠে শুধাল—"কিন্তু তুমি—"

রঘুপতি জবাব দিল—"আমি ত তোমাদের দলে যোগ দিতে পারব না।"

—"কেন বাবা?"

—"কেন?"—রঘুপতি সর্দ্দারের ঠোঁটে করুণ হাসি—মেঘান্ধকার আকাশের নিরালা তারার মত। ধীরে ধীরে আসন হ'তে উঠে রঘুপতি পাশের ঘরে চ'লে গেল। তরুণ বিস্মিত হ'য়ে চেয়ে রইল তার স্থির পদক্ষেপের দিকে।

রঘুপতি ফিরে এল। তার হাতে একখানি লম্বা ভুর্জ্জপত্র গোল ক'রে মোড়া। কোন কথা না ব'লে রঘুপতি ভুর্জ্জপত্রখানি মেলে ধরল তরুণের চোখের সাম্‌নে। তার পেশীবহুল হাত তখন কাঁপছে।

তরুণ বিস্মিত চোখে সেখানি পড়ল। সেখানি বিদেশীর হাত হ'তে বীরনগরকে রক্ষার বিনিময়ে মহারাজ শত্রুজিতের প্রতি আজীবন সসম্মান আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি-পত্র। নীচে রয়েছে রঘুপতি সর্দ্দারের স্বাক্ষর।

তরুণ চেঁচিয়ে উঠল—"এ তুমি কি করেছ বাবা, এ যে দাসখত!"

ধীর-গলায় জবাব এল—"আজ দেখছি তাই। কিন্তু সেদিন ভেবেছিলাম, এ বন্ধুত্বের অনুরাগ-লিপি।"

অবরুদ্ধ ক্রোধে রঘুপতি সর্দ্দারের গলার স্বর কাঁপছে—সুরঙ্গপথে বাধা-পাওয়া পাগলা হাওয়া যেন।

তরুণ শুধাল—"তা' হ'লে উপায়?"

—"স্বাক্ষর যখন করেছি, তা পালন করতেই হবে।"

—"দেশের বিরুদ্ধে—আমাদের বিরুদ্ধে তুমি দাঁড়াবে?"

—"হ্যাঁ, কর্ত্তব্যের তাই নির্দ্দেশ। শুধু আমি কেন, বীরনগরের অনেক সামন্ত সর্দ্দারের এই অবস্থা। কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশে তা'রা দেশদ্রোহী।"

—"বাবা—" কি যেন বলতে যেয়ে তরুণকুমার থেমে গেল। তার মুখ ফ্যাকাসে; চোখে জল। বুকে ঝড়ের আঘাত।

রঘুপতি সর্দ্দার সস্নেহে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল—"নিঃসঙ্কোচে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়। সমগ্র বীরনগরের আশীর্ব্বাদ রইল তোমার মাথায়। একা বাবার বিরোধিতায় তোমার কিসের ভয়!"

তরুণ নতুন উৎসাহে ব'লে উঠল—"তবে আর কোন ভয় নেই বাবা। তুমিই ত শিখিয়েছ—'পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতা'।"

তরুণ বাবার পায়ে লুটিয়ে প'ড়ে প্রণাম করল। পদধূলি নিল দুই হাতে; মাখাল মাথায়, মুখে ও বুকে। রঘুপতি ছেলেকে বুকে জড়িয়ে বলল—"জীবনে সর্ব্বদা মনে রেখ তরুণ, কর্ত্তব্য সকলের উপরে।"

সুরু হ'ল সংগ্রাম।

একদিকে মহারাজ শক্রজিতের বিরাট বাহিনী। অন্যদিকে ক্ষুদ্র বীরনগরবাসী সৈন্যদল। কিন্তু ক্ষুদ্র হ'লেও বীরনগরবাসীরা রণকুশল। বিশেষতঃ গরিলা-যুদ্ধে তা'রা অদ্বিতীয়। সম্মুখ-সমরে তা'রা তুচ্ছ—নগণ্য। কিন্তু তাদের আকস্মিক আক্রমণ ও অন্তরাল-সমরে শক্রজিতের বিরাট বাহিনী বিপর্য্যস্ত।

এমনি ক'রে চলল সংগ্রাম।

পাহাড়। পাহাড়ের পর পাহাড়—শিখরের পর শিখর তুলে দাঁড়িয়ে আছে শতস্কন্ধ রাবণের মত। বাইরে থেকে বুঝবার উপায় নেই, কিন্তু তারি ফাঁকে ফাঁকে আছে গিরিবর্ত্ম—সংকীর্ণ পথ। দুই পাশে আকাশ-ছোঁয়া পাথরের দেয়াল। মাঝখানে সরুপথ। তরবারির আঘাতে পাহাড়কে কে যেন মাঝে মাঝে খণ্ডিত ক'রে রেখেছে।

পাঠক, তেমনি এক গিরিবর্ত্ম ধ'রে চল এগিয়ে। কোন ভয় নেই, আমি আছি সাথে। দু'পাশে পাথর-প্রহরী। উপরে পাথরের ত্রিশূল। আকাশ চোখে পড়ে কি পড়ে না। চারদিকে কেমন একটা ভাপসা গন্ধ। তা'তে ভয় পেও না। আমি সাথে রয়েছি যে।

এই ত গিরিবর্ত্ম শেষ হ'ল। সাম্‌নে খানিকটা সমতল জায়গা। চারপাশের পাহাড়ের গায়ে গায়ে বেড়ে ওঠো গাছগাছালীর ছায়ায় ঘেরা শান্তিকুঞ্জ যেন। চুপ। চেঁচিয়ে কথা ব'লো না। দেখছ না—বীরনগর-বাহিনী কেমন উদ্‌গ্রীব হ'য়ে অপেক্ষা করছে। কথা বলছে ফিস্-ফিস্ ক'রে—চলছে পা টিপে টিপে; আর মাঝে মাঝে চাইছে আকাশপথে!

চেয়ে দেখ, ওই শিখরের মাথায় কে এক ঘোড়সওয়ার। ভাল ক'রে দেখ—সে তরুণকুমার। ওই শিখর-শিরে সে প্রহরী। গুরুদায়িত্ব তার শিরে। পাহাড়ের ওপাড়ে মহারাজ শত্রুজিতের সেনাদল শিবির পেতেছে। তাদেরই গতিবিধির উপর রয়েছে তরুণকুমারের লক্ষ্য। তার ইঙ্গিত পেলেই বীরনগর-বাহিনী অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়বে শত্রুজিতের শিবিরে। তাই তা'রা ওৎ পেতে আছে পাহাড়ের বুকে।

কিন্তু মহারাজ শত্রুজিতের সেনাদল যদি একবার ঘুণাক্ষরেও টের পায় যে, বিদ্রোহী বীরনগরীরা হাতের মুঠোর তলে আত্মগোপন ক'রে আছে তীক্ষ্ণ ছুরি নিয়ে, তা হ'লে আর রক্ষা নেই। মাত্র কয়েক দণ্ডের আক্রমণেই বীরনগরের বীর-বাহিনীকে পাহাড়ের বুকেই শেষশয্যা পাততে হবে। পাহাড়ের গর্ত্ত হ'তে একটি প্রাণীও প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না। তাই বলছি—চুপ। চেঁচিয়ে কথা ব'লো না।

তরুণকুমার দাঁড়িয়ে আছে একটি ঝোপের আড়ালে। কোমরে তরোয়াল, হাতে ধনুক, আর পিঠে তূণ। ঝোপের আড়াল হ'তে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে শত্রুজিতের শিবিরের দিকে।

সহসা ডাইনে চোখ ফিরিয়েই তরুণকুমার চমকে উঠল। সাম্‌নের সবচেয়ে উঁচু

শিখর-শিরে দাঁড়িয়ে আর এক ঘোড়সওয়ার—কোমরে তরোয়াল, হাতে ধনুক, পিঠে তূণ। ঘোড়ার সামনের পা দুটি লাফ দেওয়ার ভঙ্গীতে তোলা। সওয়ারের হাতে দৃঢ়বদ্ধ বল্গা। মুখটা ওপাশে ফেরানো। আকাশপটে আঁকা বীর তীরন্দাজের মর্ম্মর-মূর্ত্তি যেন।

তরুণ চকিতে ফিরে দাঁড়াল। কালবিলম্ব না ক'রে ধনুকে দিল টঙ্কার। অজানা তীরন্দাজের মৃত্যু আসন্ন।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে অজানা ঘোড়সওয়ার মুখ ফেরাল। তরুণের বুক উঠল কেঁপে। হাতের তীর মাটিতে প'ড়ে গেল। এ স্বপ্ন, না সত্য! তরুণ ভাল ক'রে চোখ রগড়ে আবার তাকাল। ঘোড়সওয়ার তেমনি স্থির দাঁড়িয়ে। উদ্বেগ নেই, উৎকণ্ঠা নেই; শান্ত—স্থির—আকাশের বন্দনারত।

তরুণ স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার মাথায় নানা চিন্তার সংঘাত। হয়ত ঘোড়সওয়ারের মনে কোন অভিসন্ধি নেই—নিস্তব্ধ নৈশাকাশের মহনীয় সৌন্দর্য্যই তাকে টেনে এনেছে শিখর-শিরে।

কিন্তু এ ধারণা যদি মিথ্যা হয়। ঘোড়সওয়ার যদি বীরনগরীদের সন্ধানে এসে থাকে। যদি সে মহারাজ শত্রুজিতের প্রহরী হয়। সব খবর জেনে এখনি যদি সে শিবিরে সংবাদ দেয়। তা হ'লে—

তরুণের একটি শর সন্ধানের উপর যে সহস্র বীরনগরীর প্রাণ—তাদের 'প্রাণৈরপি প্রিয়' স্বাধীনতা নির্ভর করছে। তবে—প্রাণের অনুরোধে সে কি কর্ত্তব্যের শাসন ভুলে যাবে! তরুণের কানে বেজে উঠল বাবার আশীর্ব্বাণী—কর্ত্তব্য সকলের উপরে।

তরুণের শিথিল হাত দৃঢ়তর হ'ল। ধনুকে আকণ্ঠ গুণ টেনে কৌশলী হাতে সে শরক্ষেপ করল। রাতের স্তব্ধ বাতাস কেটে খান-খান হ'য়ে গেল সে শরের আঘাতে।

এদিকে বহুক্ষণ তরুণের কোন সংবাদ না পেয়ে বীরনগর-বাহিনীর সেনাপতি শেখরেশ্বর একজন অনুচরকে পাঠিয়েছিল তার সন্ধানে। বন্ধুর পার্ব্বত্যপথ বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে সহসা সে দেখল—শিখর-শিরে এক ঘোড়সওয়ার দাঁড়িয়ে; নিশ্চল স্তব্ধ মূর্ত্তি—পাথরে গড়া যেন। বিস্মিত হ'য়ে সে খানিকক্ষণ সেদিকে চেয়ে রইল। মূর্ত্তি স্থির অকম্পিত। তার মনে সন্দেহ হ'ল—নিশ্চয় এ শত্রুর গুপ্তচর। তাড়াতাড়ি সে ছুটল তরুণকুমারকে সংবাদ দিতে।

পাহাড়ের একটা মোড় ঘুরে এসেই সে দেখে বিস্ময়কর ব্যাপার! পর্ব্বত-শিখর জনশূন্য। এক বেপরোয়া অশ্বারোহী তীব্র গতিতে শূন্যপথে নেমে চলেছে নীচে। এও কি

সম্ভব? পৃথিবীর আশ্রয় ছেড়ে শূন্যপথে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে কে এই অলৌকিক ঘোড়সওয়ার?

উৎকণ্ঠিত চিত্তে অনুচর ছুটে গেল তরুণকুমারের কাছে। সেখানে আর এক বিস্ময়। কর্ত্তব্যপরায়ণ বীর প্রহরী তরুণকুমার পাহাড়ের উপর উপুড় হ'য়ে প'ড়ে আছে। সমস্ত শরীর কাঁপছে তার অসহ্য কান্নার আঘাতে।

অনুচর ভয়বিহ্বল কণ্ঠে বলল—"দুঃসংবাদ আছে তরুণকুমার!"

চমকে ফিরে তাকিয়ে আবার মুখ গুঁজে তরুণ বলল—"জানি।"

—"আকাশপথে ছুটে চলেছে এক অলৌকিক ঘোড়সওয়ার—সম্ভবতঃ শত্রুর চর!"

—"জানি। আমার তীরের আঘাতে শিখরচ্যুত হ'য়েই সে কর্ত্তব্যপরায়ণ মহাবীর ছুটে গেছে মৃত্যুর পথে।"

—"সে কি? আপনি তার পরিচয় জানেন?"

তরুণকুমার বিবর্ণ মুখখানি তুলে বলল—"জানি, সেই বীর আমার বাবা।" *

---

* একটি বিদেশী গল্পের ছায়া নিয়ে লেখা।

ভাইটামিনের চিঠি

ডাক্তার শ্রীসুধাংশুভূষণ মণ্ডল

শিশুসাথীর শিশু বন্ধুরা,

তোমরা নিশ্চয়ই আমার নাম শুনেছ। কল্‌কাতায় বেরিবেরি হওয়া অবধি আজ কয়েক বছর আমার কদর খুব বেড়ে গেছে। তোমরা নিশ্চয়ই জান যে, সুস্থভাবে বাঁচ্‌তে হ'লে উপযুক্ত খাদ্যের একান্ত প্রয়োজন। উপযুক্ত খাদ্য বল্‌তে সাধারণতঃ বুঝায় "প্রোটীন" বা ছানাজাতীয়—যথা মাছ, মাংস; "কার্বোহাইড্রেট্" বা শর্করাজাতীয়—যথা ভাত, আটা, ময়দা; "ফ্যাট" বা স্নেহ-দ্রব্য—যথা তৈল, মাখন, ঘি প্রভৃতি জিনিস। আমি তোমাদের এইসব দৈনন্দিন খাদ্য-দ্রব্যের মধ্যে সবসময়েই আছি। কিন্তু তাই ব'লে আমাকে এইসব খাদ্য-দ্রব্য মনে করা ভুল হবে। আমি খাদ্য-দ্রব্য থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্। আমাকে ছাড়া এইসব খাদ্য-দ্রব্য কোন কাজই কর্‌তে পারে না। আমি যে খাদ্যের মধ্যে না থাকি তা তোমাদের পাকস্থলী ভর্ত্তি কর্‌লেও শরীরের কোন উপকার কর্‌তে পারে না।

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ফাঙ্ক (Funk) আমার নাম দিয়েছিলেন 'ভাইটামিন' (Vitamin); ভাইটা (Vita) শব্দের অর্থ জীবন। তোমাদের ডাক্তার স্বর্গীয় চুণীলাল বসু—যিনি বাঙ্গালীর খাদ্য সম্বন্ধে অনেক গবেষণা ক'রে গেছেন, তিনি আমার নাম দিয়েছেন 'খাদ্য-প্রাণ'। বেশী দিনের কথা নয়, ১৯১২ খৃষ্টাব্দের আগে আমার নাম আবিষ্কৃত হয় নি। এমন কি আমার কোন দাম আছে ব'লেও লোকে জান্‌ত না।

আগে জাহাজের নাবিক প্রভৃতি—যারা জাহাজে কাজ কর্‌ত এবং অধিক দিন সমুদ্রে থাক্‌ত তাদের পেলাগ্রা, বেরিবেরি, এপিডেমিক ড্রপ্সি, রিকেট্‌স্ প্রভৃতি রোগ হ'ত। যুদ্ধের সৈনিকদের মধ্যেও এইসব রোগ দেখা যায়। অনেক দিন পরে ডাক্তারেরা কারণ অনুসন্ধান ক'রে জান্‌তে পার্‌লেন যে, আমি অর্থাৎ ভাইটামিনই খাদ্যের জীবনীশক্তি নির্ণয় কর্‌ছি। আরও অনুসন্ধান কর্‌বার পর তাঁরা আমাকে পাঁচভাগে ভাগ কর্‌লেন,—A, B, C, D, E. এদের এক একটির অভাবে এক একটি রোগ দেখা দেয়।

ভাইটামিন 'এ' ঃ

হল্‌দে রংয়ের শাক-সব্জী, যথা—পালংশাক, কপি, সীম, লাউ, পেঁপে, পাকা আম এবং মাছের তেলে এই ভাইটামিন পাওয়া যায়।

কড্‌লিভার অয়েল, ইলিশ, ভেট্‌কী, রুই ও এমন কি পুঁটী মাছের তেল, টাট্‌কা দুধ বা মাখনেও এই ভাইটামিন পাওয়া যায়। ডিমের হল্‌দে অংশে 'এ' ভাইটামিন আছে।

এই ভাইটামিনের অভাবে সংক্রামক ব্যাধিগুলি অতি সহজে তোমাদের শরীরে ছড়িয়ে পড়্‌তে পারে; ছোট ছোট শিশুদের পূর্ণাঙ্গতা লাভ হয় না। এর অভাবে

ভাইটামিনযুক্ত কয়েক রকম ফল

পূর্ণবয়স্ক লোকদেরও নানাপ্রকার রোগ হয়; যথা—সর্দ্দি, কাঁশি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, যক্ষ্মা, চক্ষুপ্রদাহ, রাতকাণা প্রভৃতি। তোমাদের বুড়ো ঠাকুরদাদারা যাঁরা রাত্রে দেখ্‌তে পান না, তাঁদেরও খুব বেশী ক'রে 'এ' ভাইটামিন খেতে দিও। 'এ' ভাইটামিনের অভাবে মেয়েদের 'সূতিকা' প্রভৃতি রোগ দেখা দেয়। অনেকে মনে করেন, ভাইটামিন 'এ'র অভাবই নারীদের বন্ধ্যাত্বের প্রধান কারণ।

ভাইটামিন 'বি' ঃ

ঢেঁকিছাটা চাউল, যাঁতার আটা, ছোলা, ডাল, কমলালেবু, টকবেগুন, সীম, বাদাম ও ডিমের কুসুমে এই জাতীয় ভাইটামিন পাওয়া যায়।

খাদ্যে 'বি' ভাইটামিনের অভাবে বেরিবেরি, পক্ষাঘাত, রক্তাল্পতা, কোষ্টবদ্ধতা ও মাথাধরা প্রভৃতি হয়।

'বি' ভাইটামিনের অভাবে 'পেলাগ্রা' নামক চর্ম্মরোগ হয়। খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণে এই ভাইটামিন না থাকলে স্নায়ুমণ্ডলীর শক্তি ক'মে যায়—রোগ নিবারণী শক্তি নষ্ট হয়। 'বি' ভাইটামিনের অভাব প্রসূতি ও সন্তানের উভয়ের স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর।

ভাইটামিন 'সি' ঃ

কমলালেবু ও টকবেগুনে এই ভাইটামিন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। পেঁয়াজ ও অন্যান্য তরকারীতে এই ভাইটামিন আছে। কাঁচা দুগ্ধে ও মাংসে এই ভাইটামিন পাওয়া যায়। এর অভাবে 'স্কার্ভি' নামে একপ্রকার রোগ দেখা দেয়। এই রোগে দাঁতগুলো আল্‌গা হ'য়ে যায় ও দাঁতের গোড়া থেকে রক্তস্রাব হয়।

দ্বিখণ্ডিত কমলালেবু

স্তন্যদুগ্ধে ভাইটামিন 'সি'র অভাব নেই। সেই হেতু স্তন্যদুগ্ধে পালিত শিশুর স্কার্ভি রোগ হয় না। যাদের মায়েদের দুধ কম, সেই সব শিশুদের এই রোগের হাত থেকে মুক্ত করতে হ'লে গো-দুগ্ধের সঙ্গে কমলালেবুর বা টকবেগুনের রস খাওয়ান উচিত। এই ভাইটামিনের অভাব হ'লে শিশুরা প্রায়ই খিট্‌খিটে হয় ও কাঁদে। তা'তে মা ও অন্যান্য অভিভাবকেরা মনে করেন যে, ছেলেকে নিশ্চয়ই ভূতে পেয়েছে। কিন্তু আসলে ওসব কিছুই নয়। ভাইটামিন 'সি' খাওয়ালেই এই সব উপসর্গ চ'লে যেতে পারে।
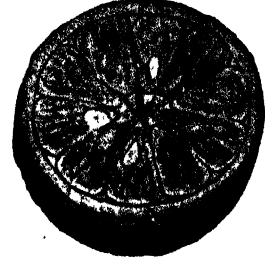
ভাইটামিন 'ডি' ঃ

'এ' ও 'ডি' এই দুইপ্রকার ভাইটামিন একরকম জিনিস থেকেই আসে। তবে তফাৎ এই যে 'ডি' ভাইটামিন অধিক উত্তাপ সহ্য করতে পারে ; 'এ' তা পারে না।

'ডি' ভাইটামিনের অভাবে শিশুদের রিকেট্‌স্ (Rickets) বা অপুষ্টাস্থি রোগ হয়। এই রোগে শিশুরা চলতে গেলে তাদের শরীরের হাড় বেঁকে যায়, মাথার খুলি শক্ত হয় না, শরীর পূর্ণাঙ্গতা লাভ করতে পারে না।

বয়স্ক লোকদের ও মেয়েদের এই রোগ প্রায়ই দেখা যায়। সূর্য্য-কিরণের সঙ্গে

ভাইটামিন 'ডি' বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। সূর্য্য-কিরণ আমাদের শরীরে ও নানাবিধ খাদ্য-দ্রব্যে ভাইটামিন 'ডি' সৃষ্টি করে।

পূর্ব্বে এই দেশে কচি শিশুকে যে রৌদ্র লাগানের প্রথা ছিল, সেটা খুবই ভাল। তা'তে শিশুদের দাঁত ও হাড় বৃদ্ধিলাভ কর্‌তে পারে। কিন্তু শিশু রোদ লেগে কালো হ'য়ে যায় ব'লে এযুগের সভ্য যুবকবৃন্দ এটা পছন্দ করেন না। তবে এখনও গ্রামাঞ্চলের কোন কোন স্থানে শিশুকে রোদ লাগানের প্রথা আছে। বলা বাহুল্য, এজন্যই তাদের অসুখ-বিসুখ কম। প্রত্যেকেরই তৈল মেখে কিছুক্ষণ গায়ে রৌদ্র লাগান উচিত।

ভাইটামিন 'ঈ' ঃ

পুষ্টাঙ্গ বীজ (গম, ভুট্টা) ও শাক-সব্জী (পুঁই) হ'তে ভাইটামিন 'ঈ' পাওয়া যায়। উদ্ভিজ্জ তেলেও এই জাতীয় ভাইটামিন আছে। এই ভাইটামিনকে Anti-Sterility বা বন্ধ্যাত্ব-নিবারক ভাইটামিন বলে।

মোটামুটি আমার পরিচয় ও কার্য্য-কলাপ তোমরা জান্‌লে। এর বেশী যদি জান্‌তে চাও ত বড় হ'য়ে ডাক্তারী পড়বে, তা হ'লে জান্‌তে পার্‌বে। এখন কথা হচ্ছে আজ থেকে তোমাদের শরীরের প্রতি মন দিতে হবে। ঋষিরাও বলেছেন—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্‌।"

এই শরীর সুস্থ রাখ্‌তে হ'লে ভাল ভাল খাদ্যের প্রয়োজন। আর ভাল খাদ্য মানে যে খাদ্যে প্রচুর পরিমাণে ভাইটামিন আছে। এর পরে তোমরা নিশ্চয়ই প্রতিজ্ঞা কর্‌বে যে, এখন থেকে প্রত্যেক ডিসেই ভাইটামিনযুক্ত খাদ্য খাবে।

উপযাচক হ'য়ে আমার নিজের কথা ব'লে তোমাদের সঙ্গে এই যে ভালবাসা স্থাপন কর্‌লুম তা বোধ করি কোন দিন নষ্ট হবে না। রোজই খাওয়ার সময় একবার ক'রে দেখা হবে। আচ্ছা, এখন তবে আসি। ইতি—

তোমাদের বন্ধু
ভাইটামিন।

চিত্র-শিল্পী—জর্জ্জ রোম্‌নী

শিল্পী শ্রীপ্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়

যে সব ইংরাজ চিত্র-শিল্পী ছবি এঁকে আজও অমর হ'য়ে আছেন তাঁদের মধ্যে জর্জ্জ রোম্‌নী একজন। জর্জ্জ রোম্‌নী বিখ্যাত মূর্ত্তি-চিত্রকর (Portrait Painter) ছিলেন। এই অদ্ভুত প্রতিভা-সম্পন্ন শিল্পীর কোন কাজই ধারাবাহিক শৃঙ্খলার ভেতর দিয়ে কোন দিনই নিষ্পন্ন হ'তে পারে নি—তার প্রধান কারণ ছিল তাঁর নিজের শালীনতার অভাব। এমনি পাগ্‌লাটে খেয়াল মাঝে মাঝে তাঁকে পেয়ে বস্‌ত যে, এমন কোন উৎকট কাজ ছিল না যা তাঁর পক্ষে করা অসম্ভব ছিল; হয়ত এইটুকু না থাক্‌লে রোম্‌নী আরও প্রতিভার পরিচয় দিয়ে যেতে পার্‌তেন। চিত্র-জগতে তাঁর দান আরও পরিপূর্ণ হ'ত। অনেক পণ্ডিতের মতে রোম্‌নীর ছবির ভেতর সার্ জেস্যুয়া রেনল্ডস্‌এর অঙ্কন-পদ্ধতির এবং রস-সম্ভারের আভাস পাওয়া যায়। সার্ জেস্যুয়া কে জান ত? তিনিও একজন মস্ত বড় চিত্র-শিল্পী—শিল্পকলার ক্ষেত্রে তাঁকে মধ্যাহ্ন গগনের প্রদীপ্ত ভাস্কর বলা যেতে পারে।

জর্জ্জ রোম্‌নী

যাই হোক—রোম্‌নীর জন্ম হয় ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে ল্যাঙ্কাশায়ারের এক ছুতোর মিস্ত্রির ঘরে। ছোটবেলায় রোম্‌নী খুব চতুর ও বুদ্ধিমান ছিলেন। সদা-সর্ব্বদা বাপের সঙ্গে সঙ্গে কারখানায় ব'সে থাক্‌তেন, নূতন নূতন আসবাবপত্রের পরিকল্পনা—এমন কি, কাঠের গায়ে নানাশ্রেণীর খোদাইএর কাজ ক'রে বাপকে সাহায্য কর্‌তেন। ছেলের এই প্রতিভা, বিশেষতঃ ছবি আঁকার আগ্রহাতিশয্য লক্ষ্য ক'রে তাঁর বাবা তাঁকে ক্রিষ্টোফার ষ্টিলী নামক এক চিত্র-শিল্পীর

কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ষ্টিলী ছিলেন নামজাদা মূর্ত্তি-চিত্রকর—প্যারিসের চিত্র-শিল্পী ভ্যান্‌লুর প্রধান শিষ্য। ধারাবাহিকভাবে মনপ্রাণ দিয়ে চিত্রাঙ্কন শিক্ষা রোম্‌নীর এখান থেকে সুরু হ'ল। রোম্‌নীর বয়স তখন উনিশ বছর।

একবার রোম্‌নীর জীবন-সংশয় অসুখ হয়। তখন তাঁকে একটি মেয়ে অক্লান্ত সেবা-যত্ন ক'রে নীরোগ ক'রে তোলেন। পরে রোম্‌নী ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে সেই মেয়েটিকে বিয়ে করেন। আগেই বলেছি রোম্‌নীর মতি স্থির ছিল না। তাই বিয়ের পরই হঠাৎ একদিন তাঁর মন দেশ-ভ্রমণের নেশায় মেতে উঠ্‌ল; যেম্‌নি একটা মতলব মনে আসা অমনি কাজেও তাই করা। তাই রোম্‌নী তাঁর স্ত্রীকে একরকম ত্যাগ করার মতন ক'রেই দেশ-ভ্রমণে বেরিয়ে পড়্‌লেন—মতলব, ঘুরে ঘুরে ছবি এঁকে বেড়াবেন।

এই সময় তিনি মাত্র দুই গিনি দামে ছবি এঁকে দিতেন। শেষটায় এমন অবস্থা এলো যে তাঁর প্রায় কুড়িখানা ছবি কেণ্ডেল সহরে প্রদর্শনীতে দেখান হয়; পরে তা জনসাধারণের মধ্যে লটারী ক'রে বিক্রিও ক'রে দিতে হয়। এই সময়ে কিছু টাকা তাঁর হাতে জমে এবং হঠাৎ আবার খেয়াল হয় লণ্ডনে গিয়ে যদি ভাগ্য ফেরান যায়। স্ত্রীকে অনেক টাকা-কড়ি দিয়ে সেই যে তিনি লণ্ডনে গিয়ে ব'সে থাক্‌লেন আর বাড়ীমুখো হ'লেন না—মাঝে মাত্র বার দুয়েক স্ত্রীর সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছিলেন শোনা যায়। তাঁর স্ত্রী ছিলেন অত্যন্ত ভাল মানুষ, তাই রোম্‌নীর এই অদ্ভুত আচরণ মুখ বুজে নির্ব্বিবাদে সয়ে গেলেন—একটি প্রতিবাদও কর্‌লেন না।

রোম্‌নী প্রথম ছবি এঁকে নাম করেন—"Death of General Wolfe" ছবিতে। আর্ট সোসাইটীর প্রদর্শনীতে তাঁর এই ছবিখানাই প্রথম পুরস্কার পায়; কিন্তু শেষটায় পুরস্কারটি অন্য একজনের ছবিতে দেওয়া হয় এবং রোম্‌নীকে ৫০ পাউণ্ড দিয়ে এক রকম সান্ত্বনা দেওয়ার মত ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যাপারে রোম্‌নী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং ব'লে বেড়াতে লাগ্‌লেন—"রেনল্ডস্‌এর চক্রান্তে এই সব কাণ্ড ঘট্‌ল এবং আমাকে প্রাইজ না দেওয়ার মূলে রেনল্ডস্‌ই প্রধান—" সেই থেকে রোম্‌নী রয়াল এ্যাকাডেমীর সংস্রব ত্যাগ করেন এবং আর কোন দিন প্রদর্শনীতে ছবি দেন নি।

১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে প্যারিস থেকে ঘুরে এসে রোম্‌নী মূর্ত্তি-চিত্র আঁকৃতে মনোনিবেশ করেন এবং সার্ জোসেফ্ ইয়েট্‌স্‌এর মূর্ত্তি এঁকে খুব নাম কেনেন। বৎসরে তখন তাঁর আয় চলেছে ১,২০০ পাউণ্ড ক'রে।

রোম্‌নী আর রেনল্ডস্‌ এক জায়গাতেই পাশাপাশি বাড়ীতে বাস করতেন। রেনল্ডস্‌ যদিও রোম্‌নীর প্রতিভাকে স্বীকার কর্‌তেন, কিন্তু রোম্‌নী যে তাঁর জীবনের প্রধানতম শত্রু তা তিনি কখনও ভুল্‌তে পারেন নি এবং যেখানে সেখানে রোম্‌নীর সঙ্গেই তাঁর প্রতিযোগিতা হ'ত।

কিছুদিন যায়। রোম্‌নীর অশান্ত মন আবার চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল। ওজিয়াস হাম্‌ফ্রি নামক একজন চিত্র-শিল্পীকে নিয়ে, তিনি ইতালী অভিমুখে যাত্রা কর্‌লেন। বছর দুই ভাটিক্যালে থেকে আবার লণ্ডনে এলেন। এই সময় হেলী নামক এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। এই হেলী সাহেবই পরবর্ত্তিকালে তাঁর জীবনী লিখে যান।

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দ থেকে রোম্‌নীর জীবনে এক স্মরণীয় পরিবর্ত্তন আসে; তখন তাঁর বয়স ৫৯ বৎসর। এই সময় এমা হার্ট নামক এক পরমা সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। এমা হার্ট এক কামারের মেয়ে। এমার অসামান্য রূপ-লাবণ্য দেখে রোম্‌নীর ভেতর এক নূতন অনুপ্রেরণা জাগে এবং তিনি একটির পর একটি ক'রে—এমার অসংখ্য ছবি আঁকেন। রোম্‌নী তাঁর জীবনের শেষ দিনটি পর্য্যন্ত এমারই ছবি নানা-ভাবে এঁকে রেখে গেছেন। এই এমাকেই পরবর্ত্তিকালে সার্‌ উইলিয়াম হ্যামিলটন বিবাহ করেন। রোম্‌নীর আঁকা এমার যত ছবি আছে তার মধ্যে সব চেয়ে নামকরা ছবি হচ্ছে "লেডী হ্যামিলটন এ্যাজ্‌ ডায়ানা"। তোমরা যদি কখনও কোন বিদেশী এ্যালবাম বা "মাষ্টার পিস্‌" দেখার সুযোগ পাও তো এই ছবিখানা দেখে নিও—রং ফলাবার কায়দা আর অঙ্গ-সৌষ্ঠবের অঙ্কন-কৌশল দেখ্‌লে সত্যই মুগ্ধ হবে। এ ছাড়া লেডী হ্যামিলটনকে নিয়ে তিনি আরও বহু ছবি আঁকেন; তার মধ্যে কয়েখানার নাম হচ্ছে "Lady Hamilton at the spinning wheel", "Magdalene and Joan of Arc", "Cassandra and Bacchante" প্রভৃতি।

যে সময়ে রোম্‌নী লেডী হ্যামিলটনের একরকম নিত্য সহচর হ'য়ে পড়েছিলেন ঠিক সেই সময়—তাঁর মস্তিষ্কের বিকৃতি দেখা দেয় এবং শেষ পর্য্যন্ত স্বাস্থ্য একদম ভেঙ্গে পড়ে। এই রকম শারীরিক বিপর্য্যয়ের মধ্যেও রোম্‌নীর খেয়াল হঠাৎ মূর্ত্তি আঁকা থেকে ঐতিহাসিক চিত্র আঁকার দিকে ঝুঁকে পড়ে। তিনি এই কাজের জন্য হ্যামষ্টেড্‌এ মস্তবড় বাড়ী নিয়ে ষ্টুডিও তৈরী করেন, কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই অসুস্থ হ'য়ে শয্যা গ্রহণ কর্‌লেন। এবারকার অসুখে তাঁর মন ভেঙ্গে পড়্‌ল।

বহুকাল পরে হঠাৎ তাঁর সেই পরিত্যক্তা স্নেহশীলা স্ত্রীর কথা মনে পড়্‌ল। রোম্‌নী আর দেরী না ক'রে স্ত্রীর কাছে ছুটে গেলেন। রোম্‌নীর স্ত্রী তখনও স্বামীর পথ চেয়ে ছিলেন। বহুকাল পরে স্বামীকে কাছে পেয়ে তিনি সাগ্রহে ও সমাদরে গ্রহণ কর্‌লেন এবং তাঁর রোগ-শয্যার পাশে ব'সে অহোরাত্র একনিষ্ঠ সেবা ক'রে যেতে লাগ্‌লেন। কিন্তু এত সেবা, এত যত্ন সবই একদিন ব্যর্থ হ'ল—স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে রোম্‌নী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ কর্‌লেন।

এড্‌ওয়ার্ড ফিট্‌জিরাণ্ড্‌ সাহেব বলেন—রোম্‌নীর স্ত্রীর এই একনিষ্ঠ সেবার মূল্য রোম্‌নীর আঁকা সমস্ত ছবির মূল্যের চেয়েও সহস্র গুণ বেশী। অথচ রোম্‌নীর জীবনেতিহাসে এই স্বার্থশূন্য মহিলার স্থান কতটুকু!

দাদুর খেয়াল

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

কাল্‌কে রাতে কল্‌কাতাতে কল্‌কে হাতে নিয়ে—
হারিয়ে গেল কোথায় দাদু তামাক খেতে গিয়ে!
এ-ঘর ও-ঘর সবাই খুঁজি,
আঁদাড়্‌-পাঁদাড়্‌, গলি-ঘুঁজি,
রাস্তা-পাশের আস্তাকুঁড়ে, আস্তাবলের কাছে,
সবাই মিলে খুঁজি, যেথায় সম্ভাবনা আছে।

কোথায় দাছু! কোথায় দাছু! নাত্‌নী এবং নাতি,—
সবাই মিলে খোঁজার নেশায় উঠ্‌ছি যেন মাতি';
দিদিমা সে আন্নাকালী,
ভয়েই লাগান কান্না খালি,
মানুষটা যে কোথায় গেল! ভূতের ব্যাপার নাকি!
"দাছু, দাছু"—ব'লে সবাই কর্‌ছি ডাকাডাকি।

খুঁজে খুঁজে শেষের রাতে পেলাম খাটের তলে;
মুচ্‌কি হেসে তখন দাছু মোদের ডেকে বলে,—
"তোদের বুড়ী দিদিমা যে
মর্‌তে বলে সকাল-সাঁঝে,
সত্যি কিনা লুকিয়ে থেকে জেনে নিলাম ছলে,
আন্নাকালীর কান্না শুনে প্রাণটা গেল গলে'।"

———

ইচ্ছাপুর

শ্রীসুখলতা রাও

তার সঙ্গে খেলা না করলে তার বড় এসে যায় না, কিন্তু ঐ যে কথাগুলো, ঐ যে 'কুবোধ, কুবোধ' ব'লে চীৎকার—ও যেন বিষের জ্বালা তার সমস্ত গায়ে ছড়িয়ে দিল। রাগী ত সে আছেই, তবু অমনধারা খ্যাপালে কা'র না রাগ হয়? তার নাম ত কুবোধ নয়—প্রবোধ। দাদার নাম সুবোধ ব'লে কি তার নাম কুবোধ হ'তে হবে?

"তোর বুদ্ধিটা কি-না কু, তাই তোর নাম কুবোধ"—ব'লে নরেন হো-হো শব্দে হেসে উঠল; দেখাদেখি অন্য ছেলেরাও হাততালি দিয়ে হাসতে লাগল। প্রবোধ তখন রাগে অন্ধ হ'য়ে বাঘের মত লাফিয়ে পড়ল নরেনের উপরে, ভুলে গেল যে নরেন তার চেয়ে ঢের বড় আর গুণ্ডা ছেলেদের সর্দ্দার। প্রবোধের ঘুষি নরেনের বুকে লাগতেই নরেনের বজ্রমুষ্টি তার মাথায় নেমে এল, যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল মাথার উপরে!

প্রবোধ ঘুরে প'ড়ে গেল কাঁটাঝোপের মাঝখানে। তাই ত, খেলার মাঠে কাঁটা-ঝোপ এল কোথা থেকে? ঝোপটা কেন নীচেব দিকে নেমে যাচ্ছে, আর ঘাসের জমি উপরে উঠছে? দেখতে দেখতে প্রবোধ গিয়ে পড়ল এক গর্ত্তে। গর্ত্তের এক দিকের পাড় উঁচু হ'য়ে উঠে গেছে; সেই পাড়ের গায়ে একটা 'সাইন-বোর্ড'-এ লেখা 'ক্রোধের খাদ'। তারও উপরে প্রবোধ তাকিয়ে দেখে, সুবোধ হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

অনেক কষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে সে খাদের পাড় বেয়ে উঠে' এল। এ যে এক নূতন দেশ! কিন্তু সুবোধ গেল কোথায়? ঐ দেখা যায়—সুবোধ তার আগে আগে চ'লে যাচ্ছে। একজন বুড়ো লোক সেখানে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল—"প্রবোধ, এই পথ ধ'রে দাদার পিছু পিছু চ'লে যাও, বাড়ী পৌঁছে যাবে। এ-ধারে ও-ধারে নামতে চেষ্টা ক'রো না যেন।"

প্রবোধ বলল—"ক্ষিধে পেয়েছে, খাবার পাব কোথায়?"

—"পথের ধারে বাজার আছে, যা ইচ্ছা খেতে পাবে; কিন্তু খবরদার, নীচের দোকান থেকে খাবার খেও না, 'লোভের খাদে' নেমো না।"

—"এটা কোন্ দেশ?"

—"এ দেশের নাম 'ইচ্ছাপুর'। এখানে ইচ্ছা করলে সুখ পেতে পারা যায়, ইচ্ছায়

আবার অনেক দুঃখ পায় লোকে! সাম্‌নের এই সোজা পথে গেলে বেশ সুখে চ'লে যাবে, কিন্তু বিপথে গেলেই ভুগবে।"

দাদা অনেকদূর যায় দেখে প্রবোধ সেই দিকে দৌড়াল। ঐ না অদূরে সেকেণ্ড মাষ্টার গোবর্দ্ধনবাবু? দেখা মাত্র প্রবোধ স'রে পড়বার মতলব করল—কি জানি যদি জেরা করতে আরম্ভ করেন, পরীক্ষা কাছে, কেমন পড়া হ'ল, কয়টা বই শেষ হ'ল, এই সব। পথের ধারে একটা গাছের আড়ালে সে দাঁড়াল। জায়গাটা ভারি পিচ্ছিল, সড়্‌সড় ক'রে খানিকটা পিছলে গেল সে। ভাগ্যে একটা খুঁটির গায়ে তার পা আটকাল, নইলে একেবারে খাদে গিয়ে পড়ত! খুঁটি ধ'রে দাঁড়িয়ে খাদের ভিতর চেয়ে দেখে কতকগুলো লোক আরাম ক'রে ঘুমোবার চেষ্টা করছে, কিন্তু কিছুতেই ঘুমোতে পারছে না; চারদিকে কাঁটাগাছ, সেই কাঁটার খোঁচা তাদের অস্থির ক'রে দিচ্ছে। প্রবোধ যে খুঁটি ধ'রে দাঁড়িয়েছিল সেটা একটা সাইন-বোর্ডের খুঁটি; বোর্ডে লেখা আছে 'ফাঁকির খাদ'। লোকগুলো সব 'কাজে ফাঁকির' দল, তাদের কারো ভিখারীর মত ছেঁড়া ময়লা কাপড়, কেউ যেন খেতে পায় না এমনি রোগা, কারো চেহারা পাগলের মত। তাদের দুর্দ্দশা দেখে প্রবোধ তাড়াতাড়ি হাম্‌চা খাম্‌চা ক'রে উঠে' এল। আসতেই একেবারে গোবর্দ্ধনবাবুর সঙ্গে মুখোমুখি!

"এই সোজা পথে গেলে সুখে চ'লে যাবে!"

তিনি একটু হেসে বললেন—"কেমন পড়ছ। মন দিয়ে পড়া কর, পাশ করা চাই। তোমার ত বুদ্ধি বেশ আছে, কেবল ফাঁকি দিতে চাও এই যা দোষ।" ··· ···

সুবোধ ও প্রবোধ দুই ভাই, স্বভাব দু'জনের দুই রকম। সুবোধ শান্ত ধীর, বাস্তবিকই সুবোধ বালক। প্রবোধ একটু রাগী, লোভটাও কিছু আছে। দুই ভাই যাচ্ছে আর চারদিকে চেয়ে দেখছে। পথটি সুন্দর, দু'ধারে ফুল-ফলের গাছ, কত সুন্দর সুন্দর পাখী এ-ডালে ও-ডালে উড়ে বসছে। ফুলের সুগন্ধ, পাখীর গান যেন চলার কষ্ট ভুলিয়ে দেয়। কিন্তু এক এক জায়গায় পথটি বড় সরু; সাবধানে যেতে হয়, নইলে পাশের খাদে গড়িয়ে পড়বার সম্ভাবনা আছে। বিপদ জানিয়ে দেবার জন্য খাদের মাথায় মাথায় নানারকম সাইন-বোর্ড লাগান আছে—'হিংসার খাদ', 'অহঙ্কারের খাদ', 'অবাধ্যতার খাদ', আরও কত কি! 'মিথ্যার খাদ' যেন কোন্ অন্ধকার পাতালে নেমে গেছে, চাইতে ভয় করে।

প্রবোধ বলল—"দাদা, বড় ক্ষিধে পেয়েছে।" সুবোধেরও ক্ষিধে পেয়েছিল। দু'জনে মিলে বাজারের একটা দোকানে গিয়ে ঢুকল। দোকানটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সেখানে ভাত ডাল তরকারি, ফল-মূল, দুধ মাখন, কিছু মিষ্টি এই সব থালায় বাটিতে সাজান আছে; যতটুকু দরকার তার বেশী কিন্তু একজনকে দেয় না। প্রবোধ মুখে খাবার তুলছে আর চেয়ে আছে নীচের একটা দোকানের দিকে। কি চমৎকার পিঠে ভাজার গন্ধ আসছে সেখান থেকে! কিন্তু বুড়ো বলেছিল, "খবরদার, নীচের দোকানে যেও না।" তাই সে কোনও রকমে লোভটা সামলিয়ে রইল।

খেয়ে দেয়ে দু'জনে যখন পথে বেরিয়েছে তখন প্রবোধ দেখল একদল ছেলে হুড়োহুড়ি ক'রে নীচের দোকানে ঢুকছে। সে দাদাকে কিছু না ব'লে ফিরে এল আর একেবারে সোজা সেই পিঠে ভাজার দোকানে নেমে গেল। কী মজা এ দোকানে—যত ইচ্ছা খাও কেউ মানা করে না! দোকানী বলল—"এই পাশেই, আর একটু নীচে আমাদের বড় দোকান। সেখানে অনেক নূতন রকমের খাবার আছে, যা আর কোথাও পাওয়া যায় না। বাড়ী যাবার সময় একবার উঁকি মেরে যেও না!"

প্রবোধের ত পিঠে খেয়ে পেট ঢাক; তবু 'দেখতে ক্ষতি কি?'—ভেবে, সে আস্তে আস্তে পা টিপে-টিপে দু-এক পা নামল। বাবাঃ, কি খাড়া এ জায়গাটা! হঠাৎ পা গেল পিছলে, আর অমনি গড়-গড় গড়াতে লাগল। শুধু কি সে একলা গড়াল?

ছেলের দলের অনেকে আগেই গড়িয়ে গেছে ; তার সঙ্গে সঙ্গেও কত জন গড়িয়ে চলল,— তাদের কারো বা অজীর্ণ রোগ, কেউ বা আবার ওষুধের শিশি হাতে নিয়েই গড়াচ্ছে। সবাই মিলে গড়াতে গড়াতে পড়েছে গিয়ে ঝপাং ক'রে—জলের ভিতর নয়—বার্লির জলে !
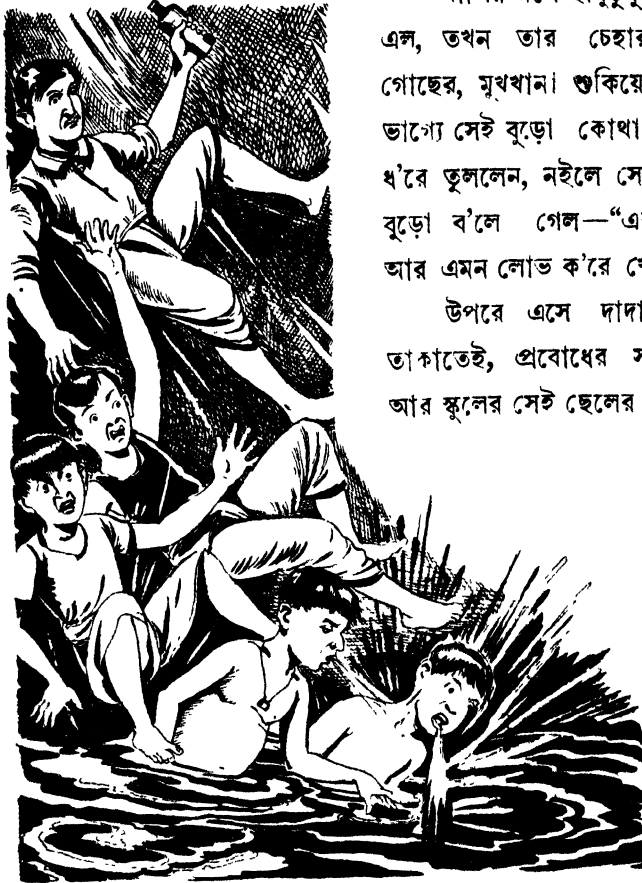
বার্লির জলে হাবুডুবু খেয়ে প্রবোধ যখন উঠে' এল, তখন তার চেহারা হ'ল নিতান্ত বেচারা গোছের, মুখখানা শুকিয়ে গেছে, হাত-পা কাঁপছে। ভাগ্যে সেই বুড়ো কোথা থেকে এসে তাঁকে হাত ধ'রে তুললেন, নইলে সে উঠতেই হয়ত পারত না। বুড়ো ব'লে গেল—"এবার থেকে সাবধান হও, আর এমন লোভ ক'রে খেও না !"

উপরে এসে দাদার খোঁজে এদিক-ওদিক তাকাতেই, প্রবোধের সাম্‌নে হাজির হ'ল নরেন আর স্কুলের সেই ছেলের দল ! নরেনের চোখে মুখে বিদ্রূপ বাণ। সে হেসে বলল—"কুবোধ আর কাকে বলে ?" ছেলেরাও চেঁচিয়ে উঠল—"যার বুদ্ধি কু তাকে, এবং যে লোভ সামলাতে পারে না তাকে বলে কুবোধ, কি বলিস্ কুবোধ ?"

গড়াতে গড়াতে পড়েছে গিয়ে—বার্লির জলে !

প্রবোধের মাথায় যেন আগুন চ'ড়ে গেল। পথের ধারে একটা পাথর প'ড়ে ছিল, সেটাকে তুলে নিয়ে যেমন প্রবোধ নরেনকে মারতে যাবে, দুর্ব্বল শরীরে টাল সামলাতে না পেরে সে গড়িয়ে প'ড়ে গেল একেবারে ক্রোধের খাদের নীচে, কাঁটাঝোপের মধ্যে ! সেখান

থেকে যেন আর উঠবারও শক্তি রইল না। কাঁটার বিছানায় শুয়ে, কাঁটার খোঁচায় ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে, মনের দুঃখে প্রবোধ বলতে লাগল—"নিজের দোষে এই বিপদে পড়লাম। বাস্তবিকই ত আমার বুদ্ধি মন্দ, আমার কুবোধ নামই হওয়া উচিত।" তখন বাড়ীর কথা, দাদার কথা মনে ক'রে সে আকুল হ'য়ে "দাদা, দাদা" ব'লে ডাকতে লাগল। তার দুই চোখ বেয়ে জল পড়ছে, সেই জলে ভিজে ভিজে কাঁটাগুলো যেন নরম তুলোর মত হ'য়ে যাচ্ছে। চোখ মেলে দেখে সে নিজের বিছানায় শুয়ে, দাদা তার পাশে ব'সে বলছে—"ডাকছিস্ আমায় ?"

মার্শগ্যাস ও ডেভীর সেফ্‌টি ল্যাম্প

শ্রীনিখিলেশ সেন

তোমরা সকলেই জান যে, আগে কয়লার খনিতে প্রায়ই আগুন লেগে যেত এবং বিস্ফোরণ ঘটত, কিন্তু এখন তেমন দুর্ঘটনা খুব কমই ঘটে। আগে কেন ওরকম দুর্ঘটনা ঘটত এবং এখন কেন ঘটে না—তার কারণ বোধ হয় তোমরা অনেকেই জান না।

খনিতে বিস্ফোরণ ঘটা এবং আগুন লাগার কারণ এক রকম গ্যাসের উপস্থিতি। এই গ্যাসটির নাম হচ্ছে "মার্শগ্যাস"। কয়লার খনির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে মার্শগ্যাস থাকে। এখন বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন যে, মার্শগ্যাস এবং অক্সিজেন একসঙ্গে মিশে এক ভীষণ বিস্ফোরক পদার্থের সৃষ্টি করে—আগুনের সংস্পর্শে এলেই এই মিশ্রিত গ্যাস দুটিতে আগুন লেগে যায় এবং বিস্ফোরণ ঘটায়। তার ফলে কয়লা-খনিতে আগুন লেগে যায়।

কথা হচ্ছে এই, কয়লা-খনির মধ্যে মার্শগ্যাস আসে কোথা থেকে ? তা জানতে হ'লে আমাদের প্রথমে মার্শগ্যাস সম্বন্ধে কিছু জানতে হবে। মার্শগ্যাস তৈরী হচ্ছে কয়লা (carbon) এবং হাইড্রোজেন গ্যাসের রাসায়নিক সংমিশ্রণের ফলে। প্রতি অণু (molecule) মার্শগ্যাসে থাকে এক পরমাণু (atom) কয়লা এবং চার পরমাণু হাইড্রোজেন। অণু আর পরমাণু কা'কে বলে সংক্ষেপে তাই বলছি। প্রত্যেক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ যার মধ্যে পদার্থটির গুণ সম্পূর্ণভাবে বিরাজ করে তার নাম অণু। প্রতি অণুর মধ্যে থাকে আবার কতকগুলো পরমাণু, তবে পরমাণুগুলোর মধ্যে পদার্থটির বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যেতে পারে—আবার সেগুলো সম্পূর্ণ আলাদা গুণবিশিষ্টও হ'তে পারে। উদাহরণ দিয়ে বোঝালেই ব্যাপারটা সোজা হবে। জলের ক্ষুদ্রতম অংশ হচ্ছে অণু। এক অণু জলের

মধ্যে আমরা জলের সমস্ত গুণ এবং বৈশিষ্ট্যই খুঁজে পাব। কিন্তু জলের একটা অণুকে যদি আমরা আরও ক্ষুদ্রতম অংশে ভাগ করি তা হ'লে আমরা পাব দু'পরমাণু হাইড্রোজেন গ্যাস এবং এক পরমাণু অক্সিজেন গ্যাস; গ্যাস দুটির কোনটির মধ্যেই জলের কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। সুতরাং তোমরা বুঝতে পারছ যে, কয়লার সঙ্গে মার্শগ্যাসের একটা নিকট-সম্বন্ধ আছে এবং কয়লা থেকে মার্শগ্যাসের উৎপত্তি হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।

তোমরা সকলেই জান যে, মাটির নীচে খনির মধ্য থেকে যে সব কয়লা আমরা পাই তা তৈরী হ'তে হাজার হাজার বছর সময় লাগে। বহুদিন আগে পৃথিবীর কোন বিপর্য্যয়ের সময় বড় বড় বন-জঙ্গল মাটির নীচে চাপা প'ড়ে যায় এবং সেখানে হাজার হাজার বছর ধ'রে একটু একটু ক'রে গাছপালার মধ্যে কয়লা ছাড়া যে সব পদার্থ থাকে (হাইড্রোজেন, অক্সিজেন প্রভৃতি কতকগুলো গ্যাস) সেগুলো বেরিয়ে যায় এবং প'ড়ে থাকে কেবলমাত্র কয়লা। সুতরাং হাজার হাজার বছর ধ'রে মাটির নীচে গাছপালাগুলো একটু একটু ক'রে কয়লায় রূপান্তরিত হ'য়ে যায়। কিন্তু এই যে গ্যাসগুলো কাঠ থেকে বেরিয়ে এল তা যায় কোথায়? মাটি ফুঁড়ে ত আর সমস্ত গ্যাস বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে না! খানিকটা হয়ত কোন রকমে বেরিয়ে গেল, কিন্তু বাকিটা কয়লার সঙ্গেই মাটির নীচে থেকে গেল। কিছুদিন পরে আবার হাইড্রোজেন গ্যাস এবং কয়লার মধ্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া সুরু হয়, তা'তেই মার্শগ্যাসের সৃষ্টি। আরও অন্যান্য কতকগুলো গ্যাসেরও সেই সঙ্গে সৃষ্টি হয়, কিন্তু তাদের নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

সুতরাং এখন তোমরা বুঝতে পারছ যে, ওইভাবে যে মার্শগ্যাসের সৃষ্টি হ'ল তা মাটির নীচেই চাপা রইল এবং কালে তাই আমরা কয়লা-খনির মধ্যে দেখতে পাই।

এই প্রসঙ্গে মার্শগ্যাস জিনিসটার সঙ্গে তোমাদের একটু ভাল ক'রে পরিচয় করিয়ে দেওয়া দরকার। মাটির নীচে যেখানে বাতাস নেই, তেমন কোন জায়গায় যদি গাছপালা বা লতাপাতা কিছুদিন ধ'রে প'ড়ে থাকে, তা হ'লে সেই গাছপালা বা লতাপাতাগুলো একটু একটু ক'রে ভেঙ্গে যায় এবং মার্শগ্যাসের সৃষ্টি হয়। একটা উদাহরণ দিই। তোমরা অনেকেই লক্ষ্য করেছ যে, কোন পেঁকো পুকুরের নীচের পাঁক যদি একটা লগি দিয়ে খোঁচা দেওয়া যায় বা পা দিয়ে মাড়ান যায়, তা হ'লে জলের ওপরে কতকগুলো বুদ্বুদ উঠে আসে। সেই বুদ্বুদগুলোই মার্শগ্যাস। ওই বুদ্বুদগুলোকে তোমরা পরীক্ষা ক'রে দেখতে পার। একটা ঘটি জলে ভর্ত্তি ক'রে, যেখান দিয়ে বুদ্বুদ উঠছে সেখানে ঘটির মুখটা জলের মধ্যে ডুবিয়ে ধর। বুদ্বুদগুলো ঘটির মধ্যে জমা হবে। হাওয়ার সংস্পর্শে আসতে না দিয়ে গ্যাসটাকে যদি জ্বালিয়ে দাও তা হ'লে দেখবে যে গ্যাসটা জ্বলে' যাচ্ছে এবং তা'তে যে শিখা হচ্ছে তা অত্যন্ত অনুজ্জ্বল।

যাই হোক, যে প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম সেই প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক।

আমরা দেখেছি কি ক'রে কয়লা-খনির মধ্যে মার্শগ্যাস আসে। এবার কি ক'রে বিস্ফোরণ ঘটে তা নিয়ে আলোচনা করা যাক। মাটির নীচে যে মার্শগ্যাস কয়লার সঙ্গে থাকে তা কয়লা কেটে বের করবার পর বেরিয়ে পড়ে এবং খনির মধ্যের বাতাসের সঙ্গে মিশে যায়। ফলে বিস্ফোরক পদার্থের সৃষ্টি করে। এই বিস্ফোরক পদার্থটি খনির মধ্যে থেকে গেল, কিন্তু এর কথা কেউ জানতে পারল না। ফলে যখন খনির মধ্যে কাজ করবার জন্যে বাতি নিয়ে যাওয়া হ'ল,

পেঁকো পুকুরের পাঁকে খোঁচা দেওয়াতে বুদ্বুদ উঠছে

তখন ওই বিস্ফোরক পদার্থটি আগুনের সংস্পর্শে এসে জ্বলে' উঠল এবং খনিতে বিস্ফোরণজনিত দুর্ঘটনা ঘটে গেল!

খনির লোকেরা জানত যে, মার্শগ্যাসের উপস্থিতির জন্যেই খনিতে দুর্ঘটনা ঘটে, কিন্তু খনির মধ্যে কোথায় মার্শগ্যাস আছে তা জানা তাদের পক্ষে সম্ভব হ'ত না। তাই বাতি নিয়ে খনিতে নামবার সময় তাদের মনে সর্ব্বদা একটা ভয় থাকত—হয়ত কোথাও মার্শগ্যাস আছে; সেখানে বাতি নিয়ে গেলে আগুন লেগে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এবং দুর্ঘটনা ঘটা মানেই—যে বাতি নিয়ে খনির মধ্যে নামবে তার নিশ্চিত মৃত্যু। কিন্তু এর কোন প্রতিকার তখন ছিল না। তাই বাতি নিয়ে খনির মধ্যে নামতে গেলেই লোককে সর্ব্বদা প্রাণভয়ে শঙ্কিত থাকতে হ'ত।

সেই জন্যই খনির লোকেরা মার্শগ্যাসের নাম দিয়েছিল "ফায়ার ড্যাম্প", অর্থাৎ আগুনের সংস্পর্শ পেলেই যা ভয়ঙ্কর হ'য়ে ওঠে এবং দুর্ঘটনা ঘটায়।

কিন্তু আজকাল খনিতে এ দুর্ঘটনা অনেক পরিমাণে ক'মে গেছে এবং ক'মে যাওয়ার কারণ স্যার হাম্‌ফ্রে ডেভী সাহেবের 'সেফ্‌টি ল্যাম্পের' আবিষ্কার। সেফ্‌টি ল্যাম্প জিনিসটা এমনভাবে তৈরী যে, খনির মধ্যে নিয়ে গেলেও মার্শগ্যাস ও আগুনের হাওয়ার মিশ্রণ ঘটতে পারে না এবং তা'তে কোন দুর্ঘটনাও ঘটে না।

ব্যাপারটা কি ক'রে সম্ভব তা ভেবে তোমরা বোধ হয় অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ করছ, কিন্তু সব খুলে বললেই বুঝতে পারবে যে, এতে আশ্চর্য্য বোধ করবার মত কিছু নেই। সেফ্‌টি ল্যাম্প জিনিসটা কি তা বোঝবার সুবিধের জন্যে কয়েকটা কথা আগে তোমাদের ব'লে নিই।

'বার্ণার' কি জিনিস তা তোমরা সকলেই জান। বুনসেন নামে একজন সাহেব একরকম বার্ণার আবিষ্কার করেছিলেন যাকে বলা হয় 'বুনসেন বার্ণার'। এতে কয়লার গ্যাস (coal gas) জ্বালান হয়। এখন, এই বুনসেন বার্ণারের আগুনের শিখার ওপর একটা তারের জাল ধর। দেখবে যে কিছুক্ষণ আগুনের শিখা জালের ওপরে আসছে না, অর্থাৎ আগুনের শিখা জালের নীচে পর্য্যন্ত জ্বলছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দেখা যাবে যে, আগুনের শিখা জালের নীচে এবং ওপরে দু'দিকেই রয়েছে। তেমনি, যদি গ্যাস প্রথমেই না জ্বালিয়ে, গ্যাস খুলে দিয়ে আগে বার্ণারের মুখের কিছু ওপরে জালটা ধর এবং তারপর জালের ওপরদিকে আগুন দাও, তা হ'লে দেখতে পাবে যে, আগুন শুধু জালের ওপর দিকেই জ্বলছে, নীচে কোন আগুন নেই! কিছুক্ষণ পরে অবশ্য জালের দু'দিকেই আগুন দেখা যাবে।

এ রকম হওয়ার কারণটা তোমাদের বোঝান দরকার। ব্যাপারটা হচ্ছে এই—তারের জালটা কোন ধাতুর তৈরী এবং তোমরা জান যে, প্রত্যেক ধাতুই তাপের সু-পরিচালক, অর্থাৎ ধাতব পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপ তাড়াতাড়ি চলাচল করতে পারে। যেমন, একটা ধাতব পদার্থের এক প্রান্তে যদি তাপ দেওয়া যায়, তা হ'লে পদার্থটির অপর প্রান্তও শীঘ্রই উত্তপ্ত হ'য়ে ওঠে। আবার, প্রত্যেক পদার্থকেই জ্বালাতে হ'লে জ্বালাবার আগে, তা'কে একটা বিশেষ পরিমাণ তাপে তাতান দরকার। পদার্থটি সেই বিশেষ পরিমাণ তাপ যতক্ষণ পর্য্যন্ত না পাচ্ছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেটি জ্বলবে না। ব্যাপারটা বোঝার সুবিধের জন্য একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। তোমরা হয়ত লক্ষ্য করেছ যে, রান্না করবার সময় কখনও কখনও কড়ার তেলে আগুন লেগে যায়। আগুন তখনই লাগে যখন কড়াটাকে শুধু শুধু অনেকক্ষণ উনুনে বসিয়ে রাখা হয়, অর্থাৎ কড়ার তেলে তখনই আগুন লাগে যখন তেল জ্বলবার বিশেষ ডিগ্রী উত্তাপে তেলটা এসে পৌছায়।

উপরি উক্ত ব্যাপারেও ঠিক একই অবস্থা হয়। প্রথমে জালের ওপরে বা নীচে আগুন না জ্বলার কারণ এই যে, সেখানে যে গ্যাস থাকে, তা জ্বলবার জন্যে যতটা তাপ দরকার ততটা তাপ

সেখানে থাকে না। কারণ, জালের নীচে বা ওপরে যে আগুন থাকে তার তাপ প্রথমতঃ কিছুক্ষণের জন্য জালটির মধ্য দিয়ে পরিচালিত হ'য়ে যায়। কিন্তু এই ভাবে তাপ পরিচালিত হ'তে হ'তে জালটি অল্পক্ষণ পরেই উত্তপ্ত হ'য়ে ওঠে এবং এত বেশী উত্তপ্ত হয় যে, তার পক্ষে আর তাপ পরিচালিত করা সম্ভবপর হয় না। তখন জালের এধারের আগুনের উত্তাপ জালের অপর ধারের গ্যাস পেতে থাকে এবং উপযুক্ত ডিগ্রী উত্তাপ পাবার পরই জ্বলে' ওঠে।

এই ঘটনাটির ওপর নির্ভর ক'রেই ডেভী সাহেব তাঁর সেফ্‌টি ল্যাম্প তৈরী করেছেন। এই সেফ্‌টি ল্যাম্পের মধ্যে অসাধারণ কিছুই নেই। এটা একটা সাধারণ তেলের বাতি ; তার পলতের চারদিক ভাল ক'রে তারের জাল দিয়ে ঘেরা থাকে। এখন জিনিসটা একটু উন্নত হয়েছে। এখনকার সেফ্‌টি ল্যাম্পে থাকে পলতের চতুর্দ্দিকে একটা মোটা কাঁচের চিমনী এবং এই চিমনীর চারদিকে থাকে তারের জাল।

তোমরা অনেকে হয়ত এখনও ভেবে পাচ্ছ না যে, এই ধরণের সামান্য একটা জিনিসদ্বারা কি ক'রে বিস্ফোরণ ও দুর্ঘটনার হাত থেকে খনিগুলো রক্ষা পায়। তা খুলে বলছি, শোন।

সেফ্‌টি ল্যাম্পটাকে যখন খনির মধ্যে নিয়ে যাওয়া হ'ল, তখন যদি কোন জায়গায় বাতাস এবং মার্শগ্যাসের বিস্ফোরক সংমিশ্রিত পদার্থটি থাকে তা হ'লে তার খানিকটা সেফ্‌টি ল্যাম্পের চিমনীর মধ্যে ঢুকবে এবং জ্বলে' যাবে। এতে অবশ্য চিমনীর মধ্যে সামান্য একটু বিস্ফোরণ ঘটবে, কিন্তু তা এত সামান্য যে চিমনীর কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। কারণ, চিমনীর মধ্যে মার্শগ্যাস ও বাতাস জ্বলে' উঠলে যে উত্তাপের সৃষ্টি হবে তা তারের জালের বাইরে আসতে পারবে না। ফলে জালের বাইরে যে বাতাস ও মার্শগ্যাস থাকবে তা'তে আর আগুন লাগতে পারবে না ; সুতরাং বিস্ফোরণও ঘটবে না।

এখন আশা করি, তোমরা খনির মধ্যে সেফ্‌টি ল্যাম্পের উপকারিতা কি তা বুঝতে পেরেছ। তবে সেফ্‌টি ল্যাম্পেও যে দুর্ঘটনা একদম ঘটে না তা নয়। দুর্ঘটনা ঘটে তখন, যখন হঠাৎ হাওয়া এসে বাতির শিখা জালের বাইরে বের ক'রে দেয়, কিংবা যখন অনেকক্ষণ ধ'রে জ্বলার ফলে তারের জালের কোন অংশ খুব গরম হ'য়ে ওঠে এবং বাতাস ও মার্শগ্যাস জ্বলবার উপযুক্ত পরিমাণ উত্তাপ জালের বাইরে যায়। তবে এ ধরণের ঘটনা সাধারণতঃ খুব কমই ঘটে।

তাই, বলা যেতে পারে যে ডেভীর সেফ্‌টি ল্যাম্প আবিষ্কারের পর থেকেই খনিতে বিস্ফোরণ ঘটা বন্ধ হ'য়ে গেছে।

দেশের নেতা হ'তে যদি চাও

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়, এম. এস্-সি.

তোমরা কি দেশের নেতা হ'তে চাও? নেতা হ'তে পারলে পাঁচজনে নাম করবে, দেশ-বিদেশে সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে; সুতরাং নেতা হ'তে চাও না, এমন নির্ব্বোধ তোমাদের আমি বলতে চাইনে। কিন্তু নেতা হ'তে চাইলে দলপতির সাথে কতটুকু তোমার মিল আছে তা মিলিয়ে দেখ। মিল না থাকলেও হতাশ হবার কোন কারণ নেই—চেষ্টা করলে ভবিষ্যৎ জীবনে তোমরাই হবে দেশের আশা-ভরসা!

মনস্তত্ত্ববিদ্গণ গবেষণা ক'রে দেখেছেন যে, অতি শৈশবকালেই শিশুদের মধ্যে নেতা হবার মত গুণ দেখা যায়। তাঁরা তিন বছরের শিশুদের পরীক্ষা ক'রে তাদের তিনভাগ করেছেন: যথা—(১) সামাজিক অন্ধ—কোন শিশু এদের কাছে এলে এরা সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকে; অর্থাৎ এদের হাবভাব দেখে বোঝাই যায় না যে কাউকে দেখতে পেয়েছে। (২) সামাজিক পরাধীন—কেউ কাছে এলে এরা চেয়ে চেয়ে দেখে, ভাব করতে চায়, কিন্তু সাহস পায় না। (৩) সামাজিক স্বাধীন—কেউ কাছে এলে এরা মুহূর্ত্তে ভাব ক'রে ফেলে, শব্দ করে, কথা বলে।

সাত-আট মাসের শিশুদের মধ্যেও এটা দেখা যায়। ছুটো শিশু এক জায়গায় হ'লে একজন আর একজনের ওপর প্রভুত্ব করে—হয় আদর করে, নয় পুতুল কেড়ে নেয়, নয় ত বা মারে। সাধারণতঃ বলবান্ শিশুরাই প্রধান হয়, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়—অপেক্ষাকৃত ছুর্ব্বল শিশুই প্রাধান্য লাভ করেছে। কোন অপরিচিত লোক কাছে এলে কেউ কাঁদে, কোলে যেতে চায় না; আবার কেউ হাসিমুখে কোলে যায়—তার কাছে চেনা-অচেনা ছুই-ই সমান। সে চায় মানুষের সঙ্গ। নেতা হ'তে হ'লে এ গুণটা থাকা দরকার—মানুষের সঙ্গে মিশবার অবাধ ক্ষমতা।

সাধারণতঃ ছেলেদের পাঁচভাগে ভাগ করা হয়:—

(১) অভিভাবক ধরণের ছেলে—এরা অপেক্ষাকৃত ছুর্ব্বল ও লাজুক ছেলেদের রক্ষা করে। (২) দেখতে যারা সুন্দর—সকলে এদের ভালবাসতে চায় ও পছন্দ করে।

সেজন্য এদেরও দল থাকে। কিন্তু ওই এক গুণে কেউ কখন দলপতি হ'তে পারে না। (৩) নেতা—এরা উদ্দেশ্যের পিছনে দলকে চালিত করে। (৪) গুণ্ডাধরণের ছেলে—এরা গোঁয়ার হয়, স্বার্থ ও জেদের জন্য যা ইচ্ছা তাই করে। (৫) সমাজে যারা কোন কালেই প্রধান হ'তে পারে না—যেমন, অত্যন্ত দরিদ্র, হাবা, নোংরা, কানা, খোঁড়া, অন্ধ, বোবা, কালা ইত্যাদি।

স্কুলের ছেলেদের পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে, সাধারণতঃ ক্লাশের সমস্ত ছেলে একযোগে কোন কাজ করে না। ক্লাশের মধ্যে ছোট ছোট দল থাকে এবং প্রত্যেক দলের একজন সর্দ্দার থাকে। গোটা ক্লাশের সর্দ্দার হওয়া একটু কঠিন; কেননা তার অধীনে থাকে ছোট ছোট দলের সর্দ্দারেরা। সুতরাং ক্লাশের দলপতির কিছু বেশী গুণ থাকা চাই। যেমন—

(১) নিজের মত জোর ক'রে চালান উচিত নয়। কোন কিছু করতে হ'লে সকলের মত নেওয়া ভাল এবং কার্য্যকরী মতটা বেছে নেবার মত জ্ঞান ও বুদ্ধি থাকা চাই।

(২) দলের বেশীর ভাগ ছেলের ঝোঁকটা কোন্ দিকে জানা চাই। ধর, হরতালের জন্য ক্লাশ থেকে বেরিয়ে আসা সম্বন্ধে তোমাদের গোল বেঁধেছে। সাহস ক'রে অনেকে হয়ত জানাতে পারছে না; কিন্তু বেশীর ভাগ ছেলের মনের ইচ্ছা—বেরিয়ে আসা। তাদের এই মনের কথাটি তোমাকে জানতে হবে; তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা।

(৩) ক্লাশের ছেলেদের আদর্শস্থানীয় হওয়া প্রয়োজন।

ছাত্রদের কাছে খেলা-ধূলা অত্যন্ত প্রিয়। সুতরাং দলপতির খেলা-ধূলায় পারদর্শী হওয়া ভাল। যারা খেলা-ধূলায় ওস্তাদ, তা'রা স্কুল বা কলেজ জীবনে কি ছাত্র কি শিক্ষক সকলের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়। লেখাপড়ায় মোটামুটি ভাল হ'লে তা'রা দলপতির আসন অনায়াসে দখল করতে পারে; কেননা দলপতিত্ব নির্ভর করে চরিত্রের দৃঢ়তার ওপর এবং খেলা-ধূলায় চরিত্র দৃঢ় হয়। পড়াশুনায় যারা প্রতিভাসম্পন্ন, তা'রা বহির্জগৎ সম্বন্ধে প্রায়ই অনভিজ্ঞ হয়। দেখা যাচ্ছে দলপতি হ'তে হ'লে প্রতিভাসম্পন্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই। আসল জিনিস হচ্ছে চরিত্রের সততা ও দৃঢ়তা। হলিঙ্গওয়ারথ্ সাহেব বলেছেন যে, দলপতির বুদ্ধি ও বিদ্যা থাকা প্রয়োজন বটে, কিন্তু বেশী বুদ্ধিমান হ'লে জনসাধারণ তার কার্য্যকলাপ ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। দলপতিত্ব শুধু ঘটনার

ওপর নির্ভর করে না, প্রত্যেক স্বতন্ত্র লোকের ওপরও নির্ভর করে অর্থাৎ স্থান, কাল ও পাত্র অনুসারে দলপতিকে চলতে হবে।

নেতা বা দলপতি দু'রকমের :—(১) স্বল্পকালের নেতা—এরা জোর ক'রে নিজের মত ও ইচ্ছা বজায় রাখতে চায়, ফলে দল ভেঙ্গে যায় ; অথবা শত্রুতার বশে কাউকে জব্দ করতে চায়। খিট্‌খিটে মেজাজ হ'লে দল থাকে না। (২) দীর্ঘকালের নেতা—এদের উদ্দেশ্য মহৎ থাকে ; সুশৃঙ্খলার সাথে কাজ সম্পন্ন করে, দলের মতামতের সাথে নিজের মতের সামঞ্জস্য থাকে, ঠিকপথে চলবার দৃঢ়দৃষ্টি ও জ্ঞান থাকে।

দশ হ'তে চৌদ্দ বছরের বালক-বালিকাদের একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল—'খেলার সময় সঙ্গীদের কোন্ জিনিস তোমরা অপছন্দ কর ? তাদের উত্তর ছিল—

(১) স্বার্থপরতা, অহঙ্কার, অবাধ্যতা, ফাঁকি।

(২) মিথ্যাবাদিতা, একদেশদর্শিতা, নিয়মবিরুদ্ধতা, ঝগড়া, ঠকান।

(৩) খেলার জিনিস নষ্ট বা চুরি করা, বিরক্ত করা, হিংসা করা, বাধা দেওয়া।

(৪) অসাবধানতা, অভদ্রতা, অসভ্যতা, নোংরামি, গোল করা।

এই দোষগুলো অন্য কেউ করলে তোমরা অপছন্দ কর, কিন্তু নিজেরা যখন কর তখন সে-কথা মনে থাকে না। এই দোষগুলো ছাড়তে হবে।

দীর্ঘকালের দলপতিরা তিন প্রকার :—

(১) সর্ব্বেসর্ব্বা ধরণের—এরা স্বার্থপর হয়। দলকে চালনা করে বটে, কিন্তু স্বার্থের দিকে দৃষ্টি থাকে। নিজের ভাল হ'লেই নেতৃত্বের বাসনা ক'মে যায়। নামের দিকে মোহ বেশী। তবে এরা ব্যক্তিত্ব জোর গলায় প্রকাশ করতে পারে।

(২) শিক্ষক ধরণের—এরা স্বার্থপর হয় না। দলের ভালমন্দের দিকে এদের দৃষ্টি প্রখর। এরা অত্যন্ত সাবধানী হয়। দলকে গঠন করবার দিকেই এদের নজর বেশী।

(৩) শিষ্য ধরণের—এরা সব সময়েই দলকে উদ্দেশ্যের পিছনে চালনা করে ; লক্ষ্যে পৌঁছানই এদের তপস্যা। এরাও নিঃস্বার্থ হয়।

যে কোন দেশের পক্ষেই এই তিনরকম নেতা দরকার। প্রথম নেতা দেশকে জাগায়, দ্বিতীয় নেতা দেশকে গ'ড়ে তোলে, তৃতীয় নেতা দেশকে স্বাধীন করে। ভারতবর্ষেও প্রথম দু'রকমের নেতার খোঁজ পাওয়া গেছে, এখন তৃতীয় রকম নেতার আগমন-পথ চেয়ে আমরা ব'সে আছি।

সে যাই হোক, তোমরা যদি নেতা হ'তে চাও, তবে উপরি উক্ত দোষগুলো ছাড়। দোষগুলো ছাড়তে পারলে তোমরা সভ্যজগতের গৌরবের বস্তু হ'য়ে উঠবে।

তোমরা ভাবতে পার, দোষগুলো যদি সবাই ছাড়ে, তবে সবাই কি ক'রে নেতা হবে? সবাই নেতা হ'তে পারবে না বটে, তোমাদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত তা'রাই হবে নেতা; কিন্তু অন্যেরা হবে উপযুক্ত শিষ্যের দল—যাদের ছাড়া নেতাদের একপাও চলবার উপায় নেই। নেতাদের নাম হয় বেশী বটে, কিন্তু এই নামের মূলে থাকে নীরব-কর্ম্মী নিঃস্বার্থ শিষ্যের দল। প্রকৃতপক্ষে কৃতিত্বটা এদেরই। এজন্য নেতা হওয়ার চাইতে বিশ্বাসী শিষ্য হওয়া কঠিন। তোমরা যদি কেউ নেতা হ'তে পার এবং বিশ্বাসী শিষ্য পাও তখন দেখবে শিষ্যের মূল্য নেতার জীবনের চাইতেও বেশী।

আরাবল্লীর সন্ধ্যাপথে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

মুছে এলো রাঙা সিঁদূরের রেখা সন্ধ্যার সীঁথিমূলে,
ফুলে' ফুলে' ওঠে নয়নের বারি জীবনের কূলে কূলে।
বনে বনে জাগে বিষাদের ছায়া, মনে মনে মলিনতা;
নত রহে শির ব্যথা-বেদনায়, কারো মুখে নাহি কথা।
শেষ-বিদায়ের ব্যাকুল অশ্রু উদাস পূরবী গাহে,
উর্দ্ধে উদার ঘন নীলাকাশে প্রথম তারকা চাহে।

দূরে দেখা যায় চিতোর-দুর্গ বনানীর পথ হ'তে,
মেবার-সূর্য্য মাগিছে বিদায় চিতোরের বনপথে।
কহেন প্রতাপ—"আর কেন, মোরে নিয়ে চল প্রাঙ্গণে,
দেখা নাহি হবে চিতোর-দুর্গ জীবন-সন্ধ্যাক্ষণে।"
গোবিন্দসিং চাহিল তখন বারেক বৈদ্য-পানে,
কহিল বৈদ্য—"জীবনের আশা নাহি আর কোনখানে।"

"ওই সে চিতোর সারা জীবনের সাধনার দেবালয়,
ওই সে দুর্গ নিকষ পাথরে স্মৃতির গরিমাময়।
আবার চিতোর উদ্ধার ক'রে ভেবেছিনু যাবো চ'লে,
জীবনের বেলা শেষ হ'য়ে এলো হতাশ-অশ্রু-জলে।"

"দুঃখ ক'রো না প্রতাপ সিংহ" কহিল পৃথ্বীরাজ,
"সকল সময়ে পারে না সবাই শেষ ক'রে যেতে কাজ।
হয়তো কখন বাকী র'য়ে যায়, কখনো পিছোতে পারে,
সে-কাজ সাধিতে যোগ্য দায়াদ্ কত আসে সংসারে!
স্রোতের পরেতে আসিতেছে স্রোত, সে স্রোত পিছায়ে যায়,
এমনি করিয়া বিশাল সিন্ধু বিশ্বের পথে ধায়।
মুছে ফেল বীর ভাবনা-বেদনা অকারণ মনোদুখে,—"
কহেন প্রতাপ—"মরণ আমার হবে না বন্ধু সুখে।
ভাবনা-বেদনা থাকিত না মোর,—বীরের জনক হ'য়ে
মরিতাম যদি।"···সহসা প্রতাপ দারুণ বেদনা স'য়ে
পার্শ্বে ফিরিয়া রহিল শয়নে; গোবিন সিংহ কহে—
"গভীর বেদনা পেয়েছ কি তুমি?"—"দেহের জন্য নহে।
এ বেদনা বন্ধু, অতীব ভীষণ মনের ভিতরে জাগে,
আমার কর্ম্ম পিছায়ে পড়িবে এই শুধু মনে লাগে।
মম অর্জ্জিত সাধের রাজ্য মোগলের করে সঁপি'
পুত্র অমর যাপিবে জীবন বাদশাহী মান লভি'।

গোবিন সিংহ! বিলাসী অমর ভোগ-লালসায় রত,
জনমভূমির স্বাধীনতা-সুখ রচিবে না মোর মত।
সব হারানোর তীব্র গরল করেছি নিয়ত পান,
বনে বনে ঘুরে ক্ষয়-ক্ষতি ভুলে গেয়েছি দেশের গান।

স্বাধীনতা নিয়ে সাধিয়াছি ব্রত বিজয়-পতাকা তুলি,
অমর সিংহ ভুলে যাবে মোর জীবন-মন্ত্রগুলি।
পর্ণকুটীর র'বে না হেথায়, কত-না প্রাসাদ হবে!"
কহে গোবিন্দ—"বাপ্পার নামে শপথ করিয়া সবে
জানাই তোমারে পর্ণকুটীর হেথা ভাঙিবে না কেহ,
কহেন প্রতাপ—"হর্ষে এখন ত্যজিব আমার দেহ।"

চাহিয়া প্রতাপ অমরের পানে কহেন—"সরিয়া আয়,
যেথায় চলেছি সেথা এক দিন সকলেই চ'লে যায়।
কেঁদো না বৎস! একলা পথের করি নি পথিক তোরে,
যাহাদের কাছে রেখে গেনু আজ,—পঁচিশ বছর ধ'রে
দুঃখ-সুখের অনুগামী মোর ঝড়-বাদলের সাথী,
গিরি-সঙ্কটে বনে বনে সদা ঘুরেছে দিবস-রাতি।

তাহাদের যদি নাহি কর ত্যাগ, শ্রদ্ধা করিতে পারো,
তোমারেও ত্যাগ করিবে না কেহ, শ্রদ্ধা করিবে আরো।

"মেবার রাজ্য দিয়ে গেনু তোরে, রহিল চিতোর বাকী,—
আর দিয়ে গেনু মোর গুরুভার, সে-কাজে দিও না ফাঁকি।
তোমারে চিতোর উদ্ধার করি' নিতে হবে নিজ হাতে,
কলুষ-বিহীন লহ অসি মোর আশীর্ব্বাদের সাথে।

ব্যর্থ হবে না পিতার আশিস্—ব্যর্থ ক'রো না তুমি,
পরাধীন যেন ক'রো না আমার সাধের মেবার-ভূমি।
গরিমার হার কণ্ঠে পরিয়া সুখে রহ চিরদিন—"
থেমে আসে সুর, ভেঙে যায় বুঝি মেবারের হৃদি-বীণ!

শেষের অশ্রু ঝরিয়া পড়িল অমরের পানে চাহি';
সহসা বৈদ্য নাড়ী ধ'রে কহে—"মেবার-সিংহ নাহি।"
স্বচ্ছ পেশোলা সরোবর-তীরে উঠিল আর্ত্তনাদ,
রাজস্থানের গিরীদরী পথে নামে দুর্য্যোগ-রাত।

বিজয়সেনের নৌ-বিতান

অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

[দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে পালরাজ বংশ ধ্বংস করিয়া সেনবংশীয় নৃপতি বিজয়সেন বাঙ্গালাদেশে এক শক্তিশালী রাজ্য সংগঠন করেন। এইখানে— শেষ পালরাজা মদনপালদেবের পরাজয়-কাহিনী, বিজয়সেনের বিজয়বার্ত্তা এবং আনুগাঙ্গ্য প্রদেশ জয় করিবার জন্য তাঁহার নৌ-বিতান প্রেরণের কথা বলা হইল।]

—এক—

আজ হইতে প্রায় হাজার বৎসর আগে পাল রাজাদের রাজধানী রামাবতী নগরে মদনপালদেব রাজত্ব করিতেন। অনেকে বলেন, মদনপালদেবই হইতেছেন পাল বংশের শেষ স্বাধীন রাজা। তাঁহার পর যাঁহারা রাজত্ব করিয়াছেন, তাঁহাদের স্বাধীন বলিয়া গর্ব্ব করিবার মত কিছুই ছিল না।

এই রাজা মদনপালদেব বড় একটা অন্যায় কাজ করিয়া সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। তৃতীয় গোপালদেব, মদনপালদেবের বড় ভাই। তিনি মৃত্যুকালে, মদনপালের হাতে তাঁহার মহিষী ও শিশু পুত্রকে রক্ষার ভার দেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "ভাই, তুমি মহারাণীকে আর তোমার এই শিশু ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে দেখিও";—এই কথা বলিয়া, তিনি পরলোকে চলিয়া গেলেন। কিন্তু রাজ্যলোভী মদনপাল, ভ্রাতার মৃত্যু-শয্যায় বসিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা কোথায় ভাসিয়া গেল! মহারাণীর প্রতি অবিচার করিয়া কোথায় যে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলেন, কেহ তাহা জানে না; আর এদিকে শিশু ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করিয়া সেই শিশুর রক্তে রাঙ্গা হাত দুইখানি লইয়া তিনি ন্যায়ের দণ্ড ধরিয়া বসিলেন সিংহাসনে!

এই ভাবে মদনপাল হইলেন গৌড়েশ্বর। তিনি যখন গৌড়ের সিংহাসনে বসিলেন, তখন বিরাট পাল-সাম্রাজ্য ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। উত্তরবঙ্গ ও মগধ লইয়াই ছিল, তখন গৌড়-সাম্রাজ্য; আর রাজধানী ছিল রামাবতী।

রামাবতী নগরী কোথায় ছিল কেহ ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। তাহা লইয়া এখনও তর্ক চলিতেছে। পণ্ডিতেরা নানা জনে নানা স্থানকে রামাবতী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তবে প্রাচীন রামাবতী "সরকার জন্নতাবাদ" বা গৌড়ের সীমার মধ্যে যে অবস্থিত ছিল, সে-কথা প্রায় সকলেই বলেন। তোমরা বড় হইয়া যদি মাটি খুঁড়িয়া রামাবতী সহরটি বাহির করিতে পার, তাহা হইলে মস্তবড় একটা কীর্ত্তি রাখিতে পারিবে।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে-সময়ে মদনপালদেব গৌড়েশ্বর। উত্তরবঙ্গ, বরেন্দ্র

রাণী চিত্রমতিকা দেবী 'মহাভারত'-পাঠ শুনিতেছেন। —১০১ পৃষ্ঠা

ও মগধের পূর্ব্বাংশ তাঁহার শাসনাধীন। কিন্তু চারিদিকে শত্রু মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেই সময় রাঢ় ও বঙ্গে বিজয়সেন নামে সেন বংশের একজন রাজা বীরদম্ভে দেশে দেশে বিজয়-বাহিনী প্রেরণ করিতেছিলেন। মদনপালদেব সেই নব-জাগ্রত সেন রাজাকে ভয়ের চক্ষে দেখিতেন।

—দুই—

রাজধানী রামাবতী নগরের এক দিনকার একটি কথা বলিতেছি।

রাজবাড়ীর অন্তঃপুরে মদনপালদেবের পত্নী—মহারাজ্ঞী পট্টমহাদেবী চিত্রমতিকা দেবী একটি প্রশস্ত সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া অন্যান্য অন্তঃপুরিকাদের সহিত 'মহাভারত' পাঠ শুনিতেছিলেন। কথক ব্রাহ্মণের নাম বটেশ্বরস্বামী শর্ম্মা। ব্রাহ্মণের নিবাস চম্পাহিটি নামক গ্রাম। তাঁহার বয়স পঞ্চাশের উপর। ব্রাহ্মণ গৌরকান্তি—দীর্ঘদেহ। মস্তকের সম্মুখভাগ মুণ্ডিত। দীর্ঘ শিখার অগ্রভাগে পুষ্পগুচ্ছ। ললাট চন্দন-চর্চ্চিত। কণ্ঠে নবমল্লিকার মালা সৌরভ ছড়াইয়া দুলিতেছিল। গলায় শুভ্র উপবীত—গৌর দেহের সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছিল।

বটেশ্বরস্বামী শর্ম্মা 'মহাভারত' পাঠ করিতেছিলেন। তিনি এমন মধুর কণ্ঠে নল-দময়ন্তীর করুণ-কাহিনী নানা সুরে ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছিলেন যে, সেই প্রশস্ত কক্ষে অপূর্ব্ব ভাবাবেশের সৃষ্টি হইয়াছিল। রাণী চিত্রমতিকা দেবীর দুই চক্ষু বাহিয়া দময়ন্তীর দুঃখ ও বেদনায় অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল। তাঁহার সঙ্গিনীরাও পট্ট মহাদেবীরই মত অশ্রু মোচন করিতেছিল।

কখন কোন্ সময়ে মহারাজা মদনপালদেব সেই কক্ষে আসিয়া উহার এক প্রান্তে বসিয়া পাঠ শুনিতেছিলেন তাহা কেহ লক্ষ্য করেন নাই। পাঠ শেষ হইলে—মহারাজা বটেশ্বরস্বামী শর্ম্মাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"চমৎকার শক্তি আপনার, আমি আপনার কথকতায় মুগ্ধ হইয়াছি।"

বটেশ্বরস্বামী পুলকভরে দুই হাত তুলিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন—"মহারাজার জয় হউক!"

মহারাজা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"জয়! তাহাই যেন হয় ঠাকুর!"

চিত্রমতিকা দেবী কহিলেন—"কথক ঠাকুরকে আমি দক্ষিণা দিতে ইচ্ছা করি মহারাজ!"

মদনপালদেব বলিলেন—"মহিষীর যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে।"

মহারাণী কহিলেন—"আমার ইচ্ছা কথক ঠাকুরকে তাঁহার ইচ্ছামত দক্ষিণা দেওয়াই কর্ত্তব্য।"

বটেশ্বরস্বামী শর্ম্মা বলিলেন—"মহারাজ্ঞি, আমাকে লজ্জা দিবেন না। ব্রাহ্মণ দরিদ্র। দারিদ্র্যই তাহার মহত্ত্ব। তবে এই মাত্র আমার প্রার্থনা যেন আমি পুত্রকন্যাদের সহ দুইটি অন্ন গ্রহণ করিতে পারি।"

মহারাজা মদনপালদেব বলিলেন—"আপনার এই নির্লোভ কামনা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে।"

মদনপালদেব তাঁহার রাজত্বের অষ্টম বর্ষে কাষ্ঠগিরি নামক গ্রামখানি মহারাণী চিত্রমতিকা দেবীর মহাভারত পাঠ শুনিবার দক্ষিণা-স্বরূপ দান করিলেন।

সেকালে বৌদ্ধ রাজারা হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ করিতেন না। তাঁহারা যেমন হিন্দু-রাজকুমারীদের বিবাহ করিতেন, হিন্দু রাজারাও তেমনি বৌদ্ধ-রাজকুমারীদের বিবাহ করিতেন। বৌদ্ধ বিহারের কাছে হিন্দু মন্দির গড়িয়া উঠিত—ধর্ম্ম-দ্বন্দ্ব—ধর্ম্মের জন্য কলহ সে-সময়ে ছিল না। ছিল না বলিয়াই ব্রাহ্মণ বটেশ্বরস্বামী মহারাণী চিত্রমতিকা দেবীকে মহাভারত শ্রবণ করাইয়া ভূমি-দান লাভ করেন।

—তিন—

বাঙ্গালাদেশের সেন রাজাদের কথা তোমরা ইতিহাসে পড়িয়াছ। সেন রাজারা কিন্তু বাঙ্গালী ছিলেন না। কবে কোন্ সময় কি ভাবে তাঁহারা বাঙ্গালাদেশে আসেন সে-কথা বলা কঠিন। তবে তাঁহারা যে দাক্ষিণাত্য প্রদেশ হইতে আসিয়াছিলেন, সে-কথা আমরা তাম্র-শাসন হইতে জানিতে পারি। সেই পরিচয় হইতে আমরা সেন বংশের রাজাদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিতে পারিতেছি।

সেন রাজাদের সম্বন্ধে লিখিতে যাইয়া উমাপতিধর নামে একজন পণ্ডিত লিখিয়াছেন—বীরসেন নামে একজন ক্ষৌণীন্দ্র ছিলেন। তাঁহার বংশের সামন্তসেন কর্ণাটের রাজা ছিলেন। সামন্ত-সেনের পুত্রের নাম হেমন্তসেন। হেমন্তসেনের আর একটি নাম হইতেছে ত্রিবিক্রম। হেমন্তসেনের রাণীর নাম ছিল যশোদেবী। যশোদেবীর গর্ভে বিজয়সেনের জন্ম হয়। এই বিজয়সেনের বীরত্বের কথাই তোমাদের বলিব।

সেন রাজারা দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী হইলেও পরে বাঙ্গালাদেশে বাস করিয়া বাঙ্গালী সমাজে মিশিয়া বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছিলেন, যেমন প্রত্যেক জাতির মধ্যেই হইয়া থাকে। কাজেই সেন রাজারা বাঙ্গালী ছিলেন—একথা বলিলে কোনও দোষ হয় নাই।

বিজয়সেনই সেন বংশের প্রথম স্বাধীন রাজা। তিনি সিংহাসনে বসিয়া এক বৃহৎ বঙ্গরাজ্য স্থাপন করিবার জন্য পণ করিলেন। প্রথমে বিজয়সেন রাঢ়ের কতক অংশ জয় করিলেন, পরে সমগ্র রাঢ়দেশের অধিপতি হইলেন।

সে-সময়ে বিজয়সেনের প্রাণে জাগিল দিগ্বিজয়ের কথা। কেমন করিয়া এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিতে পারেন তাহাই হইল তাঁহার পণ। তিনি কলিঙ্গ রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাঁহার বন্ধু চোড়গঙ্গকে কলিঙ্গ রাজ্য দান করিলেন। তারপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল—বঙ্গ রাজ্যের দিকে।

বঙ্গ বলিতে পূর্ব্ববঙ্গকে বুঝায়। তখন পূর্ব্ববঙ্গে শ্রীবিক্রমপুর রাজধানীতে থাকিয়া বর্ম্মরাজারা

রাজত্ব করিতেন। বর্ম্মরাজাদের কোন্ রাজা তখন বঙ্গে রাজত্ব করিতেন ঠিক করিয়া বলা চলে না—হয় ভোজবর্ম্মা কিংবা তাঁহার কোন বংশধর হইবে। বঙ্গরাজ্য জয় করিয়া বিজয়সেন শ্রীবিক্রমপুরে তাঁহার রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই শ্রীবিক্রমপুরের রাজধানী হইতে চন্দ্র ও বর্ম্মবংশের রাজারা পূর্ব্বে রাজত্ব করিয়াছেন। শ্রীবিক্রমপুর রাজধানী তাঁহার কাছে বেশ ভাল লাগিল। সুন্দর সে দেশ। পদ্মা-মেঘনা-ইছামতী-ধলেশ্বরী নদী উহার চারিদিক বেড়িয়া বহিয়া চলিয়াছে। সেই সুজলা সুফলা দেশ শ্রীবিক্রমপুরের বনানীর শ্যামলা সুষমা, সুপারিতরুর বিচিত্র শোভা, আর ক্ষেতে ক্ষেতে নানা ফসল তাঁহাকে মুগ্ধ করিল। বড় বড় পণ্ডিতের বাসভূমি শ্রীবিক্রমপুরে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার বেশ আনন্দ হইল—কেননা দেশটি শত্রুর আক্রমণ হইতে নিরাপদ ছিল। নদ-নদী-সঙ্কুল বঙ্গরাজ্যে শত্রুর প্রবেশ সে কি বড় সহজ কথা? শ্রীবিক্রমপুর রাজধানীতে নিশ্চিন্ত হইয়া বিশাল রাজ্য শাসন করিতে করিতে বিজয়সেনের দৃষ্টি পড়িল—বরেন্দ্রের দিকে। একদিন তিনি রামাবতীতে দূত প্রেরণ করিলেন—গৌড়েশ্বর মদনপালের নিকট যুদ্ধ যাচ্ঞা করিয়া। হয় যুদ্ধ নতুবা স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ—এই ছিল বিজয়সেনের লিপির মর্ম্ম। গৌড়েশ্বর যাহা চাহেন, তাহাতেই তিনি স্বীকৃত।

—চার—

মদনপালদেব সেদিন রাজদরবারে বিষণ্ণমনে বসিয়া আছেন। রাজ্যে তাঁহার শান্তি নাই, মগধরাজ্য ধীরে ধীরে হাতছাড়া হইয়াছে। বরেন্দ্র রক্ষা করাও যে কঠিন! এমন সময় বিজয়-সেনের দূত আসিয়া এক লিপি প্রদান করিল। মদনপালদেব যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহাই হইল। তিনি প্রমাদ গণিলেন। পত্রের মর্ম্ম সকলকে বলিলেন; বলিলেন—"দম্ভী বিজয়সেন চায় গৌড়রাজ্যের ধ্বংস সাধন করিতে। আপনারা কি বলেন? বিনা যুদ্ধে কি আত্মসমর্পণ করাই শ্রেয়, না যুদ্ধ করিব?"

সেদিন সভায় সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিল—"সন্ধি নয় মহারাজ, যুদ্ধ চাই।"

মদনপাল বলিলেন—"যুদ্ধ! সত্যই আমিও যুদ্ধ চাই। যে বংশে আমার জন্ম, সেই বংশের মান ও সম্ভ্রম আমি কাপুরুষের মত বিনাযুদ্ধে পরাজয় মানিয়া বিসর্জ্জন দিব—তা কখনও নয়, কখনও নয়!"

বিজয়সেন দূতের মুখে সংবাদ পাইলেন,—মদনপালদেব যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। অমনি শ্রীবিক্রমপুরে যুদ্ধের সাড়া পড়িয়া গেল। শত শত রণতরী সাজিল,—পদাতিক সাজিল, সকলে হর্-হর্ বম্-বম্ শব্দে—বিক্রমপুরের বন-প্রান্তর পদ্মা-মেঘনার বুক প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। সৈন্যেরা শত শত কণ্ঠে "জয় বৃষভশঙ্কর মহারাজা বিজয়সেনের জয়" রবে চারিদিকে রণযাত্রার কথা প্রচার করিল।

—পাঁচ—

মদনপালদেব ও বিজয়সেনের সৈন্যের মধ্যে যুদ্ধ হইল। নৌ-যুদ্ধে বঙ্গ সৈনিকদের ছিল অসাধারণ নৈপুণ্য—তাহাদের কাছে মদনপালদেবের সৈন্যেরা স্রোতের বুকে তৃণের মত কোথায় ভাসিয়া গেল!

জলে ও স্থলে তুমুল যুদ্ধ হইল,—কিন্তু কিছুতেই বিজয়সেনের পরাক্রান্ত বিজয়-বাহিনীর সহিত মদনপালের সেনারা আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। বিজয়সেন মদনপালদেবকে সম্মুখ-সমরে পরাজিত করিলেন।

মদনপালদেব এই পরাজয়ের পর কোথায় চলিয়া গেলেন, ইতিহাস সে-কথা ভাল করিয়া বলিতে পারে না। কেহ কেহ বলেন, তিনি রাজ্য হারাইয়া মগধে গমন করেন। তাঁহার বংশের কে কোথায় গিয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন তাহাও আমরা জানি না। বিজয়সেনের নিকট এই পরাজয়ের পর হইতেই পালবংশের পতন হইল। সেদিন হইতেই রামাবতীর অতুল সম্পদ বিলুপ্ত হইল।

বিজয়সেন শিবভক্ত ছিলেন। তিনি শিবপূজা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। তিনি মনে করিলেন শিবের বরেই তাঁহার এই বিজয়লাভ হইয়াছে, তাই তিনি বরেন্দ্র বিজয় করিয়া সেখানে এক দ্বিতীয় রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করিলেন—তাহার নাম দিলেন 'বিজয়নগর' এবং সেখানে এক শিবের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। পূর্ব্বে সেইখানে রাজা প্রদ্যুম্নশূর কর্ত্তৃক স্থাপিত প্রদ্যুম্নেশ্বর নামক হরিহরের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল।

তোমরা যদি উত্তরবঙ্গে বেড়াইতে যাও, তাহা হইলে বিজয় রাজার এই নব প্রতিষ্ঠিত রাজধানীর ধ্বংস-চিহ্ন দেখিতে পাইবে। আর দেবপাড়ার পদ্নুম সহরে বেড়াইতে গেলে দেখিতে পাইবে চারিদিকের বিরাট স্তব্ধতার মধ্যে এক বিশাল দীঘি এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই দীঘির নাম পদ্নুম সহরের দীঘি। সেই দীঘির তীরে একটি বৃহৎ দেব-মন্দিরের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। বিজয়সেনের বিজয়নগরের নাম পরে বিজয়পুর হওয়া অসম্ভব নয়!

আমরা বিজয়সেনের এই বিজয়-কাহিনী কেমন করিয়া জানিতে পারিলাম জান?—রাজসাহী জেলার অন্তর্গত গোদাগাড়ি থানার দেওপাড়া বা দেবপাড়া গ্রামে একখানি পাথরের গায়ের খোদিত লিপি পাওয়া গিয়াছিল। সেই লিপিখানার অক্ষর বাঙ্গালা ও দেবনাগর অক্ষর হইতে একটু ভিন্ন রকমের। উমাপতিধর নামক একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত—বিজয়সেনের বংশ ও যশোবর্ণনা করিয়া একটি প্রশস্তি রচনা করেন—এই প্রস্তর-ফলকই হইতেছে সেই প্রশস্তি।

এই প্রশস্তিতে বিজয়সেনের বিজয়বার্ত্তা ঘোষিত হইয়াছে। পুত্র বল্লালসেন 'দান-সাগরে' গাহিয়াছেন—"দিকে দিকে তাঁহার বিজয়বার্ত্তা ঘোষিত, শত শত রাজা তাঁহার ভজনা করেন।"

—ছয়—

বিজয়সেন বিজয়নগরে একটি রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়া বরেন্দ্র রাজ্যে সুশাসনের ব্যবস্থা করিলেন এবং পরে শ্রীবিক্রমপুর রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন।

এই পরাক্রমশালী নৃপতি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার লোক ছিলেন না। এইবার তিনি সঙ্কল্প করিলেন—তাঁহার নৌ-বাহিনী শ্রীবিক্রমপুরের রাজধানী হইতে জলপথে বাহির হইয়া—গঙ্গানদীর স্রোতোধারা ক্ষেপনী সংযোগে উৎক্ষিপ্ত করিয়া চলিবে বিজয়-অভিযানে। গঙ্গার উৎপত্তিস্থান পর্য্যন্ত এই নৌ-বিতান চলিবে বিজয়সেনের বিজয়বার্ত্তা গাহিতে গাহিতে। সেকালে বিক্রমপুরে ও বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে নানা জাতীয় তরী তৈয়ারী হইত—বঙ্গরাজ্য ছিল নৌ-বহরের জন্য বিখ্যাত।

নৌ-বহর চলিল—আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিমদিক্ বা 'পাশ্চাত্য-চক্র' জয় করিতে। বিজয়সেনের যে দেবপাড়ার শিলা-লিপির কথা বলিয়াছি তাহাতে এই নৌ-বিতানের কথা আছে। গঙ্গার দুই তীরে তখন ছোট-বড় অনেক রাজ্য ছিল। দেশের চারিদিকে ছিল তখন বিদ্রোহ-বিপ্লব ও অশান্তি। তখন ছিল 'জোর যার মাটি তার'। যে সবলে অপরকে পরাজয় করিতে পারিত, তাহারই হইত রাজ্য-লাভ। সে-সময়ে উত্তর-ভারতে মুসলমানেরা আপনাদের রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন ও করিতেছিলেন। সেই যুগে বিজয়ী বিজয়সেন—পাশ্চাত্য-চক্র বিজয়ের জন্য নৌ-বিতান প্রেরণ করিলেন। *

নৌ-বিতান কোন্ কোন্ দেশ জয় করিল এবং কোন্ কোন্ নরপতি নতশিরে বিজয়সেনের পরাজয় মানিলেন সে-কথা জানা যায় না। এ কথাও জানা যায় না যে, সত্যসত্যই এই নৌ-বিতান জাহ্নবীর ধারা শিবের জটা হইতে যেখানে ঝর্-ঝর্ ঝম্-ঝম্ রবে পতিত হইয়া ত্রিপথগামিনী হইয়াছেন—ততদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল কিনা। তবে এই নৌ-বিতানের একখানি তরী যে ভগ্ন হইয়া গঙ্গা-প্রবাহে নিমজ্জিত হইয়াছিল সে-কথা প্রশস্তিকার লিখিয়া গিয়াছেন।

বৃষভশঙ্করগৌড়েশ্বর বিজয়সেনের বিজয়-কাহিনী,—তাঁহার মিথিলা, মগধ, উৎকল, কলিঙ্গের বিজয়বার্ত্তা আজিও ইতিহাসের বুকে বাঁচিয়া থাকিয়া বাঙ্গালী জাতিকে গৌরবান্বিত করিতেছে।

পিতার গৌরবে গৌরবান্বিত বল্লালসেন, 'দান-সাগরে' পিতার বীরত্বের কথা বলিয়াছেন; পৌত্র লক্ষ্মণসেন তাঁহার তাম্রলেখে পিতামহের কথা বলিতে যাইয়া বলিয়াছেন—"বিজয় সেনঃ স বিজয়ী!"

পাশ্চাত্যজয়চক্রকেলিষু যস্য যাবদ
গঙ্গাপ্রবাহমনুধাবতি নৌ-বিতানে।
ভর্গস্য মৌলিসরিদম্ভসি ভস্মপঙ্ক
লগ্নোজ্ঝিতেব তরিবিন্দুকলা চকাস্তি॥ [দেবপাড়া শিলালিপি ২২ শ্লোক।]

হাতীর দাঁতের গুঁড়ো

শ্রীদেবাংশু সেনগুপ্ত

ব্যাপারটা একটু প্রথম থেকেই খুলে বলা দরকার।

আমাদের খুকুরাণীর সে'বার ভয়ানক এক প্রকার জ্বর হ'ল। লক্ষণের মধ্যে মাথার যন্ত্রণাই সব চেয়ে প্রবল। অনেক হোমিওপ্যাথ ও অ্যালোপ্যাথ ডাক্তার দেখিয়ে যখন কিছু হ'ল না, সকলে বললেন—"ভাল দেখে একজন কোব্‌রেজ দেখাও।"

কোব্‌রেজ এলেন বত্রিশ টাকা ভিজিটের। টাকা ক'টি পকেটে রেখে বললেন—"আরে মশাই, দিশী রোগের কি আর বিদিশী চিকিচ্ছে হয়! ওষুধ-বিষুধের দরকার নেই, মাথাটা নেড়া ক'রে দিয়ে পুরাণো ঘি মালিশ করুন।"

কথাটা আমাদের মনে ধরল। কিন্তু খুকুরাণী কিছুতেই ওর ওই কোঁকড়া-কোঁকড়া চুলগুলো কাটতে দেবে না। শেষে ওর মা ওর হাতে আস্ত একটা টাকা গুঁজে দিয়ে বললেন—"লক্ষ্মী মা আমার, এত কষ্ট পাচ্ছ, চুলটা কেটেই দি।"

—"না, আমি দেব না।"

বৌদি আরও একটা টাকা দিলেন।

সেটাও বালিশের তলায় রেখে খুকুরাণী বলল—"না—।"

আরও একটা টাকা আমি দিলাম। খুকুরাণী তবু অটল। শেষ পর্য্যন্ত পুরো পাঁচটি টাকা হাতে ক'রে খুকুরাণী মাথা পাতল।

হ্যাঁ, এমনি ক'রে অসুখ ত সারল। কিন্তু কয়েক দিন পরেই আর এক নতুন বিপদের আভাষ পাওয়া গেল। সেই যে ওর মাথাটা নেড়া করা হয়েছিল, তার পরে আর একটি চুলও গজায় নি। বরং যত দিন যায়, মাথাটা ততই পালিশ হ'য়ে ওঠে।

বাস্তবিকই আমরা লক্ষ্য করলাম, খুকুরাণীর নেড়া-মাথা চেহারাটা দিন দিনই অপরূপ হচ্ছে। কিন্তু মেজাজটা তার ক্রমশঃই উগ্র হ'য়ে উঠছিল, অর্থাৎ নেড়া-মাথা বৈষ্ণবদের মত মোটেই নয়। অবশ্য যথেষ্ট কারণও যে ঘটত না তা নয়।

স্কুলে সে একটু অন্যমনস্ক হ'লেই মেয়েরা ওর মাথায় চড়-চাপড় মেরে আনন্দ

করে। রাস্তায় আসবার পথে তাকে দেখলেই ছোট ছোট ছেলেরা—"তেলালো গোলালো টাকে লেগেছে ঝাঁঝালো রোদের হাওয়া—" গান জুড়ে দেয়। রক্ত-মাংসের শরীরে এ কার সহ্য হয় বল?

তবে একথা জোর ক'রে বলতে পারি যে, চিকিৎসার কোন ত্রুটি হচ্ছিল না। দিশী বিলিতী যতরকম তেল আছে, জবাকুসুম, কুন্তলীন থেকে আরম্ভ ক'রে বাথগেট, হেয়ারলীন পর্য্যন্ত সবই পর পর ব্যবহার করা গেল। ক্রমে বাড়ীটা তেলের শিশির মিউজিয়াম হ'য়ে দাঁড়াল; কিন্তু ওর তৈল-সিক্ত মাথাটা আরও চক্‌চকে দেখান ছাড়া আর কোন উপকার পাওয়া গেল না।

"লক্ষ্মী মা, এত কষ্ট পাচ্ছ, চুলটা কেটেই দি"

আমার মা অর্থাৎ খুকুরাণীর ঠাকু'মা ত কেঁদেই অস্থির। আমারও কি কম চিন্তা? মেয়েটি আজীবন নেড়া হ'য়ে থাকার সম্ভাবনাটা আশাপ্রদ মনে হওয়ার কথা নয়।

শেষে একটা বুদ্ধি জোগাল। যে কোব্‌রেজ মশায়ের পরামর্শে মাথাটা কামানো হয়েছিল তাঁরই শরণাপন্ন হওয়া ঠিক করলাম। খুকুকে নিয়ে গেলাম সঙ্গে। উঃ, কী ভীড়! ঠায় দু'ঘণ্টা ব'সে থাকবার পর ডাক এল। ষোলটি টাকা কোব্‌রেজের টেবিলের ওপর রেখে আবেদন জানালাম।

তিনি ওর মাথার দিকে সামান্য একটু তাকিয়ে জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে—যেন আনমনে জবাব দিলেন—"হাতীর দাঁতের গুঁড়ো ব্যবহার করুন।"

কি ক'রে জিনিসটা ব্যবহার করতে হয় জিজ্ঞেস ক'রে নিতে যাব—দেখি, আমার মত আর একজন ভদ্রলোক পাশের ঘর থেকে ঢুকে প'ড়ে গুণে গুণে টেবিলের ওপর টাকা রাখতে সুরু করেছেন। বুঝলাম আমার পালা শেষ। কি জানি এখন আর কিছু জিজ্ঞেস করতে গেলে যদি আবার ষোলটি টাকা দিতে হয়, তাই ভয়ে ভয়ে চ'লে এলাম।

এখন হাতীর দাঁতের গুঁড়ো আবার কোথায় পাই!—খোঁজ, খোঁজ। শেষে শ্যামবাজারের এক অখ্যাত গলির মধ্যে সন্ধান মিলল। কথায় বলে, মরা হাতীর দাম লাখ টাকা। চার আনা ক'রে তার ভরি। আন্দাজে আন্দাজে চার ভরি ত কিনলাম; কিন্তু ব্যবহার করতে হয় কি ক'রে, সেটা আবার কার কাছে জানি?

সামান্য একটু তাকিয়ে… …

দোকানীকে জিজ্ঞেস করলাম, সে মাথা নাড়ল।

—"এই গুড়ো বিক্রী করছ কদ্দিন?"

—"চার বছর।"

সত্যি কথা বলতে কি, চার বছর ধ'রে শুধু একটা জিনিসই বিক্রী করছে; অথচ তা দিয়ে কি হয় সে মোটেই খবর রাখে না! এরকম একটা কিছু যে পৃথিবীতে ঘটতে পারে আমার ধারণার সম্পূর্ণ অতীত ছিল।

সে আরও বলল—"বাবু, দোকানদারী আমার পছন্দই নয়, বা'জান রোজ রোজ জোর ক'রে পাঠিয়ে দেয়। চৌদ্দ পয়সা ক'রে কিনি। চার আনা বিক্রী, ব্যাস্ আর খোঁজে দরকার কি?"

ফিরতে যাচ্ছি এমন সময় একজন ভদ্রলোক হুড়মুড় ক'রে ঢুকে প'ড়েই একেবারে পাঁচ সের হাতীর দাঁতের গুঁড়োর অর্ডার দিয়ে ফেললেন। উৎফুল্ল চিত্তে লক্ষ্য করলাম, ভদ্রলোকের মাথায় বিরাট একটি টাক। ভাবলাম, জিজ্ঞেস যদি কাউকে করতে হয় ত এঁকেই! এই ভেবে স-সঙ্কোচে বললাম—"আজ্ঞে, বলতে পারেন হাতীর দাঁতের গুঁড়ো ব্যবহার করতে হয় কেমন ক'রে?"

—"কেন, ঢেলে দেবেন!"

ভাবলাম, খুকুরাণীর মাথাটা যে কি রকম চক্‌চকে আর পালিশ ইনি তা আন্দাজ করতে পাচ্ছেন না; বললাম—"ঢেলে দিলে থাকবে কেন?"

—"তা হ'লে গর্ত্ত ক'রে দেবেন !"

গর্ত্ত ক'রে দেবেন ! ভদ্রলোক বলে কি ! বিস্মিত হ'য়ে বললাম—"সে কি মশায়, গর্ত্ত ক'রে দিলে ব্যথা লাগবে না ?"

"ব্যথা লাগবে !"—এবার সেই ভদ্রলোকটির অবাক্ হবার পালা।

—"আপনি কিসে দেবার কথা বলছেন ?"

—"আজ্ঞে মাথায়, আর কিসে !"—তারপর আনুপূর্ব্বিক খুলে বললাম।

—"তা আপনার আগে বলা উচিত ছিল। দেখুন, আমি রায়-সিংহীদের বাড়ীর বাজার-সরকার। প্রতি দু'মাস অন্তর পাঁচ সের ক'রে গুঁড়ো কিনে নিয়ে যাই গোলাপ-গাছের গোড়ায় দেবার জন্য। তা'তে গোলাপ খুব ভাল হয়। ভাবলাম আপনি বুঝি তাই বলছেন। এটা যে আবার চুলেরও ওষুধ তা এই প্রথম শুনলাম।"

মনে মনে বললাম—অর্থাৎ আবার যোলটি টাকার ধাক্কা ! কারণ যোলটি টাকার বিনিময়ে কোব্‌রেজ মশায়ের যে দুটি কথা শুনেছিলাম, তা হয়ত অপর কাউকে লক্ষ্য ক'রেই বলা হয়েছিল। খুকুরাণীর ওষুধের কথা হয়তো তিনি বলেন নি।

কিপ্‌টে এককড়ি

বন্দে আলী মিয়া

এককড়ি মণ্ডল ছিল নাকি পাবনায়,
তার মতো কিপ্পন বাংলাতে মেলা দায়।
গিন্নি ও পুত্র সব মিলে তিনজন—
ইহাদের তরে ভেবে ক্ষীণ তার দেহ-মন।
বাগানের তরকারী, খামারের ধান আর—
এই খেয়ে কোনো মতে কেটে যায় দিন তার ;
একদিন কারো বাড়ী খেয়ে এলে বাকি মাস
ঢেকুর নিত্য ওঠে—দেয় তাই উপবাস।

সংসারে মাছ কভু আসে অতি কদাচিত্ ;
বুঝায় বৌরে তার, "আখেরেতে হবে হিত,
এইরূপ ক'রে যদি টাকা কিছু করা যায়,
জমিদার হবো মোরা—করিব যা মন চায়।

হোক্ না কষ্ট আজ, কাল হবো বড়লোক,
অভাবের তরে আজ করিব না বৃথা শোক।"

লিখে প'ড়ে হবে কী যে এককড়ি ভাবে তাই,
খোকাকে পড়ায় ঘরে—পাঠশালে রাখে নাই।
একবার দিয়েছিল, জীবনেতে এই ভুল,
মাহিয়ানা লাগে ব'লে ছাড়ায়েছে ইস্কুল !

এককড়ি প'রে থাকে গামছা সে চার হাত,
বৌ পরে আটগজী ধুতি এক দিন-রাত।
জামা বটে আছে তার জোড়াতালি সারা গায়,
হাত খাটো—ঝুল ছোট—কষ্টে সে পরা যায়।
দুই জোড়া চটি আছে বাপ-বেটা দু'জনার,
পূজা ও পরবে তাহা ঘর হ'তে হয় বা'র।
তার পর ধুয়ে মুছে জড়াইয়া ন্যাকড়ায়,
তাকের একটি কোণে সাবধানে রাখে তায়।

একবার বলি শোনো—তাহাদের জমিদার
ভোজ লাগি ডেকেছিল যত প্রজা ছিল তার

হুঁসিয়ার এককড়ি ভাবে মনে এত পথ
চটি প'রে হাঁটিলে সে ছিঁড়ে যাবে আলবৎ।
তার চেয়ে লুকাইয়া সাথে যদি নেয়া যায়,
কাছাকাছি গিয়ে সেথা বের ক'রে দেবে পায়।

এত ভাবি মনে মনে এককড়ি ছাড়ে হাঁফ—
বগলেতে চটি নিয়া তা'রা দুয়ে ছেলে-বাপ

পথ চলে খালি পায়ে চাদরেতে ঢাকি দেহ,
জুতা আছে লুকানো সে দেখিতে না পায় কেহ।

কাছাকাছি গিয়ে হোথা বের করি চটি তার
বাপ-বেটা পায়ে দিয়া পথ হাঁটে আরবার।
ইহা দেখি হাসে যত পথচারী লোকজন ;
বলে সবে, 'এককড়ি বটে খুব কিপ্পন।'

জমিদার-বাড়ী এসে খেতে বসে দু'জনায়,
দিস্তা দশেক লুচি এক এক জনে খায় ;
তার সনে উঠে' গেল পাঁচ সের সন্দেশ,
চার হাঁড়ি দই আর পায়সেতে হলো শেষ।
পেট যেন জয়ঢাক বাপ-বেটা দু'জনার,
আসন হইতে তা'রা উঠিতে না পারে আর

খাটিয়া আনিয়া দিল রামসিং দারোয়ান,
তার 'পরে শোয়াইয়া সবে মিলে মারে টান।
টেনে টেনে নিয়ে এলো ইহাদের দরজায়,
সেইখানে রেখে দিয়ে সবে তা'রা ফিরে যায়।
এককড়ি-গৃহিণী সে ডেকে হেঁকে লোকজন,
ঘরে এনে ক'রে দিল শয়নের আয়োজন।
ছেলে তার ভালো হলো শুয়ে থেকে দিন সাত,
কিন্তু গো এককড়ি হলো বুঝি কুপোকাৎ!

দিন কুড়ি জ্ঞানহারা প'ড়ে র'লো বিছানায়,
একদিন বলে নিজে আপনার মনে তায়,
"পাঁচ-সাত গণ্ডা গো দাও আর সন্দেশ—
এক সের রাব্‌ড়িতে ফলারের হোক্ শেষ।"
গৃহিণী বলেন তারে, "ভোজবাড়ী এটা নয়,
ভাঁড়ারেতে নাই কিছু মনে কিগো নাহি রয়?
সাতদিন একবেলা খেয়ে কাটে দিন মোর,
সন্দেশ ও রাব্‌ড়ি তাই আজ চাই ওঁর।"

চোখ চেয়ে এককড়ি বলে, "একি মুশ্‌কিল,
বাড়ী এটা তাই এত হইতেছে গর্‌মিল।
সন্দেশ ও লুচি বিনা বাঁচিব না প্রাণে আর,
ভোজবাড়ী কবে হবে—খাবো সব মজাদার।"

এত বলি পুনরায় এককড়ি অজ্ঞান !
গৃহিণী ডাকিয়া বলে, "খোকা, ওরে জল আন।"

খোকা বলে, "মাগো ওঁর বাসি মুখে শুধু্‌ জল
এতদিন পরে আমি কেমনেতে দিই বল !
তার চেয়ে চিনি এনে ধারে আধ পয়সার
সরবৎ ক'রে দিলে বেহুঁস রবে না আর।"

এত বলি চিনি এনে সরবৎ করি' তায়,
পিতার মুখেতে দিল—ইহাতেই হলো দায়।
এককড়ি বলে, "একি, মিঠে কেন লাগে জল ?"
বউ বলে, "সংসার এতো কি্গো স্বচ্ছল—
জল ছাড়া তোমাকে গো দিতে পারি কিবা আর !!
তবে বুঝি খোকা এনে চিনি আধ পয়সার
তাড়াতাড়ি জল দিয়ে ক'রে দেছে সরবৎ।"
এককড়ি রেগে বলে, "আমি ম'লে আলবৎ
মায়ে-বেটা দুই জনে হবে ঠিক ভিক্ষুক—
বাজে এত খরচের বুঝবে গো কি সুখ !
একটি আধ্‌লা হয় কত দুখে রোজগার,
নষ্ট করলে কেন—মূল্য কি নাই তার ?
এর চেয়ে মোরে কেন মার্‌লে না খঞ্জর—
লাঠি মেরে ভাঙ্‌লে না বক্ষের পঞ্জর ?
চিনি আধ পয়সার—বাজে ব্যয় হায় হায় !
চি-নি চি-নি চি-চি—" ব'লে প'ড়ে গেল বিছানায় !!

লবণ-কাহিনী

শ্রীজয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

ইংলণ্ডে যাঁরা বিশপ, জজ অথবা এ্যাম্‌বেসেডর, পার্টিতে আহারের টেবিলে তাঁদের বিশেষ সীট্ দেওয়ার রীতি। কিন্তু সকলেই ত ওই রকম উচ্চপদ অলঙ্কৃত করবার মত সৌভাগ্য নিয়ে পৃথিবীতে জন্মায় না—বরং বেশীর ভাগ লোককে অতি সাধারণভাবে বাস করতে ও মরতে হয়। কিন্তু তা' হ'লেই তাদের বসতে হবে **below the salt**—অর্থাৎ টেবিলের শেষপ্রান্তে, বড় বড় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের থেকে অনেক দূরে! বস্তুতঃ এক সময় লবণই সাধারণ ও অসাধারণের মধ্যে সীমা-রেখা নির্দ্দেশ করত।

শুধু তোমাদের কেন, পৃথিবীর সর্ব্বত্র কোটি কোটি লোকের খাওয়ার সময় খানিকটা সাদা গুঁড়ো অর্থাৎ লবণ না হ'লে চলে না। প্রতিদিন কোটি কোটি রাঁধুনী ঝোলে, ঝালে, অম্বলে, তরকারীতে নুণ দিচ্ছে। কিন্তু এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না—ঘামানো দরকারও বোধ করে না। জল-বাতাসের মতই এ যেন সবাইকার জীবনের সঙ্গে মিশে গেছে। তবুও জেনে রেখো ভারি অদ্ভুত জিনিস এই লবণ।

পাথর কয়লা, গ্রেনাইট প্রভৃতির মত লবণও এক প্রকার খনিজ পদার্থ। বৃষ্টির জল মাটির সঙ্গে প্রতি মুহূর্ত্তে পাহাড় থেকে ধুয়ে নিয়ে আসছে এই লবণ; এমন কি আমাদের ব্যবহারের জন্য এক একটি লবণের পাহাড়ই তৈরী রয়েছে! এসব কথা ভাবতে কি আশ্চর্য্য লাগে না? লবণ সর্ব্বত্রই মেলে। বাতাসে লবণ ভাসছে—নদীর জলে রয়েছে লবণ আর সমুদ্রের জল ত লবণাক্ত ব'লে মুখেই দেওয়া যায় না! আমাদের রক্তে, চোখের জলে লবণ বিদ্যমান—এমন কি প্রাণীর ঘর্ম্মেও লবণ রয়েছে। বৃষ্টির জলেও লবণের পরিমাণ কম নয়। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ গণনা ক'রে বলেছেন, বৃষ্টির জল প্রত্যেক বর্গ মাইল স্থানে প্রায় পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড লবণ জমায়েৎ করছে।

সমুদ্রে লবণের পরিমাণ অপরিমেয়। যদি সমস্ত সমুদ্র শুকিয়ে যায় তা' হ'লে সেই লবণ দিয়ে এক মাইল লম্বা ও এক মাইল প্রশস্ত এই রকম চার লক্ষেরও বেশী ইট তৈরী করা যাবে! সেই লবণ দিয়ে এমন একটা স্তম্ভ তৈরী করা যাবে—যেটাকে দাঁড়

করিয়ে দিলে এখান থেকে চাঁদে গিয়ে ঠেকবে। অথবা ইউরোপের যত পাহাড় আছে সব একত্রিত করলে যত বড় হবে তার চেয়েও ঢের বড় পাহাড় তৈরী করা যাবে তা' দিয়ে।

নদী ও ঝরণা পাহাড়-পর্ব্বতের মাটি থেকে লবণ ধুয়ে নিয়ে সমুদ্রে জড় করছে। একাজ করতে কত বছর লাগা সম্ভব বল ত? ভূতত্ত্ববিদ্‌দের মতে বহু লক্ষ লক্ষ বছর কেটে গেছে—তবে সমুদ্র এত লবণাক্ত হয়েছে।

আমরা যে লবণ খাই তার প্রধান ভাগই আসে সমুদ্রের জল থেকে। সমুদ্রের জল জ্বাল দিয়ে এই লবণ তৈরী করা হয়। অথবা সমুদ্র হ'তে দূরে দীঘি কেটে রাখা হয়, জোয়ারের সময় সমুদ্রের জল এসে সেই দীঘি ভ'রে রেখে যায়। জল শুকিয়ে গেলে তলায় লবণ প'ড়ে থাকে। পরে সেই লবণ পরিশুদ্ধ ক'রে ব্যবহার করা হয়। পাহাড় থেকেও কিছু লবণ আসে। কিন্তু ইউরোপে বেশীর ভাগ লবণই আসে লবণের খনি থেকে। এখুনি হয়ত তোমরা প্রশ্ন ক'রে বসবে যে, নদীই যদি পাহাড় আর মাটির লবণ ধুয়ে নিয়ে গিয়ে থাকে, তা' হ'লে খনিতে লবণ আসে কোথা থেকে? আসল ব্যাপার হচ্ছে—লবণের খনি যাকে বলা হয়, সে আর কিছুই নয়, বড় বড় লবণের হ্রদ বা সমুদ্র যার জল কালক্রমে শুকিয়ে গেছে।

লক্ষ লক্ষ বছর আগে—পৃথিবীর দ্বিতীয় যুগে স্থলভাগে যে সমস্ত হ্রদ বা সাগর ছিল, তাদেরই লবণ এখন খনিতে পাওয়া যায়। সেই যুগে মানুষেরা পৃথিবীতে আসে নি, তখন পৃথিবীর বাসিন্দা ছিল বড় বড় সরীসৃপ আর কিম্ভূতকিমাকার জীবজন্তু! এখন বুঝতেই পারছ তা'রা হ্রদে, জলাশয়ে ও স্থলভাগে কিরকম সুখে ঘর-সংসার করত!

এখন এটা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক—যে সমস্ত জলাশয় শুকিয়ে এইভাবে লবণ-ভূমিতে পরিণত হয়েছে, তাদের মাছ, কুমীর প্রভৃতি প্রাণীরা কোথায় গেল? লবণ-ভূমিতে তাদের অসংখ্য মৃতদেহ নিশ্চয়ই দেখা যাবে। কিন্তু ব্যাপার দাঁড়িয়েছে তার উল্টো; অর্থাৎ খুব কম সংখ্যক মাছ, শেল বা প্রবালের নিদর্শন পাওয়া গেছে সেই সব লবণ-ভূমিতে। খুব সম্ভবতঃ জল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বাষ্প হ'য়ে উড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লবণের পরিমাণও যখন দিন দিন বাড়তে সুরু করেছিল, তখন জলচর প্রাণীরা আসন্ন বিপদের ভয়ে চ'লে গেছে অন্য জলাশয়ে—যেখানে লবণের পরিমাণ ছিল অপেক্ষাকৃত কম।

এক-একটা লবণ-হ্রদ বেশ গভীর হয়। গ্যালিসিয়ার অনেক খনির গভীরতা ৪৬০০ ফুটের চেয়েও বেশী। পোলাণ্ডের ক্রাকাউএর নিকটবর্ত্তী উইলিক্‌জ্‌কাও

(Wieliczkao) খনি পৃথিবীর একটি অভিনব বিস্ময়! প্রায় সাত-আট শ' বছর ধ'রে ওই খনিতে খননকার্য্য চলেছে। খনিটিকে কেটে একটা ভূগর্ভস্থ নগরে পরিণত করা হয়েছে। নগরটি পূর্ব্বপশ্চিমে আড়াই মাইল এবং উত্তর-দক্ষিণে অর্দ্ধ মাইলেরও বেশী লম্বা; তা' ছাড়া তা'তে যে সমস্ত টানেল আছে তাদের একত্র করলে প্রায় পঁয়ষট্টি মাইল হবে। জায়গায় জায়গায় টানেলের পরিধি প্রায় হাজার ফুট! একবার কল্পনা ক'রে দেখ দেখি কি পরিমাণ লবণ তোলা হয়েছে ওই লবণ-ভূমি থেকে!

কয়েক বছর আগে একজন পর্য্যটক সেই খনি পরিদর্শন ক'রে লিখেছেন—"এই নগরে কত আঁকা-বাঁকা পথ, সুদৃশ্য স্তম্ভ, গীর্জ্জা, মূর্ত্তি, রেলওয়ে ষ্টেশন, স্মৃতি-সৌধ—হরেক রকমের বিস্ময় স্তরে স্তরে সাজান রয়েছে! এই লবণ-নগরে অবতরণ করবার জন্য কত লিফ্‌টের সিঁড়ি রয়েছে—কত ঘোড়ায় টানা রেলগাড়ী সেই স্ফটিক-স্বচ্ছ রাস্তা দিয়ে নিয়ত যাওয়া-আসা করে। কেন্দ্রস্থলে একটা বড় ষ্টেশন আছে—তার প্রকাণ্ড প্ল্যাটফর্ম্ম, বড় বড় বিশ্রামাগার, আরও কত কি!

লবণের তৈরী গীর্জার মধ্যে সেণ্ট্‌ এ্যান্থনি নামক ক্যাথিড্রাল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। সপ্তদশ শতাব্দীতে লবণের খনি কেটে তৈরী করা হয়েছে সেটি। লবণের তৈরী উচ্চ বেদী—বেদীর ওপর সেণ্ট্‌ পীটার ও সেণ্ট্‌ পলের মূর্ত্তি স্থাপিত এবং বেদীর চারধারে বাঁকান সারি সারি কারুকার্য্যখচিত স্তম্ভ ও উভয় পার্শ্বে সেণ্ট ষ্টানি স্লেযাস ও সেণ্ট্‌ ক্লিমেণ্টের মূর্ত্তি দণ্ডায়মান।

লবণ-নগরের আর একটি বিস্ময়কর বস্তু হচ্ছে সুবৃহৎ নাচঘর—৩০০ ফুট লম্বা এবং ১৯০ ফুট উঁচু। নাচঘরের চারধার সুবৃহৎ দীপাধার দ্বারা শোভিত। দীপাধারগুলো আর কিছুই নয়—বড় বড় লবণের ক্রিষ্টাল। কক্ষের শেষ সীমায় একটি সিংহাসন আছে, সিংহাসনে নেপচুন প্রভৃতির সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি স্থাপিত রয়েছে। এই লবণের তৈরী নাচঘরে নাচ হয়—প্রায় সহস্রাধিক খনির শ্রমিক তাদের স্ত্রী, পুত্র, পরিবার নিয়ে বাঁশী, ফ্লুট, বেহালা সংযোগে নৃত্যগীত উৎসব করে সেখানে।

খনির অভ্যন্তরে লবণাক্ত হ্রদ ও নদী আছে, সেখানে মৎস্যকুল সাঁতার কেটে খেলা করে। তা'রা কিন্তু কিছুই দেখতে পায় না। একটা হ্রদ ১৯৫ ফুট লম্বা এবং প্রস্থেও প্রায় ১০০ ফুট হবে। হ্রদে আবার বহু প্রমোদ-তরী সব সময় ভাসমান থাকে। চার হাজার লোক এই লবণ-নগরে প্রত্যহ কাজ করে।"

এই রকম সুবৃহৎ লবণ-খনির বিবরণ থেকে সহজেই বোঝা যায়, কি পরিমাণ *লবণ খনি থেকে তোলা হয় এবং কি পরিমাণ লবণ প্রত্যহ পৃথিবীতে ব্যবহৃত হ'য়ে* থাকে। এটাও সৌভাগ্যের কথা যে, পৃথিবীতে এত লবণ আছে! কারণ লবণ যে কেবলমাত্র আমাদের আহার্য্য বস্তু স্বাদযুক্ত করে তা নয়—লবণের অভাবে আমরা শীঘ্রই পীড়িত হ'য়ে পড়ি এবং শেষে মৃত্যু পর্য্যন্ত হ'তে পারে।

পুরাকালে হল্যাণ্ডে অপরাধীকে লবণ খেতে না দেওয়া একটা প্রধান শাস্তি ছিল—ফলে বন্দী শীঘ্রই অসুস্থ হ'য়ে পড়ত। সুইডেনে নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্তও অপরাধীকে প্রাণদণ্ড থেকে রেহাই দেওয়া হ'ত—যদি সে চার সপ্তাহ নুণ না খেয়ে থাকতে পারত। কিন্তু প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, লবণের অভাবে অপরাধী মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, তা'তে খাদ্যাভাবে লোকজন যেমন মরেছে, তেমনি লবণাভাবেও কম লোক প্রাণ হারায় নি। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা যখন 'মেট্জে'তে বন্দী হয়েছিল তখন তাদের সর্ব্বপ্রধান কাজ ছিল—কি ক'রে কৃত্রিম উপায়ে লবণ তৈরী করা যায়। বন্য প্রাণীদের স্বাভাবিক বৃত্তি হচ্ছে লবণাক্ত মাটির খোঁজ করা; লবণাক্ত মাটির খোঁজে অনেক সময় তা'রা দূরতর প্রদেশেও গমন করে।

আমরা যত খুশী লবণ পেতে পারি ব'লে লবণের মর্য্যাদা বুঝি না। কিন্তু যেখানে লবণ দুষ্প্রাপ্য সেখানে লবণ সোনার মতই দুর্ম্মূল্য। আফ্রিকাতে এমন অনেক জায়গা আছে, যেখানে দু'একজন দাসের বিনিময়ে এক মুষ্টি লবণ পাওয়া যায়। মার্কো পোলোর সময় তিব্বতে লবণ মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হ'ত। ইংলণ্ডে একসময় লবণের কিরকম দাম ছিল, Salary কথাটা থেকেই তা' স্পষ্ট বোঝা যায়। Salary কথাটা এসেছে Sal নামক লাটিন শব্দ থেকে—তার অর্থ লবণ।

সেকালে ব্যবসার একটা প্রধান অঙ্গ ছিল লবণ; শুধু লবণ বহন ক'রে নিয়ে যাওয়ার জন্যই রাস্তা তৈরী হ'ত। রোমের একটা বড় রাস্তার নাম হচ্ছে Via Salaria অর্থাৎ লবণ-পথ—কারণ এক সময় সেই পথ দিয়েই লবণ বহন ক'রে নগরে নিয়ে আসা হ'ত। সাহারায় অনেক পথ, পূর্ব্বে এবং এখনও শুধু লবণ বহন করবার জন্যই ব্যবহৃত হয়। ফিনিশীয় বণিকদের লবণের ব্যবসা একটা প্রধান ব্যবসা ছিল। এইভাবে বলতে পারা যায়—লবণ পৃথিবীর সভ্যতা বিস্তারেও যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

আমাদের দেহের অনেক পরিমাণ রক্ত অপচয় হ'লে শিরাতে লবণজল দিয়ে দিলে সেই ক্ষয় অনেকাংশে পূর্ণ হয়। সেজন্যই কলেরা-রোগীকে লবণজল ইন্‌জেকসান্‌ দেওয়া হয়। আমরা এখনও জীবদেহে লবণের সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়া-কলাপের কথা জানি না। *কিন্তু এটা জানি যে, লবণ হজম করবার প্রধান সহায়ক। আহারের পর পাকস্থলীতে যে হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড আসে তার উৎপত্তির মূলে রয়েছে লবণ।* এই এ্যাসিড ছাড়া খাদ্যবস্তু হজম করা যায় না। আগেকার লোকেরা লবণের এসব উপকারিতার কথা জানত না, কিন্তু লবণকে তা'রা বরাবর বিশ্বাস ও বন্ধুত্বের প্রতীক ব'লে মান্য ক'রে এসেছে।

আজ পর্য্যন্ত আরবদেশবাসীরা লবণকে বন্ধুত্বের নিদর্শন ব'লে মনে করে। একজন আরববাসী যদি কারও নিমক খায়, প্রাণ গেলেও তার অনিষ্ট করে না। আরবদেশের লোকেরা নিমকের কতখানি মর্য্যাদা দেয়, তার একটি কৌতুকাবহ গল্প আছে। একবার এক চোর রাজপ্রাসাদে চুরি করতে যায়। বহু ধন-রত্ন নিয়ে সে পালিয়ে আসছিল, এমন সময় পায়ের তলায় কি যেন ঠেকল। সে ভাবল—নিশ্চয়ই কোন মূল্যবান অলঙ্কার পড়েছে পায়ের তলায়। তাই পরীক্ষা করবার জন্য পা দিয়ে জিনিসটিকে তুলে নিল, কিন্তু অন্ধকারে কিছু বুঝতে না পেরে সেটিকে দিল মুখে। মুখে দিয়েই বুঝল—সেটি লবণ। আর চুরি করা হ'ল না, কারণ নিমক খেয়ে ত নিমক-হারামী করতে পারে না সে! এমন কি লবণ না খেলেও শুধু লবণের সাম্‌নে ব'সে আহার করলেও তা'রা—যার লবণের সাম্‌নে ব'সে আহার করে, তার কোনও অনিষ্ট করে না।

শুধু আরবদেশে কেন, প্রাচ্যের প্রায় সর্ব্বত্রই লবণ বন্ধুত্বের ও রাজভক্তির নিদর্শন। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় ভারতে অনেক সিপাহীকে দমিয়ে রাখা হয়েছিল শুধু এই ব'লে যে—তা'রা লবণ খেয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে।

প্রবন্ধ উপসংহার করবার পূর্ব্বে আরও একটা কথা তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছি। লবণ থেকে যে ব্লীচিং পাউডার তৈরী হয় তা' জানতে কি? হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড তৈরী করতেও লবণ চাই।

বস্তুত লবণ ভারি অদ্ভুত পদার্থ। এক চামচ লবণ কেবলমাত্র রসনার তৃপ্তি বিধান করে না—মস্তিষ্কেরও খোরাক জোগায়।

প্রিয়দর্শীর শেষ দান

শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, এম. এ., বি. টি.

সম্রাট্ অশোকের নাম তোমরা সকলেই শুনিয়াছ। তাঁহার রাজ্যটি ছিল যেমন বৃহৎ, তাঁহার কার্য্যও ছিল তেমনি মহৎ। অশোক ছিলেন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। তাঁহার প্রতি কর্ম্মে প্রকৃত অহিংসার ভাবটি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিত। জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে দেশের জনসাধারণের জন্য তিনি অসংখ্য পান্থশালা, সুপেয় জলের কূপ ও সুশীতল ছায়াবীথি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সামান্য পশুপক্ষীদের জন্যও তাঁহার প্রাণ কাঁদিত। তিনি মানুষের জন্য যেমন দাতব্য চিকিৎসালয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, পশুদের জন্যও তেমনি পিঁজরাপোল স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সব কারণে তাঁহার উপাধি হইয়াছিল "প্রিয়দর্শী"।

বৌদ্ধধর্ম্মের অপর নাম সদ্ধর্ম্ম। এই সদ্ধর্ম্ম-সেবায় অশোকের যত্নের অন্ত ছিল না। তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার প্রচার-কল্পে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এক সময়ে তিনি সমস্ত ঐশ্বর্য্যবিলাস হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নৈষ্ঠিক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর জীবন উদ্‌যাপনে মনস্থ করিলেন—মণিমুক্তা-খচিত রাজপরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া পুণ্য-প্রতীক গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করিলেন। ধনসম্পদ, রাজমুকুট—এমন কি নিজের পরম স্নেহাস্পদ্ পুত্র-কন্যা পর্য্যন্ত তিনি ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিলেন। রাজ্য বিজয় অপেক্ষা ধর্ম্ম বিজয় তাঁহার নিকট অধিকতর প্রিয় কার্য্য বলিয়া গণ্য হইল। এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারের জন্য তিনি চল্লিশ কোটি স্বর্ণ-মুদ্রা ব্যয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

কিন্তু শেষবয়সে, রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মসাধনের উদ্দেশ্যে নির্জ্জন তপশ্চরণকালে তিনি জানিতে পারিলেন, উহার মধ্যে মাত্র নয় কোটি ছয় লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করা হইয়াছে। এই সংবাদে অশোকের ধর্ম্মপ্রবণ মন অশান্ত হইয়া উঠিল। সঙ্কল্প পূরণের জন্য তিনি গয়ার নিকট কুক্কুটারাম নামক বৌদ্ধমঠে রাজকোষ হইতে প্রতিদিন প্রভূত পরিমাণে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন।

প্রিয়দর্শীর পৌত্র কুনালের পুত্র সম্পদি তখন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন। অদূর ভবিষ্যতে সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিকার তাঁহারই হইবে। মন্ত্রীরা রাজকোষের এই নিত্য অপব্যয়ে শঙ্কিত হইয়া সম্পদিকে সতর্ক করিয়া দিলেন—"যদি এইভাবে ধর্ম্মের জন্য

নিত্য দান-কার্য্য চলিতে থাকে তবে অবিলম্বে রাজকোষ শূন্য হইবে এবং রাজ্যের অর্থ-বল কমিয়া গেলে, শত্রুদের কবল হইতে সাম্রাজ্য রক্ষা কঠিন হইবে ; সুতরাং ইহার আশু প্রতিকার আবশ্যক।”

মন্ত্রীদের মন্ত্রণায় সম্পদির মন অস্থির হইল। তিনি কোষাধ্যক্ষকে সম্রাটের অনুরোধে রাজকোষ হইতে পুনরায় অর্থ ব্যয় করিতে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করিলেন।

সেই দিন হইতে সম্রাটের আদেশ অনুযায়ী রাজকোষ হইতে দান প্রেরণ বন্ধ হইল। কিন্তু ইহাতে অশোকের সঙ্কল্প বাধা মানিল না। তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত যাবতীয় জিনিস—একে একে মঠে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে প্রিয়দর্শীর নিজস্ব বাসনপত্র পর্য্যন্ত কুক্কুটারামে স্থান লাভ করিল। নিজস্ব বলিতে যখন আর কিছুই উদ্বৃত্ত রহিল না, তখন অশোক মন্ত্রীদের নিকট সখেদে জিজ্ঞাসা
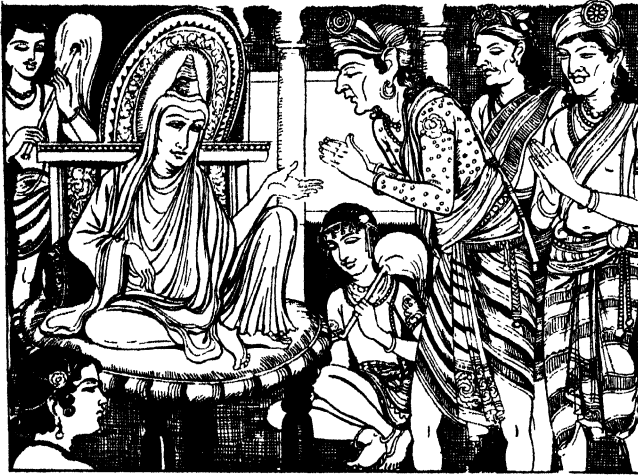
করিলেন—“মন্ত্রিগণ! আপনাদের এরাজ্যের রাজা কে?”

যথারীতি অভিবাদন করিয়া মন্ত্রিগণ একযোগে উত্তর করিলেন—“মহারাজ, এই সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধীশ্বর আপনিই।”

“না, না”—বাধা দিয়া সজল চোখে প্রিয়দর্শী বলিয়া উঠিলেন—“আপনারা আর আমাকে ‘মহারাজ’ সম্বোধনে রীতি রক্ষার জন্য মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন না। সমস্ত রাজশক্তি হইতে আপনারা একযোগে আমাকে বঞ্চিত করিয়াছেন। এই দেখুন—” বলিয়া, হস্তস্থিত অর্দ্ধাবশিষ্ট আমলকী ফলটি দেখাইয়া তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন— “দেখুন, সম্রাট্ অশোকের নিজস্ব বলিতে আজ এই অর্দ্ধামলক মাত্র অবশিষ্ট। আজ ইহাই আমি সদ্ধর্ম্মের সেবায় উৎসর্গ করিতেছি।”

সেই অর্দ্ধামলকখণ্ড মঠের সন্ন্যাসীদের উদ্দেশ্যে পাঠাইয়া, প্রিয়দর্শী নিবেদন করিলেন—"কুক্কুটারামের সেবায় এই আমার শেষ দান। রাজ-ঐশ্বর্য্য, রাজসম্পদ হইতে আজ আমি বঞ্চিত। আজ আমি ভগ্নস্বাস্থ্য শক্তিহীন—আত্মীয়-স্বজনের স্নেহের উপরও আর আমার দাবী নাই—বন্ধুবান্ধবের ভালবাসারও হয়ত আজ আমি অযোগ্য। আজ আপনাদের আশীর্ব্বাদই আমার পরম কাম্য।" ... ...

কিন্তু ইহাতেও মন্ত্রীদের মন টলিল না। সম্রাটের আদেশের মর্য্যাদা রক্ষায় রাজকোষ উন্মুক্ত হইবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা দেখা গেল না। অথচ প্রিয়দর্শী অশোকের দিন দিনই এই ধারণা বদ্ধমূল হইতে লাগিল যে, ধর্ম্মসেবায়ই রাজ-ঐশ্বর্য্যের প্রকৃত সার্থকতা—বিলাসব্যসনে তাহার অপব্যয় মাত্র। ধর্ম্মসেবায় এই বার তিনি এক নূতন উপায়ের সন্ধান পাইলেন। একদিন মন্ত্রী রাধাগুপ্তকে আহ্বান করিয়া অশোক প্রশ্ন করিলেন—"মন্ত্রি! এই বিশাল মগধসাম্রাজ্যের প্রকৃত অধীশ্বর কে?"

"আপনিই মহারাজ! আপনার জীবিতাবস্থায় এই সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইবার অধিকার আর কাহার হইবে?"—রাধাগুপ্ত সবিনয়ে নিবেদন করিলেন।

"যদি তাহাই হয়"—পরম গম্ভীরমুখে বলিতে লাগিলেন সম্রাট্ অশোক—"যদি সত্যিই এই রাজ্যের একচ্ছত্র অধীশ্বর আমিই, তবে আজ হইতে এই সসাগর রাজ্যের সমস্তই আমি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সেবার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিলাম। জলস্রোতের মত চিরচঞ্চল এই পার্থিব ঐশ্বর্য্য—ইহার জন্য আমার বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা নাই। আমি চাই শান্তি—এই দানপুণ্যের ফলে আমি সেই পরম শান্তির প্রয়াসী।" এই বলিয়া অশোক অবিলম্বে এই মর্ম্মে দান-পত্র লিখিয়া দিলেন যে,—তাঁহার বিরাট সাম্রাজ্য বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সেবায় উৎসর্গীকৃত হইল।

অতঃপর সেই দলিলে নিজ স্বাক্ষর ও শীলমোহর মুদ্রিত করিয়া তিনি মঠের অধ্যক্ষের নিকট উপহার স্বরূপ প্রেরণ করিলেন।

... ...

শুনা যায় ইহার পর মন্ত্রিগণ যুবরাজ সম্পদির স্বার্থের জন্য সমগ্র মগধসাম্রাজ্য প্রভূত অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

বোধন-গীতি

শ্রীপূর্ণেন্দুভূষণ দত্তরায়, বিদ্যাবিনোদ

বাদল-ধোয়া ধরারি বুকে
ফুল-পাতারি আল্‌পনা,
তোমারি পায়ের পরশ ল'য়ে
রচিছে সুখ-কল্পনা।
পূরবে অরুণ আধেক দেখা,
নয়নে তাহার আবেশ লেখা,
পূজারি সানাই বাজিছে মধুর
ভরিয়া বিশ্ব-আঙিনা।

ভোরের পাখী পুলকে চায়,
বোধন-গীতি হরষে গায়,
শয়ন ছেড়ে শিশুরা জাগে—
জাগিছে কতই কল্পনা।
তোমারি পূজা জীবন-মাঝে
করিব মোরা সকল কাজে,
কণ্ঠ সদাই গাহে যেন গো
তোমারি পুণ্য-বন্দনা।

আদিম মানবের যন্ত্রপাতি

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বি. এস্-সি., বিদ্যাবিনোদ

তোমার আমার জীবনের অভিজ্ঞতা কতটুকু আর আমরা লোকই বা কত দিনের? আমাদের আগেও পৃথিবীতে লোক ছিল—আমাদের মতই তাহাদের আহার-বিহারের প্রয়োজন ছিল, এবং নানা অবস্থার মধ্য দিয়া তাহাদিগকে চলিতে হইত। বিপদ-আপদ, সুখ-দুঃখ, রোগ-শোক ইত্যাদি সকল অবস্থার সঙ্গে তাহাদেরও পরিচয় ছিল। সেই আদিম যুগে পৃথিবীর বুকে জন্তু-জানোয়ারের অভাব ছিল না; সেই সকল জন্তু-জানোয়ারের আক্রমণ হইতে তখনকার মানুষকে আত্মরক্ষাও করিতে হইত—তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থারও ত্রুটি ছিল না।

তোমরা হয়ত বলিবে, তখনকার মানুষের জীবনযাত্রায় এত বাধা-বিপত্তি ছিল না, এবং বাধা-বিপদ থাকিলেও তাহার প্রতিরোধ তাহারা করিতে পারিত না—যখন-তখন যেমন-তেমন ভাবে তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইত; কিন্তু তাহা নহে। লিখিত কোন বিবরণ আমাদের হাতে নাই বটে, কিন্তু তাহা হইলেও তখনকার কথা জানিবার এবং অবস্থা সম্বন্ধে বুঝিবার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে।

যে সময়ের ইতিহাস আমরা পাইয়া থাকি, তাহার আগেকার অবস্থার জাজ্বল্যমান ইতিহাস আমরা জানিতে পারি—মাটির নীচেকার সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বের চাপা-পড়া জীবজন্তু, জিনিসপত্র ইত্যাদি হইতে। মাটির নীচে নিহিত নানাজাতীয় জীবের অস্থি, মানুষের কঙ্কাল এবং সেই সময়ের ব্যবহারের জিনিসপত্র ও ঐগুলির অবস্থিতি ইত্যাদি দেখিয়া আমরা অনায়াসেই বলিতে পারি যে, যত দিন আগেকার লিখিত ইতিবৃত্ত রহিয়াছে, তাহারও পূর্ব্বে এই পৃথিবী ছিল; তখনও গাছপালা, জন্তু-জানোয়ার, লোকজন, আলো-বাতাস ইত্যাদি লইয়াই পৃথিবীর বুকে এমনি একটা জগৎ ছিল। এই ইতিহাস বস্তুগত এবং মাটির স্তর বিবেচনায় ইহার কাল নির্দ্ধারণ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে মাটির নীচে স্তরে স্তরে অবস্থিত কঙ্কাল, অস্থি ও অন্যান্য দ্রব্যাদির বিন্যাস এবং আকৃতি, গঠন ইত্যাদি হইতে ক্রম-বিবর্ত্তনশীল পৃথিবীর একটা ধারাবাহিক ইতিহাসের সন্ধান আমরা পাইয়া থাকি।

মানুষের জীবনযাত্রার ধারা, তাহার সমাজ, সমাজ-শাসন, ন্যায়-অন্যায়-বিচারবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত দৈনন্দিন জীবন, রীতি-নীতি, পরস্পরের সদ্ভাব-সহানুভূতি ইত্যাদিকে আমরা সভ্যতা নামে অভিহিত করি। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন অবস্থায় লোকের নৈতিক ও সামাজিক জীবনযাত্রার প্রণালী যে বিভিন্ন ছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। জীবনযাত্রার এই বিভিন্ন প্রণালীকে

মানব-সভ্যতার এক একটি স্তর বা যুগ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। সভ্যতার এইরূপ একটি স্তরই 'প্রস্তর যুগ' নামে পরিচিত।

সেই যুগে মানুষ নিজের আত্মরক্ষার জন্য, শিকারের জন্য এবং অন্যান্য নিত্যকার প্রয়োজনে প্রস্তরনির্ম্মিত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিত। পাথরের এই প্রকার বিশেষ ব্যবহার এবং উহাকে ব্যবহারের উপযোগী করিয়া লওয়া মানুষের আবিষ্কারের ইচ্ছা ও চেষ্টার নিদর্শন। তাই ইহাকে মানব-সভ্যতার একটি বিশেষ স্তর বলিয়া বিবেচনা করা হয়। এই প্রস্তর যুগের কথাই আজ তোমাদের বলিব। প্রস্তর হইতে নির্ম্মিত যন্ত্রাদির বৈশিষ্ট্য, উহাদের প্রস্তুত করিবার কায়দা, আকৃতি ও আকৃতি অনুযায়ী ব্যবহারের তারতম্য ইত্যাদির কথাই তোমাদের কিছু বলিতে চেষ্টা করিব। অবশ্য প্রস্তর ইতিহাসের
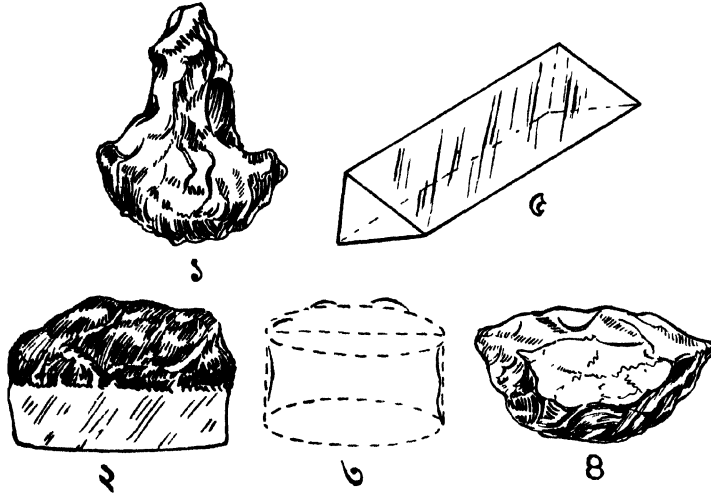
১, ২, ৩, ৪—পাথরের চাঁচিবার যন্ত্র ১। নুড়ি (প্রস্তর—স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্ত)
.২ ও ৪। মানুষের প্রস্তুত যন্ত্র ৩। ড্রইং ৫। ত্রিশির কাচ—পার্শ্ব হইতে

খুব সামান্য কথাই এখন তোমাদের বলা হইবে; কিন্তু কালক্রমে দেখিতে পাইবে যে, ইহা সভ্যতার ইতিহাসের এক বিরাট অধ্যায়।

মানুষের স্বভাব হইল—চোখে যাহা পড়ে, হাতের কাছে যাহা পায় তাহাকেই তাহার প্রয়োজনে লাগাইতে চেষ্টা করা। হঠাৎ তোমার সাম্‌নে একটা সাপ পড়িয়া গেল! সাপের বিন্দুবিসর্গও তোমার মনে ছিল না; কাজেই তোমার সাম্‌নে সাপ পড়িলে কি ব্যবস্থা করিবে সেই সম্বন্ধে প্রস্তুতও ছিলে না। অথচ কোন বিচার-বিবেচনা না করিয়া তোমার হাত দুইখানি স্বতঃই পাশের লাঠিখানি তুলিয়া লয়। আদিকালের মানবও তাহার চলাফেরার পথে

প্রয়োজনমত এমনি লাঠি-কাঠি, গাছের ডালা ইত্যাদি ব্যবহার করিত, আপনার কাজ চালাইয়া লইত। দৈবাৎ একদিন তাহাদের চোখে পড়িল পাথর ও পাথরের নানা আকারের টুকরা বা নুড়ি। অবশ্য পাথর ও নুড়ি তাহার আগে যে চোখে পড়ে নাই এমন নহে; কিন্তু উহা যে তাহার বিশেষ কাজে লাগাইতে পারে, তাহা তাহার মাথায় দৈবক্রমেই ঢুকিয়াছিল—এই সম্বন্ধে কোন চিন্তা না করিয়াই।

মানুষের তৈরী হাত কুঠার
(প্রস্তর)

সে দেখিল নুড়িগুলি বেশ ভারী এবং শক্তও বটে; ছুঁড়িয়া মারিলে তাহাদ্বারা অনায়াসে জখম করা যায়। কিন্তু শীঘ্রই সে বুঝিতে পারিল, স্বাভাবিক নুড়ি যাহা এখানে সেখানে পাওয়া যায় তাহাতে তাহার সকল কাজ চলে না। তাহা ছাড়া বিশেষ কাজের উপযোগী বিশিষ্ট রকমের পাথর বা নুড়ি সচরাচর পাওয়া যায় না। যদিও বা বিশেষ কাজ চালাইবার মত পাথর পাওয়া গেল, তাহার সংখ্যা অতি কম। তোমরা জান প্রয়োজনই মানুষের মনে আবিষ্কারের স্পৃহা ও চেষ্টা বাড়াইয়া দেয়। কিন্তু অভিনব ও সম্পূর্ণ নূতন কিছু আবিষ্কারের মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি তখনও লোকের মাথায় তেমন খেলিত না। কাজেই সে তখন কেবল অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিল। প্রকৃতির খেয়ালে বৃষ্টি-বাতাসের প্রকোপে পাথর কাটিয়া নানা আকারের নুড়ির সৃষ্টি স্বাভাবিক ভাবেই হইয়া থাকে। এই সকল বিভিন্ন আকৃতির যে নুড়িগুলি তাহার কাজে লাগিত, তাহাদের আকৃতির অনুকরণে তখন সে দরকার-মত অস্ত্র প্রস্তুতের চেষ্টা করিতে লাগিল।
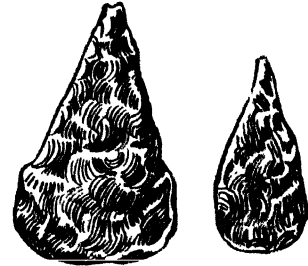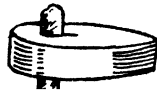
বাঁট লাগান কুঠার
(প্রস্তর)

এই চেষ্টার ফলে একপ্রকার চাঁচিবার যন্ত্র বা কোড়যন্ত্রের আবিষ্কার হয়। প্রথমে পাথরখণ্ডের এক দিক্ কোন শক্ত জিনিস দিয়া ঠুকিয়া ঠুকিয়া ক্রমশঃ পাতলা করিয়া উহা প্রস্তুত হইত; তারপর এই পাতলা মুখ অন্য পাথরে বা কোন শক্ত জিনিসের উপর ঘষিয়া ধারাল করা হইত। জিনিসটা অনেকটা ত্রিশির কাচের মত হইত। ত্রিশির কাচের একটা শির নীচের দিকে রাখিয়া এক পাশ হইতে দেখিলে যেমন দেখা যায় এই কোড়যন্ত্রের গড়ন অনেকটা সেই রকম—উপরটা চ্যাপটা, আর ধারাল দিকটা ক্রমে পাতলা হইয়া আসিয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই কোড়যন্ত্রটি পলতোলা একটি পাথর মাত্র। পলতোলা মুখ খুব

পাতলা করা হইত ; কাজেই যে সকল জন্তু-জানোয়ার শিকার করিয়া আনা হইত তাহাদের দেহ হইতে মাংস ইত্যাদি ছাড়াইবার পক্ষে উহা বেশ কাজে লাগিত। এই যন্ত্রটি যে শিকারের দেহ হইতে চামড়া ছাড়াইয়া লইবার জন্য এবং একমাত্র সেই উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হইত এমন কথা বলা যায় না ; তবে এই ধরণের কাজে যে উহার ব্যবহার প্রচলিত ছিল তাহা উহার আকৃতির বৈশিষ্ট্য দেখিয়া অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে।
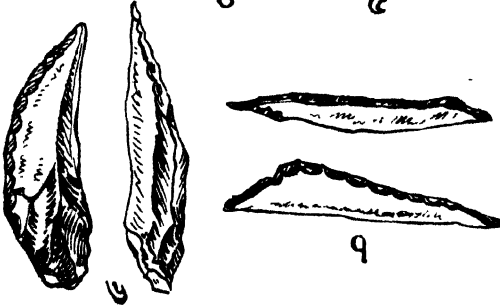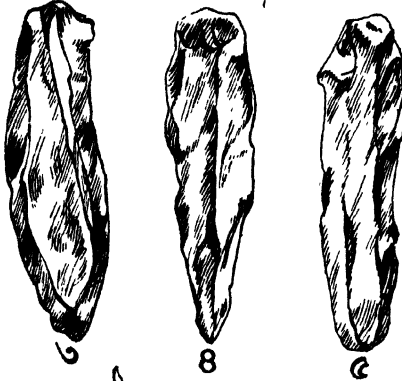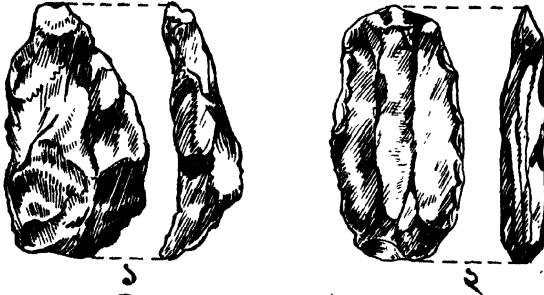
পাথরের ছুরি

১ ও ২। পাথরের আকৃতি অনুসারে ছুরির আকারের যেরূপ তারতম্য হয়। ৩—৭। নানারকমের ছুরি

আগেই বলিয়াছি মানুষ সুখ-সুবিধার জন্য সর্ব্বদাই মাথা ঘামাইতেছে। কোনক্রমে সামান্য সুবিধার সন্ধান যদি একবার সে পাইল তবে ক্রমেই তাহার আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া চলে, ফলে নিত্য নূতন নানা প্রকার জিনিসের আবিষ্কার হইতে থাকে। প্রস্তর যুগের মানব-চরিত্রেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। কোডযন্ত্রটি প্রস্তুত করিতে যাইয়া তাহারা অনেক অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিল। কেমন করিয়া ঠুকিয়া ঠুকিয়া পাথরে পল তোলা যায়, কেমন করিয়া পলের মুখ খুব পাতলা করিয়া বেশ ধারাল হইতে পারে ইত্যাদি নানা বিষয়ে তখন তাহাদের ধারণা জন্মিয়াছে। কাজেই তাহারা নূতন উৎসাহ লইয়া তখন আবার বিভিন্ন প্রয়োজনে নব নব আবিষ্কারে যত্নবান হইয়া উঠিল।

পূর্ব্বে যে চাঁচিবার যন্ত্রটির কথা বলিয়াছি তাহাতে তাহারা নানা অসুবিধা দেখিতে পাইল। মোটা দিকটা ধরিয়া কাজ করিতে অসুবিধা হইত। এই অসুবিধার কথা ভাবিতে গিয়াই তাহাদের মাথায় আসিল যে, ধরিবার ভাল ব্যবস্থা করিতে পারিলে কেবল যে চাঁচিবার সুবিধা হইবে তাহা নহে, দরকারমত কোপাইয়াও ইহা দ্বারা কোন জিনিস কাটা সম্ভব হইতে পারে। আর কি—কল্পনা মাথায় যদি একবার আসিল ত আবিষ্কার করিতে কতক্ষণ! এই চেষ্টা ও যত্নের ফলে এক প্রকার যন্ত্র নির্ম্মিত হইল। ইহাকে সাধারণভাবে হাত-কুঠার বলা যাইতে পারে।

প্রথমে হাতে ধরার অসুবিধা ছিল তাহা এক্ষণে দূরীভূত হইল। কিন্তু বাঁট বা হাতলের ব্যবস্থা হইলে যন্ত্রের দ্বারা আঘাত করিতে সুবিধাও বটে, আর আঘাতে তাহা হইলে জোরও বেশি হইবে। কাজেই সেই হাত-কুঠারের শীঘ্রই উন্নতি সাধিত হইয়া তাহাতে বাঁটের ব্যবস্থা হইল।

এইরূপে প্রস্তর যুগের মানুষ তাহাদের প্রয়োজনীয় যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া লইত। বড় বড় পাথর হইতে আঘাত করিয়া বা অন্য কোন উপায়ে পাতলা পাথরের ফালি সংগ্রহ করিয়া লইত। এই ফালিগুলির পাশের দিক ঘষিয়া বেশ ধারাল করিয়া লইয়া, এখন যে কাজ আমরা ইস্পাতের ছুরিতে সম্পন্ন করি তাহাই করিয়া লইত। কাজেই উহাকে প্রস্তর যুগের ছুরি বলা যাইতে পারে।

১। বাসি বা বাইস (প্রস্তর)
২। করাত (প্রস্তর)

এইসব ছাড়া বর্শা, তীর ইত্যাদিও যে সুদূর অতীতের সেই প্রস্তর যুগে আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত হইত তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐগুলি এখনকার ইস্পাতের জিনিসের মতই কার্য্যকরী ছিল; আকৃতিতেও আধুনিক যুগের লোহার বর্শা ও তীরেরই মত, তবে এত ধারাল এবং টেঁকসই হইত না। গঠন-পারিপাট্যও এত সুন্দর ছিল না; কোন কঠিন জিনিসে জোরে আঘাত লাগিলে ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু জন্তু-জানোয়ার শিকারের পক্ষে উহাই যথেষ্ট ছিল।

কেবল জন্তু-জানোয়ার শিকার ও অন্যান্য সহজসাধ্য কাজই তাহারা প্রস্তরের অস্ত্র দ্বারা সম্পন্ন করিত না। পাথর হইতে করাত ও বাসি বা বাইস প্রস্তুত করিয়া লইয়া তাহারা ছুতার মিস্ত্রির কাজ চালাইত। উহা আমাদের যুগের লৌহ-যন্ত্র হইতে ন্যূন ছিল বলিয়া মনে হয় না।

কাজেই দেখ আধুনিক কালের লৌহ-নির্ম্মিত অস্ত্র-শস্ত্রের পরিকল্পনা সেই প্রস্তর যুগেই মানুষের মাথায় আসিয়াছিল, এখন কেবল তাহার উন্নতি-সাধন করা হইয়াছে এবং অধিকতর স্থায়ী ধাতু সহজভঙ্গুর প্রস্তরের স্থান অধিকার করিয়াছে মাত্র। মানব-সভ্যতার ইতিহাস সকল ক্ষেত্রেই এই প্রকার স্তরে স্তরে গড়িয়া উঠিয়াছে এবং এই রকম ক্রম-বিবর্ত্তনের ফলে ভবিষ্যতেও আবার কত প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিবে কে বলিতে পারে!

চোর-ধরা

মঈনুদ্দীন

তাঁর নাম আর্থার কিং; জাতিতে ইংরাজ। দেশ-বিদেশে বেড়িয়ে বেড়ান তাঁর পেশা। অনেক দেশ ঘুরে ঘুরে তিনি একবার বাগ্দাদে গিয়ে হাজির।

একদিন তিনি শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় এক শেখের সাথে তাঁর দেখা। শেখ ছিলেন মরুভূমির অধিবাসী বেদুঈনদের সর্দ্দার। খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর দু'জনার আলাপ বেশ জমে' উঠ্‌ল। তখন কিং শেখকে দাওয়াৎ ক'রে বস্‌লেন; বল্‌লেন—"বন্ধু! তোমাকে আমার হোটেলে যেতেই হবে। সেখান থেকে খানাপিনা সেরে তারপর তুমি নিজের আস্তানায় ফিরে যেও।"

শেখ রাজী হ'লেন এবং সাহেবের হোটেলে যেয়ে দাওয়াৎ খেলেন।

একজনার বাড়ীতে দাওয়াৎ খেয়ে ফিরে আসার সময় তা'কে দাওয়াৎ করা হচ্ছে মানুষের সামাজিক রীতি। তাই শেখ বল্‌লেন—"আমাকে তো তুমি খুব ক'রে খাওয়ালে। তোমাকেও তো আমার খাওয়ান দরকার। একদিন যাবে তুমি আমার ওখানে?"

মিষ্টার কিং ছিলেন খুব উৎসাহী লোক। তিনি বহু দিন থেকে ভাব্‌ছিলেন, বেদুঈনদের সাথে কিছুদিন বাস কর্‌বেন; আর তাদের হাব-ভাব, চাল-চলন এসব কেমন তা' সংগ্রহ কর্‌বেন। এমন চমৎকার সুযোগ পাওয়ায় তাঁর মন খুশী হ'য়ে উঠ্‌ল। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজী হ'য়ে গেলেন; বল্‌লেন—"হাঁ ভাই, নিশ্চয় আমি যাব। তবে আজ নয়—এ হপ্তা পর। এর মধ্যে আমি এখানকার কাজকর্ম্মগুলো শেষ ক'রে নি, কি বল?"

শেখ বল্‌লেন—"বেশ, তা-ই হবে।"

তারপর শেখ তাঁর তাঁবুর ঠিকনা ওঁকে দিয়ে বিদায় হ'য়ে গেলেন।

এক সপ্তাহ পর, একদিন কিং খুঁজে খুঁজে শেখের তাঁবুতে গিয়ে হাজির হ'লেন। রাস্তায় তাঁকে বেশী বেগ পেতে হয় নি। শেখ জাফর-বিন-রফাহ্‌র নাম তিনি যাকে

বলেছেন সে-ই তাঁকে তাঁর তাঁবুর ঠিকানা ব'লে দিয়েছে। শেখের এলাকার মধ্যে আস্‌তেই তো একজন লোক একেবারে তাঁকে তাঁবুতে পৌছে দিয়ে গেল!—এমনি ছিল শেখের সম্মান আর প্রতিপত্তি!

শেখ তো কিংকে পেয়ে একেবারে বুকে জড়িয়ে ধর্‌লেন। তারপর তাঁর কত আদর, কত আপ্যায়ন! ওদের অতিথি-সৎকার দেখে কিং একেবারে অবাক্ হ'য়ে গেলেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে পাঁচদিন কেটে গেল। এই-বার কিং শেখকে বল্‌লেন—"ভাই, অনেক দিন হ'য়ে গেল, এইবার আমায় বিদায় দাও—আমি চ'লে যাই।"

শেখ বল্‌লেন—"এত তাড়াতাড়ির কি। আরও দু'দিন থাক না। কেন, এখানে কি তোমার কোন অসুবিধা হচ্ছে? আর যে মরুভূমি—খালি বালি আর বালি। তার ওপর আমাদের এই কাপড়ের তাঁবু তোমার কেমন ক'রে ভাল লাগ্‌বে বল!"

কিং বল্‌লেন—"না, না, সে কি কথা! তোমাদের আদর-আপ্যায়নে আমি একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে গেছি। আর চারদিকের এই বালির সমুদ্র, এ আমাকে সব চেয়ে আনন্দ দিচ্ছে। তবে কিনা আমাকে অনেক জায়গায় ঘুর্‌তে হবে। এক জায়গায় তাই বেশী দিন থাকা চলে না।"

শেখ বল্‌লেন—"বেশ, এখন তো সন্ধ্যা হ'য়ে আস্‌ছে, কাল তুমি চ'লে যেও। আজ এখন খেয়ে তাঁবুর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়।"

রাত্রে খেয়ে-দেয়ে কিং তাঁবুর মধ্যে ঘুমিয়ে রইলেন। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই তিনি যাওয়ার উদ্যোগ-আয়োজন কর্‌তে লাগ্‌লেন। একসময় হঠাৎ কোমরে

হাত দিয়েই তাঁর চক্ষু স্থির! একয়দিন সাবধানে তিনি রক্ষা ক'রে এসেছেন, গেল রাতে শোবার সময়ও টিপে টিপে দেখেছেন—ঠিক আছে; কিন্তু এখন দেখ্ছেন তাঁর টাকার থলিটি নেই। তা'তে একশো সতেরটা চক্চকে সোনার মোহর ছিল। কি হ'ল? কে নিল? চিন্তায়-ভাবনায় তাঁর মাথা ঘুরে গেল। তাই তো, এখন কি করা যায়? এ-কথা কি তিনি সর্দ্দারকে জানাবেন? না,—না, সর্দ্দার কি মনে কর্বেন তা' হ'লে? লজ্জায় তাঁর মুখ বন্ধ হ'য়ে গেল। তিনি একেবারে মুশ্ড়ে পড়্লেন।

এর মধ্যে এক সময়ে শেখের সাথে তাঁর দেখা হ'য়ে গেল। কিন্তু তিনি তাঁর সাথে মন খুলে কোন আলাপ কর্তে পার্লেন না। তাঁর এই উদাসীন ভাব দেখে শেখ মনে মনে আশ্চর্য্য বোধ কর্লেন; প্রকাশ্যে বল্লেন—"বন্ধু, কি হয়েছে তোমার? তুমি অমন কর্ছ কেন?"

কিং খানিকক্ষণ মনে মনে কি ভাব্লেন, তারপর সব ঘটনা তাঁকে খুলে ব'লে, পরে জড়িত কণ্ঠে বল্লেন—"আমার যথাসর্ব্বস্ব চোরে নিয়ে গেছে, এখন তো আমার পক্ষে পথ চলাই মুশ্কিল দেখ্ছি।"

তাঁর কথা শুনে শেখ বড় লজ্জিত হ'লেন; কিন্তু একটু পরেই তার চোখের তারা বাঘের চোখের মত জ্বলে' উঠ্ল। তিনি বল্লেন—"কী, এত বড় কথা! আমার তাঁবুতে চুরি! এ নিশ্চয় আমার অনুচরদের কারও কাজ। নইলে বাইরে থেকে কে আর এখানে এসে চুরি কর্তে সাহস কর্বে?"

একে একে তিনি সকল অনুচরকে ডাকালেন। প্রত্যেককে নানাভাবে প্রশ্ন কর্লেন; কিন্তু কোন ফল হ'ল না—সোনার মোহর নিয়েছে ব'লে কেউ স্বীকার কর্ল না। তিনি প্রত্যেকের বিছানাপত্র কাপড়-চোপড় খুলে খুলে তালাস কর্লেন; কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না। শেষে বড় সমস্যায় পড়্লেন।

অতিথিদের সেবার জন্য বেদুঈন আরবেরা যেমন বিখ্যাত, তেমনি তা'রা বড় নৃশংস আর অত্যাচারী। কিন্তু অতিথি-সৎকারে পৃথিবীতে তাদের জুড়ি নেই। আজ তাদের সুনামে কলঙ্ক পড়্ছে। একজন বিদেশী মুসাফিরের কাছে তাদের সকলের এই অপমান!—লজ্জায় ঘৃণায় রাগে শেখ একেবারে অন্ধ হ'য়ে গেলেন।

তিনি তাঁর এলাকার মধ্যে ঘোষণা ক'রে দিলেন—"এই বিদেশী মুসাফিরের যে মোহর চুরি গেছে, সে মোহর অবশ্য দুপুরের আগে আমার কাছে দিয়ে দেওয়া

চাই। নইলে আমি অন্য উপায়ে তা' আদায়ের চেষ্টা কর্‌ব।" কিন্তু দুপুরের আগে কেউ মোহর ফেরৎ দিয়ে গেল না।

বিকেলবেলা শেখ আবার সকলকে জানিয়ে দিলেন—"এ পর্যন্ত কেউ এসে মোহরগুলো দিয়ে যাও নি। বেশ, আজ সন্ধ্যার সময়—মগরিবের নামাজ প'ড়ে আমি আমার জায়-নামাজে ব'সে থাক্‌ব। আমার এলাকার সবাইকে এসে আমার সাথে হাত মিলিয়ে যেতে হবে। আল্লার মেহেরবাণী—চোর এবার নিশ্চয়ই ধরা পড়্‌বে। যে চুরি করে নি, আমার হাতে হাত দেবার সময় তার হাতে কোন দাগই পড়্‌বে না। কিন্তু যে চুরি করেছে, তার হাতে নিশ্চয়ই একটা কালো গোলাকার দাগ পড়্‌বে। এ নিশ্চয়ই হবে—আল্লার হুকুম—পয়সা পরিমাণ একটা দাগ তার হাতের তালুতে নিশ্চয়ই পড়্‌বে।"

ছুঁই-না-ছুঁই ক'রে কোনরূপে হাত মিলিয়ে ... ...

শেখের কথা তাঁর দলের সবাই অত্যন্ত বিশ্বাস কর্‌ত। তাঁর ওপর আল্লার অসীম অনুগ্রহ আছে, একথা মনে মনে সবাই মান্‌তো। তাই এবার যে চোর নিশ্চয়ই ধরা পড়্‌বে, এবিষয়ে কারও মনে কোন সংশয় রইল না। ... ...

এইমাত্র সন্ধ্যা হ'য়ে গেল। আজান দিয়ে মগরিবের নামাজ প'ড়ে শেখ তাঁর জায়-নামাজের ওপর বস্‌লেন। একে একে তাঁর এলাকার সকল লোক এসে তাঁর হাতে হাত মিলিয়ে যেতে লাগ্‌ল। এমনি ক'রে প্রায় পঞ্চাশ-ষাটজন হাত মিলিয়ে গেল। এর পর যে এল, সে শেখের সাম্‌নে হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়াল। তারপর ছুঁই-না-ছুঁই ক'রে কোনরূপে হাত মিলিয়ে সে প্রায় ছুটে চ'লে গেল। তার এই ভাব দেখে শেখ উন্মাদের মত চীৎকার ক'রে বল্‌লেন—"দাঁড়াও।" লোকটি থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়্‌ল।

শেখ ছুটে গিয়ে তার হাত চেপে ধর্লেন। তখন লোকটি ভীষণভাবে কাঁপ্ছে। শেখ ধমক দিয়ে বল্লেন—"কি হে, হাত না মিলিয়েই চ'লে যাচ্ছ যে বড় ?"

লোকটি হঠাৎ শেখের পায়ের ওপর উপুড় হ'য়ে প'ড়ে গেল; আর তার সমস্ত শরীর থর্-থর্ ক'রে কাঁপ্তে লাগ্ল। সে কাঁদ-কাঁদ সুরে বল্লে—"হুজুর! মাফ করুন। আমি আপনার হাতে হাত মিলাতে পার্ব না। আমিই সেই পাপী। আপনার হাতে হাত দিলে নিশ্চয়ই আমার হাতে কালো দাগ পড়্বে।"

মুহূর্ত্তে কথাটি সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়্ল। চোর ধরা পড়েছে—চোর ধরা পড়েছে—সেই চোর দেখার জন্য চারদিকে হাজার লোক জমা হ'য়ে গেল। তারপর তা'কে নানারকমে প্রশ্ন ক'রে মোহরগুলো সে কোথায় রেখেছে তা' শেখ জেনে নিলেন। শেখের তাঁবু থেকে প্রায় একমাইল দূরে একটা ঘন খেজুরগাছের বনের মধ্যে বালির নীচে থলেটি পাওয়া গেল। দেখা গেল, থলে থেকে একটি মোহরও খোয়া যায় নি!

এই লোকটি শেখের অনুচরদের মধ্যে কেউ নয়; তবে তাঁর এলাকার মধ্যে এসে অল্পদিন হ'ল বাস করছে। শেখের আদেশে চোরের ডান হাতটি তক্ষুণি তরোয়াল দিয়ে কেটে ফেলা হ'ল। এমনিভাবে ওরা চোরের শাস্তি দেয়।

রূপকথা

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র

সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে
এক যে রাজার রাজ্য আছে ভাই,
শুন্লে তুমি অবাক্ হ'য়েই যাবে—
তুলনা তার ত্রিজগতে নাই!
মস্তবড় রাজার সে রাজপুরী,
ছুটো ঘোড়ায় সারা বছর ঘুরি'
এধার হ'তে যেতে অপর ধারে
অবশেষে হারালো প্রাণটাই!

ধরণীতে থাকুক যতই ধনী,
এ রাজা ভাই, সবার চেয়ে সেরা।
এমন বৃহৎ রাজধানী আর কার—
চারটে পাশেই সোনার প্রাচীর ঘেরা!
মুক্তো-হীরেয় রাজ্যটা সব ছাওয়া,
একটু মাটি যায় না সেথায় পাওয়া;
জুতো সেথায় পায় পরে না কেহ,
হীরের পথেই করে চলাফেরা!

পবন নাকি নিজেই পাখা নিয়ে
রাত্রি-দিনে সেথায় বাতাস করে!
মোদের মত সেথায় নাকি কেহ
সন্ধ্যাবেলায় দীপ জ্বালে না ঘরে!
নিত্য সেথায় দেয় আলো চাঁদে,
সূয্যিমামা নিজেই অন্ন রাঁধে;
জলের তা'রা ধার ধারে না কেহ—
তেষ্টা মেটায় সুধার সরোবরে!

শোন্ ওরে ভাই, আর এক মজার কথা—
সেই রাজার নাকি তিরিশ হাজার রাণী!
রাজ-রাণীদের সেবার তরে রাজা
তিরিশ কোটি ঝি দিয়েছেন আনি'।
মহারাজা এতই রাণী পেলে—
কিন্তু তাঁহার একটি মাত্র ছেলে;
ছেলের বয়স হ'ল বছর কুড়ি,
পড়্ছে আজো 'হাসি-খুসি'খানি।

প্রাণিজগতে বর্ণ-বৈচিত্র্য ও আত্মরক্ষার উপায়

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাস

আমি যখন তোমাদের মত ছোট শিশু ছিলুম, পশু-পক্ষী, কীটপতঙ্গ প্রভৃতির বর্ণ-বৈচিত্র্য ও আকার-ভেদ দেখে আমার খুব কৌতূহল হ'ত; মনে হ'ত,—এদের এত রকম বর্ণ-বৈচিত্র্যের কারণ কি? এ কি শুধু দৃষ্টির আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য, না এর কোন সার্থকতা আছে? এখন বড় হ'য়ে, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গদের সম্বন্ধে পড়া-শুনো ক'রে বুঝেছি যে, এদের বর্ণ-বৈচিত্র্য শুধু শোভা বর্দ্ধনের জন্য নয়—এর সার্থকতা অনেক। বর্ণ-বৈচিত্র্যই বহু ক্ষেত্রে প্রাণীদের একমাত্র আত্মরক্ষার উপায়। কোথাও এরা বর্ণের অন্তরালে আত্মগোপন ক'রে শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করে, আবার কোথাও এই বর্ণের আচ্ছাদনে লুকিয়ে থেকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর প্রাণীদের প্রাণ-সংহার ক'রে জীবন ধারণ করে।

বনে-জঙ্গলে যে সমস্ত কীট-পতঙ্গ থাকে তাদের অনেকে, সাধারণতঃ সহজে শত্রুর হাত এড়াবার জন্য পরিবেশের বর্ণ ধারণ করে কিংবা পরিবেশের বিশেষ কোন বস্তুর আকার, কিংবা বর্ণ ও আকার দুইই অনুকরণ করে। লতাপাতার মধ্যে যে সমস্ত কীট-পতঙ্গ থাকে তাদের গায়ের রঙ্ হয় সচরাচর সবুজ। অনেক গেছো সাপ ও ব্যাঙ সবুজ রঙের হ'য়ে থাকে। লাউ-ডগা সাপের আকার এবং বর্ণ ঠিক লাউলতার ডগারই মতন। বেত-বনে এক রকম সাপ থাকে, তাদের গায়ের রঙ্ ও আকার ঠিক বেতের মত হয়। তৃণশূন্য মরুভূমিতে যে সমস্ত কীট-পতঙ্গ থাকে, তাদের রঙ্ হয় ধূসর কিংবা পিঙ্গল, সাধারণতঃ বাদামী। মেরু-প্রদেশের ভল্লুক, শশক, শেয়াল প্রভৃতি জন্তু ও নানা জাতের পাখীর বর্ণ হয় সাদা। শীতপ্রধান দেশসমূহে 'লেমিংস' ব'লে একরকম ছোট স্তন্যপায়ী জন্তু থাকে, তাদের শিকারী পাখীরা প্রায়ই ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। তা'রা তাদের গায়ের রঙ্ বদলাতে পারে। যখন শীতে চারদিকে তুষার জমে' যায়—তখন তাদের গায়ের লোম হয় গাঢ় সাদা; আবার গরম

পড়্‌লে তুষার গলে' গিয়ে যখন মাটি বেরিয়ে পড়ে, তখন তা'রা পাঁটকিলে রঙ্‌ ধারণ করে। এমনি ক'রে তা'রা শিকারী পাখীদের হাত হ'তে নিষ্কৃতি পায়। গভীর জলের অনেক মাছের রঙ্‌ হয় কালো কিংবা গাঢ় বেগুনে ; আলোকহীন গভীর জল-গর্ভে তাদের রঙ্‌ মিশে থাকে। শৈবালাচ্ছন্ন অপেক্ষাকৃত অগভীর জলের অনেক মাছ ও গুগ্‌লী, শামুক প্রভৃতির বর্ণ হয় গাঢ় সবুজ। তাদের গাঢ় সবুজ রঙ্‌ শৈবালের গাঢ় সবুজ রঙের সঙ্গে মিশে থাকায় বেশ সহজেই তা'রা শত্রুর দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়ে আত্মরক্ষা কর্‌তে পারে।

নিশাচর পশু-পক্ষীদের রঙ্‌ হয় পিঙ্গল কিংবা গাঢ় ধূসর,—যেমন বাদুড়, শেয়াল, পেঁচা, সজারু প্রভৃতি। বাদামী, ধূসর প্রভৃতি রঙ্‌ রাত্রের অন্ধকারে বা মৃদু আলোকে সহজে চোখে পড়ে না। সমতলভূমিতে যে সমস্ত প্রাণী বিচরণ ক'রে বেড়ায়, তাদের শুষ্ক ঘাসের বাদামী বর্ণ ধারণ কর্‌তে দেখা যায়। দূর থেকে এ রঙ্‌টি সহজে দেখা যায় না ; যত কাছ হ'তে দেখা যায় রঙ্‌টি তত স্পষ্ট হ'তে থাকে। বাদামী রঙ্‌ যত দূর হ'তে দেখ্‌লে একেবারে অদৃশ্য হ'য়ে যায়—কালো কিংবা সাদা রঙ্‌ তত দূরে বেশ স্পষ্টই দেখা যায়।

গভীর অরণ্যের পশুদের গায়ে অনেক সময় ডোরাকাটা থাকে—যেমন ব্যাঘ্র, জেব্রা, টেপির প্রভৃতি। জঙ্গলের মধ্যে বড় বড় ঘাস হয়। সূর্য্যের আলোয় বন-ভূমিতে ঐ ঘাসগুলোর লম্বা লম্বা ছায়া পড়ে—ঘাসের ছায়ার ভ্রম উৎপাদন কর্‌বার জন্য ওদের গায়ে ঐরূপ ডোরা থাকে। গভীর অরণ্যের মধ্যে গাছের পাতা হয় খুব ঘন। গাছের পাতার ছোট ছোট ছিদ্রের মধ্য দিয়ে গোলাকার আলোক পড়ে।
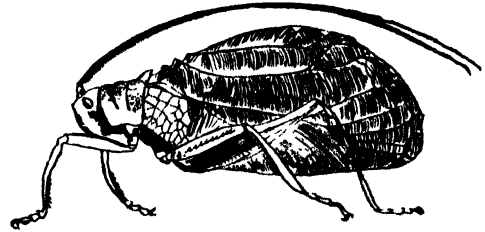
'ক্যাটিডিড্‌'—এই পতঙ্গদের দেহের রঙ্‌ সবুজ পাতার মত। ডানার আকার, বর্ণ ও শিরা-উপশিরায়—এদের দূর হ'তে দেখে গাছের পাতা ব'লে ভ্রম হয়।

চিতা-বাঘ, জিরাফ প্রভৃতি পশুর গায়ে এইরূপ আলো-ছায়ার অনুকরণে গোল গোল চিহ্ন দেখা যায়। ব্যাঘ্র, জেব্রা, জিরাফ প্রভৃতি জন্তু দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটাবার জন্যই এরূপ বর্ণ ধারণ ক'রে থাকে।

পশুপক্ষীর চেয়ে, কীট-পতঙ্গদের মধ্যেই দৃষ্টি-বিভ্রমকারী উদাহরণ দেখা যায় বেশী। এক জাতের প্রজাপতি আছে, যাদের ডানার ওপরের দিকের বর্ণ খুব উজ্জ্বল, কিন্তু নিম্নভাগের বর্ণ শুষ্কপত্রের মত। যখন তা'রা ওড়ে, তখন তাদের বেশ দেখা যায়, কিন্তু উড়্‌তে উড়্‌তে হঠাৎ ব'সে পড়্‌লে তাদের আর সহজে দেখা যায় না। উড়্‌বার সময় তাদের ডানার ওপরকার রঙ্‌ বেশ স্পষ্টই দেখা যায়, কিন্তু ব'সে পড়্‌বামাত্র তাদের ডানা বন্ধ হ'য়ে যায় ; তখন ডানার বাইরের দিকের শুষ্ক পাতার রঙ্‌, শুষ্ক পাতার সঙ্গে মিশে গিয়ে দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটায়।
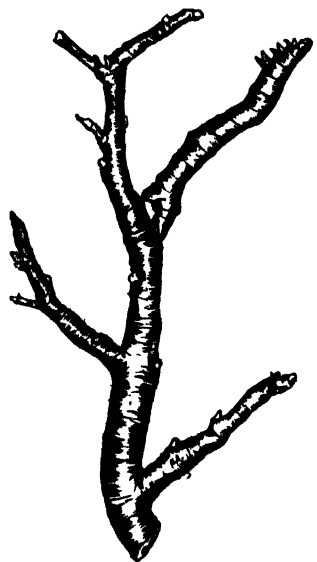
গাছের ডালের মতন ঋজুভাবে দাঁড়িয়ে 'জিওমেট্রিড্‌ মথের' শূক-কীট

'জিওমেট্রিড্‌ মথ' ব'লে একরকম শল্ক-পত্রী আছে। ওদের শূক-কীটের নাম হ'ল 'ইঞ্চ-ওয়ার্‌ম'। এই কীটগুলো অতি অদ্ভুতরূপে গাছের ডালের বর্ণ ও আকার নকল করে। ওরা দেহের পশ্চাৎভাগ গাছের ডালের সঙ্গে আবদ্ধ ক'রে ঋজু হ'য়ে এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকে যে, দেখ্‌লে মনে হয় যেন একটি মরা ছোট ডাল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাগুলো দেখ্‌লে মনে হয় যেন ছোট পত্র-মুকুল। তা ছাড়া, দেহে কতকগুলো ছোট ছোট দাগ আছে, সেগুলো দেখ্‌লে মনে হয়—ডালের ওপর ঝরাপাতার দাগ। এরূপ বহু-বহু নকলের উদাহরণ প্রাণিজগতে অতি বিরল।
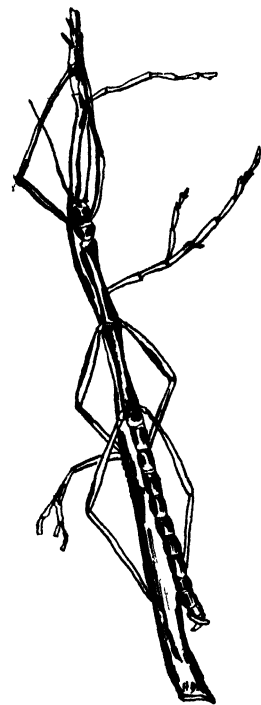
আর একরকম কীট আছে, যাদের বলা হয়, 'ওয়াকিং-ষ্টিক্ ইন্‌সেক্ট্‌' বা কাঠি-পোকা। দেখ্‌তে ওরা ঠিক্ পাতা-শূন্য সরু পল্লবের মত। ওরা সাধারণতঃ লম্বা লম্বা ঘাসের ওপর মাথা জাগিয়ে ব'সে থাকে। যেই পোকা-মাকড় ঘাস মনে ক'রে ওদের ওপর বসে, অমনি ওরা তার প্রাণ-সংহার ক'রে উদরসাৎ করে।

'ওয়াকিং-ষ্টিক্ ইন্‌সেক্ট' বা কাঠি-পোকা

দক্ষিণ আমেরিকায় 'লিফ্-ইন্সেক্ট' বা পাতা-পোকা ব'লে একরকম কীট আছে। ওদের দেহের বর্ণ ও আকার ঠিক গাছের পাতার মত। ওরা গাছের পাতার সবুজ রঙ্, পাতার আকার, (মধ্যভাগ প্রশস্ত ও দুটি প্রান্ত ক্রম-সূচল) এবং পাতার ওপরের শিরা-উপশিরাগুলো পর্য্যন্ত সুন্দরভাবে অনুকরণ ক'রে থাকে। যখন সবুজ পাতার ওপর স্থির হ'য়ে ব'সে থাকে, তখন কোন মতেই ওদের খুঁজে বের করা যায় না।
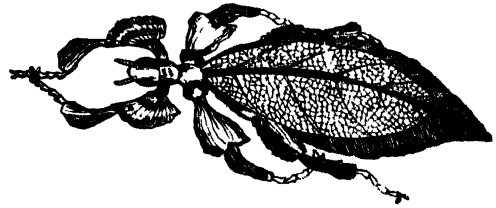
'ওয়াকিংলিফ্-ইন্সেক্ট' বা 'চলা-পাতা' পোকা—দেহের আকার ঠিক গাছের পাতার মত।

শরৎকালে অনেক জাতের প্রজাপতি দেখা যায়, যারা দেখ্তে ঠিক মরাপাতার মত। তাদের মধ্যে "ক্যালিম্মা" ব'লে একজাতীয় পূর্ব্ব-ভারতীয় প্রজাপতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ওদের ডানার ওপরের রঙ্ উজ্জ্বল বেগুনে ও কমলা, কিন্তু ডানার নীচের দিকের রঙ্ ঠিক শুক্নো পাতার মত। এমন কি, ডানার মধ্য-ভাগে একটি মোটা শিরা আছে। ঐ শিরা হ'তে দু'পাশে গাছের পাতার মত অনেক উপশিরা বের হয়েছে। এই প্রজাপতিগুলো যখন গাছের ডালে ব'সে থাকে, তখন তাদের একটি শুষ্কপত্র ব'লে ভ্রম হয়। এমন কি, পাতার বোঁটাটি পর্য্যন্ত গাছের ডালে লেগে আছে ব'লে বোধ হয়! ডানার ওপর কয়েকটি স্বচ্ছ দাগ থাকে, সেগুলো হ'ল পাতায় কীটে-খাওয়া ছিদ্রের অনুকরণ।

'ক্যালিম্মা' বা 'মরাপাতা'-প্রজাপতি

অনেক শ্রেণীর মাকড়সা আছে, তাদের গায়ের রঙ্ হয় গাছের ছালের মত, কিংবা ছালের ওপরের 'শেওলা' বা ছাতার মত। অনেক সময় ওরা কোন বিশেষ ফুলের বর্ণ ধারণ ক'রে তার ভেতর কিংবা তার

পাঁপড়ির ওপর ব'সে থাকে। পতঙ্গেরা ওদের বর্ণের সাদৃশ্যের জন্য দেখ্‌তে না পেয়ে যেই ফুলের ওপর এসে বসে, অমনি ওরা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ভীমরুল, বোল্‌তা, কতকগুলো বিষাক্ত প্রজাপতি ও কয়েক জাতীয় বিষাক্ত সরীসৃপের গায়ের রঙ্‌ খুব উজ্জ্বল এবং অনেকদূর হ'তেই তাদের রঙ্‌ বেশ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা এইরূপ বর্ণকে বলেন, "ওয়ার্‌নিং কালারেসন্‌ (warning colouration) বা সতর্ককারী বর্ণ।" অপর প্রাণীরা এদের বর্ণ দেখেই এদের বিষাক্ত ব'লে চিন্‌তে পারে এবং আক্রমণ কর্‌তে ভরসা করে না। অনেক অবিষাক্ত প্রাণী এই বিষাক্ত প্রাণীদের বর্ণ নকল ক'রে আত্মরক্ষা করে।

খেলার মাঠ

ডাক্তার শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যায়ামসিংহ

খেলা আমি ভালবাসি। খেলার ভেতর যেমন আনন্দের সন্ধান পাই—খেলার ভেতর যেমন মানুষ-গঠনের ইঙ্গিত পাই, তেমন আর কিছুতে পাই না। তাই আজ খেলার মাঠ সম্বন্ধে তোমাদের কিছু বলব।

ছেলেবেলায় খেলা করবার সময় এলেই ঘরের ভেতর মনটা ছট্‌ফট্‌ করত ফাঁকা মাঠে গিয়ে হাঁফ ছেড়ে সতেজ হবার জন্যে। ঘর থেকে বেরিয়ে যখন মাঠে গিয়ে হাজির হতুম তখন মাঠের সবুজের নেশা মনটাকে পেয়ে বসত। আমরা ছেলের দল তখন মাঠে সব দিক্‌ দিয়েই পূর্ণতার কোন বিচ্ছেদ দেখতে পেতুম না।

এখনও আমি মাঠে যাই। ছেলেদের খেলা দেখি ও তাদের খেলায় উৎসাহ দিই। সুযোগ পেলে নিজেও তাদের সঙ্গে খেলে তাদের সাহচর্য্যের মাধুর্য্য উপভোগ করতে ছাড়ি না।

কিন্তু তাদের খেলা ও আনন্দের পূর্ণতার পাশেই একটা রিক্ততা আমার চোখে পড়ে এখন। এখনই হয়ত তোমরা কেউ বলবে, রিক্ততা আপনি দেখেন কেন?

এই 'কেন'র জবাব অতি নিদারুণ। একদল ছেলেমেয়ে মাঠে খেলাধূলা করছে, তাদের দেহ ও মনের বিকাশের জন্যে; আবার দশজন, শতজন ব'সে আছে ঘরের মধ্যে—শাসনের আইনে তাদের খেলা নিষিদ্ধ। তাদের অভিভাবকেরা এই শাসনের আইনের ধারা এমন কড়াভাবে তৈরী ক'রে রেখেছেন যে, ঘরের মধ্যে দম আটকে গেলেও তাদের ছেলেমেয়েরা ফাঁকা মাঠে গিয়ে একটু ছুটাছুটি, লাফালাফি ও ভগবানের দেওয়া নির্ম্মল বায়ু সেবন করতে পারে না। অথচ, অসুখ-বিসুখ ঐ সব অভিভাবকদের ঘরেই বেশী। মাসকাবারে ডাক্তারের ভিজিট-খরচ ও ডাক্তারখানার ঔষধের বিল দেখলেই তাদের স্বাস্থ্যের হিসাব বেশ ভালই পাওয়া যায়।

খেলায় সংগ্রাম

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছোটদের দেহ ও মনের বয়সও বাড়া চাই। দেহ ও মনের বয়স আবার কি? আমি বলছি যে, বয়স অনুযায়ী দেহের জোর ও মনের বল না থাকলে সাহস ও জোর বয়সের থেকে পেছিয়ে পড়বে। তা'তে হবে কি, দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যে যার যেখানে স্থান সে স্থানে সে দৃঢ় থাকতে পারবে না। দেহ ও মনের ক্ষিপ্রতা ও প্রসারতার জন্যই খেলার মাঠ খুব ভাল। স্বাস্থ্যের গ্লানি ঝেড়ে ফেলে দিতে এই খেলার মাঠেই ছেলেমেয়েদের যেতে হবে।

আর একটা বড় জিনিস শেখবার আছে এই খেলার মাঠে। সেটা হচ্ছে 'আজ্ঞানুবর্ত্তিতা বা আদেশ মানা'। এই আদেশ মানা নিয়মানুবর্ত্তিতার (যাকে আমরা ইংরাজীতে ডিসিপ্লিন্ বলি) একটা প্রধান অঙ্গ।

তোমরা নিশ্চয়ই জান, আজ ইউরোপে কি ভীষণ যুদ্ধ বেঁধেছে! কত শত লোক এই যুদ্ধে নিহত হয়েছে ও এখনও হচ্ছে। যুদ্ধের জয় বেশী নির্ভর করে ডিসিপ্লিনের ওপর। আকাশেই হোক্, জলেই হোক্ আর জমির ওপরেই হোক্, সব জায়গাতেই যুদ্ধের শৃঙ্খলা বজায় থাকে আজ্ঞা-মানার দ্বারাই। মর আর বাঁচ, যুদ্ধক্ষেত্রে নেতার আজ্ঞা মানতেই হবে। তা'তে আর 'না' বলবার উপায় নেই।

খেলার মাঠে ও খেলাধূলার ভেতর দিয়ে ছেলেদের জয়-পরাজয়ের সংগ্রাম করতে দিতে হবে। তাদের দোষ-ত্রুটী ধরিয়ে দেবার জন্যে এবং খেলায় শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্যে একজন লোকের দরকার, তিনি হচ্ছেন 'রেফারী'।

আজ যারা খেলার সংগ্রামে মেতে আছে তা'রাই আবার ভবিষ্যতে ঢুকবে সংসার-সংগ্রামে। তখন এই খেলার মাঠের শিক্ষা ও সংগ্রাম করবার শক্তি এবং নীতি সংসার-সংগ্রামে জয়ের পথে বন্ধুরূপে তাদের পাশে দাঁড়াবে।

সংসারের খেলার সংগ্রামে তাদের রেফারী হবেন তাদের অভিভাবকেরা। অভিভাবকদের আসনে আবার যখন তা'রা বসবে তখন তাদের পরিচালনা করবে কে? তখন 'বিবেক'কে রেফারী ব'লে মেনে নিতে হবে। বিবেক কিন্তু তখন পলকা সূতোর মত দুর্ব্বল হ'লে চলবে না। তা হ'লে একটা ঝড়ো হাওয়ার ধাক্কায় সে ছিঁড়ে যাবে। সংসার-সংগ্রামে পরাজয়ই তখন তার প্রাপ্য হবে।

দৃঢ় বিবেক চাই। দৃঢ় ও শক্ত দেহেই দৃঢ় বিবেক বাস করে। তাই আমি বার বার বলি, শিশুকাল থেকেই শরীরটাকে বেশ শক্ত ক'রে তৈরী করতে হবে; বেশ ক'রে দেহের ভাণ্ডারে বল সঞ্চিত ক'রে রাখতে হবে সংসার-জীবনের ঝড়-জল সহ্য করবার জন্যে।

খেলোয়াড়ের খাদ্য

বেশীর ভাগ সময়ে দেখতে পাই ছেলেরা খেলার মাঠ থেকে বেরিয়ে ফেরিওলার কাছ থেকে নানারকম অস্বাস্থ্যকর খাদ্য কিনে খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করে। বড় ছেলেরা আবার রাস্তায় বেরিয়েই দল বেঁধে ঢোকে চা'র দোকানে। সেখানে চা, চপ্, কাট্‌লেট্ কিনে তা'রা খায়; কিন্তু একবারও ভাবে না যে, যা খাচ্ছে তা শরীরের কাজে লাগবে কিনা।

খেলার মাঠে শ্রমহেতু শরীরের ক্ষয় হয়। নোংরা চপ্-কাট্‌লেট্ তার পূরণ তো করতে পারেই না, বরং পাকস্থলীর ভেতর গিয়ে তা'রা ভীষণ জুলুম আরম্ভ করে। ব্যায়াম বা পরিশ্রমের পর সরবৎ, ফলমূল, সিদ্ধ শাকসব্জি, ছোলাগুড়, ছানাচিনি খাওয়াই ভাল। এসব জোগাড় করার সুবিধা না হ'য়ে উঠলে অন্ততঃ ভাল ছোলাভাজা কি সন্দেশ ও এক পেয়ালা দুধ খেলে শরীরের পক্ষে ভাল। নিত্য যতখানি সম্ভব শরীরের চালনা কর এবং ভাল ক'রে স্বাস্থ্যকর জিনিস খাও। শরীর সহজে ভেঙ্গে পড়বে না, ভালই থাকবে। পরিশ্রমের সঙ্গে ও ব্যায়ামের পর শরীরকে উপযুক্ত খাদ্য না দিলে শরীর বাঁচবে কেন!

খেলার মাঠে শ্রমহেতু শরীরের
ক্ষয় হয়। সেই ক্ষয় পূরণের
উপযোগী ক.একটি খাদ্য।

.ণ' তা
তাদের পরিচা
:বক কিন্ত
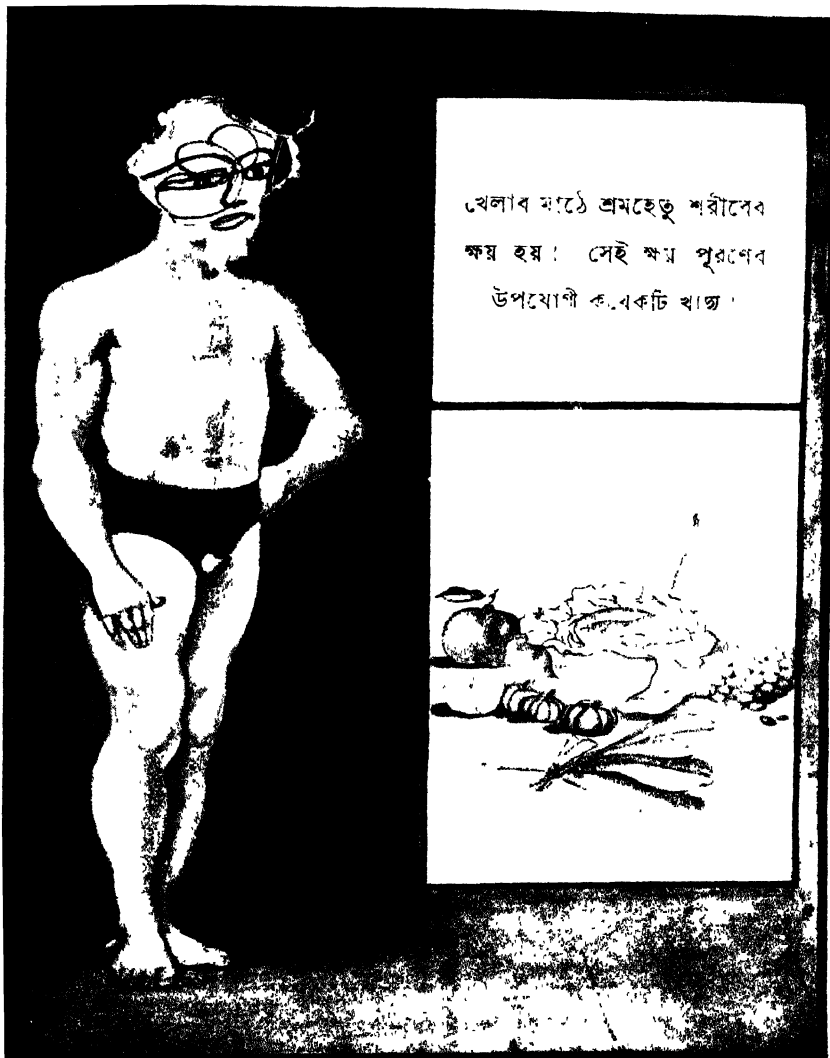
খুকীর খেয়াল

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস

শাওন-ঝরা বাদল-খুকী খেল্‌ছে জলের ফুলঝুরি,
পালক-ভেজা শাখীর টিয়া দিচ্ছে হাজার চুমকুড়ী।
গাঁয়ের শেষে মাঠের বাঁকে ঐ দীঘিটার শ্যাওলা-ফাঁকে,
কাদা-খোঁচা দিচ্ছে পাঁকে ঠোঁটে-নাকে শুড়্‌শুড়ি।
আনন্দে ঐ মাছরাঙ্গাটা ডুব দিয়ে যায় তিন কুড়ি।

বুড়ো দাদু আরাম ক'রে ফুঁক্‌ছে খালি গুড়্‌গুড়ি,
পাশে ব'সে কর্‌ছে আলাপ বিদ্যেবাগীশ ভুড়্‌ভুড়ি।
দাদু এবার ডাক্‌লো হেঁকে— "দে ত খুকী নলটা রেখে।"
খুকী বলে—"দিচ্ছি ডেকে দিদিমাকে থুড়্‌থুড়ি।"
ঠাক্‌মা বুড়ী কইল রেগে—"দুষ্টু বড় তুই ছুঁড়ি।"

রান্নাঘরের দাওয়ার 'পরে ব'সে ছিল মেজ্‌খুড়ী,
আঁচলে তার লুকিয়ে গেল; খুঁজ্‌বে কোথা আর বুড়ী।
ছোড়্‌দা তখন বেজায় রেগে আস্‌লো কাছে দৌড়ে বেগে;
সাম্‌নে দোরের ধাক্কা লেগে ছড়িয়ে গেল খই-মুড়ি।
বল্‌লে তারে আরো রেগে—"ভাঙ্‌চি তোমার সব চুড়ি।"
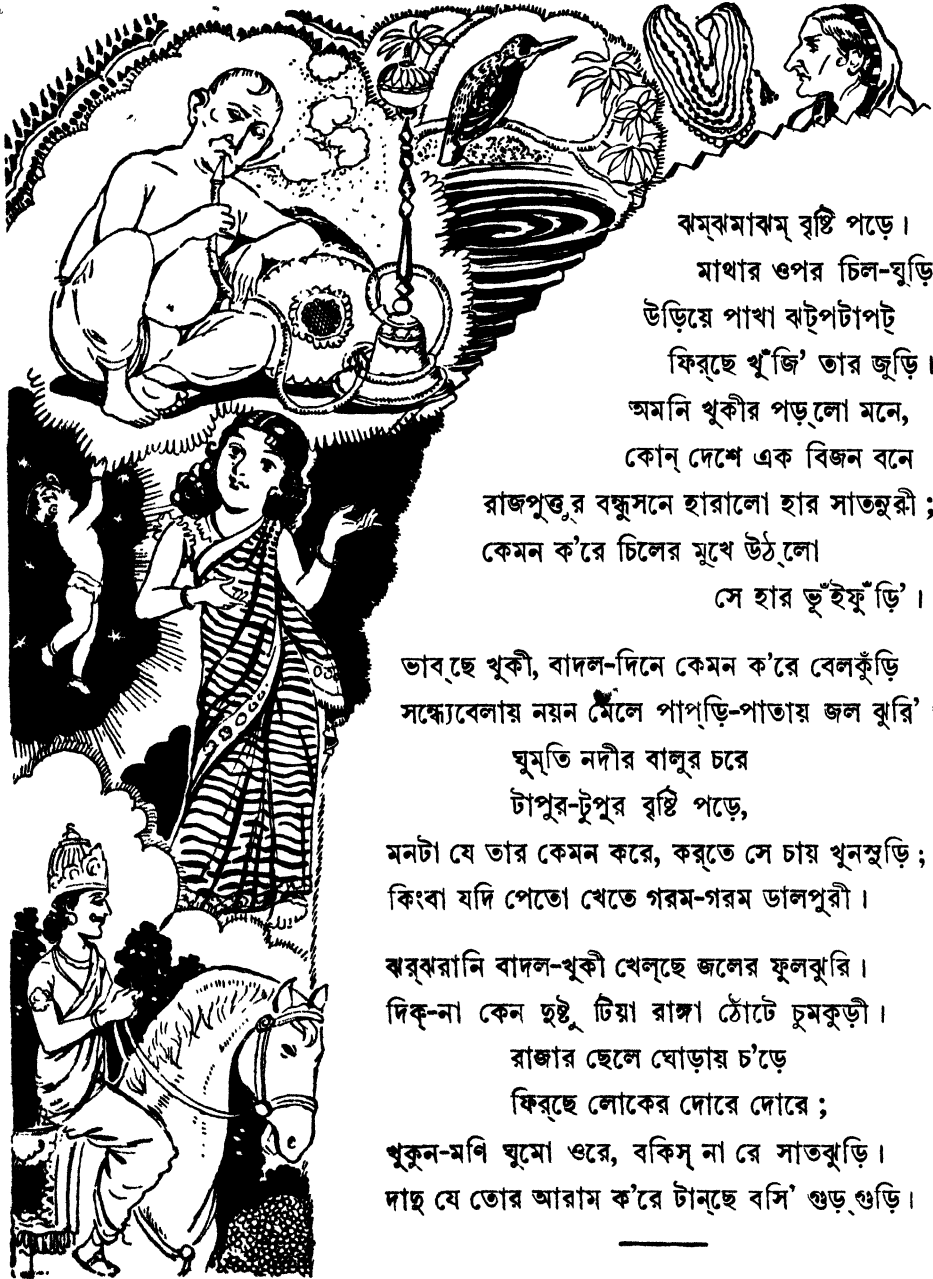
ঝম্‌ঝমাঝম্ বৃষ্টি পড়ে।
মাথার ওপর চিল-ঘুড়ি
উড়িয়ে পাখা ঝট্‌পটাপট্
ফির্‌ছে খুঁজি' তার জুড়ি।
অমনি খুকীর পড়্‌লো মনে,
কোন্ দেশে এক বিজন বনে
রাজপুত্তুর বন্ধুসনে হারালো হার সাতনুরী ;
কেমন ক'রে চিলের মুখে উঠ্‌লো
সে হার ভুঁইফুঁড়ি'।

ভাব্‌ছে খুকী, বাদল-দিনে কেমন ক'রে বেলকুঁড়ি
সন্ধ্যেবেলায় নয়ন মেলে পাপ্‌ড়ি-পাতায় জল ঝুরি'।
ঘুম্‌তি নদীর বালুর চরে
টাপুর-টুপুর বৃষ্টি পড়ে,
মনটা যে তার কেমন করে, কর্‌তে সে চায় খুনসুড়ি ;
কিংবা যদি পেতো খেতে গরম-গরম ডালপুরী।

ঝর্‌ঝরানি বাদল-খুকী খেল্‌ছে জলের ফুলঝুরি।
দিক্-না কেন দুষ্টু টিয়া রাঙা ঠোঁটে চুমকুড়ী।
রাজার ছেলে ঘোড়ায় চ'ড়ে
ফির্‌ছে লোকের দোরে দোরে ;
খুকুন-মণি ঘুমো ওরে, বকিস্ না রে সাতঝুড়ি।
দাদু যে তোর আরাম ক'রে টান্‌ছে বসি' গুড়্‌গুড়ি।

ভীমসেন-ঘটোৎকচ-সংবাদ

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

"গল্প! গল্প!"—দুপুর রাত্রে বিছানায় উঠে ব'সে তক্তপোষের ওপর প্রবল মুষ্ট্যাঘাতের সঙ্গে চীৎকার ক'রে ওঠে শ্রীমান ঘটোৎকচ সান্যাল—"গল্প চাই—একটা গল্প! এখুনি!—এই রাত্রে!"

ঘড়ির কাঁটা বারটার ঘর ছাড়িয়ে গেছে। অতএব, ক্যালেণ্ডারের তারিখ বদল করা চলে; হিসাব মত বলা যায় ১০ই সেপ্টেম্বর সুরু হ'য়ে গেছে। আর এই ১০ই সেপ্টেম্বর হচ্ছে শেষ তারিখ গল্প রপ্তানি করবার। 'জেলখানা'র সম্পাদক তাই জানিয়েছেন—"পূজাসংখ্যা 'জেলখানা'র জন্য ১০ই তারিখের মধ্যে গল্প একটা চাইই চাই।"

ঘটোৎকচের জীবনে এটা প্রথম স্মরণীয় ঘটনা। সম্পাদক নিজের হাতে চিঠি লিখে—ছাপা চিঠি নয়, সত্য হাতেলেখা চিঠিতে গল্প চেয়ে পাঠিয়েছেন ঘটোৎকচের কাছে।

লিখে আসছে সে আজীবন গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, গদ্য, কাব্য, অনেক কিছু। অথচ, আশ্চর্য্যের কথা এই যে, আজ পর্য্যন্ত একটাও ছাপার অক্ষরে দেখা অদৃষ্টে ঘটে' ওঠে নি তার। ছেলেবেলায়—স্কুল-ম্যাগাজিনেও না। সম্পাদকের বদমাইসি ছাড়া অবশ্য ন্যায়-সঙ্গত কোন কারণ ঘটোৎকচ আজও খুঁজে পায় নি। এই জেলখানার সম্পাদকই কি তাঁকে অবহেলা ক'রে ফিরিয়ে দেয় নি? দিয়েছে। কিন্তু এখন? হুঁ বাবা, পথে এস।—"আপনাদের মত গুণী ব্যক্তির সহযোগিতা ব্যতীত শারদীয়া সংখ্যা 'জেলখানা'র সর্ব্বাঙ্গীণ সৌষ্ঠব অসম্ভব।" হ'ল ত লিখতে? গেল তো মান?

যাক, একটা গল্প সে লিখে দেবেই। শুধু চাই এক ছিটে সাহিত্যিক প্রেরণা। অসম্ভব! এরকম বিছানায় ব'সে ব'সে পিঠ ঘামানোর কোন মানেই হয় না।

ভাদ্র মাসের গুমট্ রাত। চারপাশে নীরেট ইঁটের দেয়াল, মাথার ওপর কতকগুলো কড়ি-বরগা!—রাবিশ!! সাহিত্যিক প্রেরণা অমনি আসে না। চাই মুক্ত বাতাস, মুক্ত আকাশ; আর চাই মুক্ত—অর্থাৎ খোলা ছাদ।

জননী ভারতী, মা লক্ষ্মীর মত অমন গেরস্থালী মেয়ে নয় যে, গলি ঘুঁজি আনাচে কানাচে উঁকি মেরে বেড়িয়ে সুবিধে মত একটু জায়গা পেলেই নিজের পিঁড়িখানি পেতে ব'সে পড়বেন। সরস্বতী ঠাকরুণ বনেদী-ঘরের মেয়ে—ভদ্রলোক ভিন্ন কারুর চৌকাঠই মাড়াতে চান না। ধরুন যেমন আমাদের ঘটোৎকচ সান্যাল; একটা মানুষের মত মানুষ—নামটাই যা তেমন মানানসই নয়। কত অবান্তর কারণেই যে এইসব সৃষ্টিছাড়া নামের সৃষ্টি হয়! শুনেছি ধাই নাকি আঁতুড়ে ছেলের গায়ের রঙের সঙ্গে মিল ক'রে নামকরণ ক'রে গিয়েছিল "ঘুটঘুটে"। সেইটাই কালক্রমে মহাভারতবিদ্ দাদামশাইয়ের হাতে প'ড়ে ঘটোৎকচে রূপান্তরিত হয়েছে।

হোক্, ঘটোৎকচ আর কাউকে কেয়ার করে না। গায়ের গেঞ্জি খুলে কোঁচার কাপড়ে ঘাম মুছতে মুছতে ছাদে বেরিয়ে এসে হাঁ-ক'রে একটু হাওয়া খেয়ে নেবার চেষ্টা করে।

ঈশ্বরের দয়ায় এই নতুন বাসাটায় ঘরের সাম্‌নেই একফালি ছাদ আছে। উর্দ্ধমুখে তাকিয়ে থাকলে 'নক্ষত্রখচিত আকাশ', 'জ্যোৎস্না-স্নাত রজনী-টজনী' প্রভৃতি ভাল ভাল জিনিস দেখা যায়। কিছুক্ষণ অস্থিরভাবে পায়চারী ক'রে ঘটোৎকচ স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে গম্ভীরস্বরে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলে—"একটা গল্প! আজই! এখুনি! ১০ই সেপ্টেম্বর—মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি।"

নতুন বাসায় ঘটোৎকচের ভাগে যে ঘরখানি পড়েছে, সেটিকে ঘর না ব'লে ঘরের দরুণ বলা উচিত। তা'তে টেবিল, চেয়ার, বুককেস্, আর্শি আলনায় ঠাসা; মেজেয় পা ফেলবার জো নেই। কাজেই, তক্তপোষের নীচের জমিটুকুতে খাসা ক'রে বিছানা বালিশ নিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন ঘটোৎকচের পিসী—রক্ষাকালী দেবী। দু'মাসের ছেলে থেকে তিনি ঘটোৎকচের ভার নিয়েছেন স্বেচ্ছায়, সাগ্রহে, মাতৃস্নেহের আধিক্যে। আসল মা ঘটোৎকচের ব্যাপারে বড় একটা হস্তক্ষেপ করেন না। কারণ, আরও এগারোটি ছেলেমেয়ের ঝক্কি-ঝামেলা স'য়ে—সাহিত্যিক বড় ছেলের বায়নাক্কা নেবার মত এনার্জ্জি তাঁর বড় অবশিষ্ট থাকে না।

ঘটোৎকচ পিসীমার সম্পত্তি। পিসীমা তা'কে আশৈশব হ'তে আগ্‌লে আসছেন, আজও তার ব্যতিক্রম হয় নি। তক্তপোষ থেকে গড়িয়ে প'ড়ে যায় কিনা—মাঝরাতে একবার উঠতে ভুলে যায় কিনা এবং একলা উঠে' ভূতের ভয় পায় কিনা এসব বিষয়ে পিসীমার খরদৃষ্টি রাখতে হয়। তা ছাড়া তদারক করবার আরও কত কিছু নেই কি? 'নিশি'তে ডাকতে বা অন্ধকারে পেঁচোয় পেতে পারে না? ঘরটার আবার জানলার সাম্‌নেই প্রকাণ্ড এক নারকেলগাছ। কাজেই, মাথার গোড়ায় প্রদীপ জেলে রক্ষাকালী তক্তপোষের নীচে থেকে ওপরের মালটির রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

তক্তপোষে ঘুসি চালানোর শব্দেই পিসীমার সদা-সতর্ক ঘুম পাতলা হ'য়ে আসে এবং ছাদের দরজা খুলে বেরিয়ে যাওয়ার সাড়া পেয়ে তড়বড় ক'রে উঠে বসেন; সঙ্গে সঙ্গে—উঃ হুঃ হুঃ। মাথাটার দফা গয়া। ঘুম চোখেই চোখে সর্ষেফুল দর্শন!

বেচারী পিসীমা—চিরকাল ত আর গুহাবাসিনী নন্। হামাগুড়ি দিয়ে কৌশলে বেরিয়ে আসার অভ্যাস করতে তার কিছুদিন লাগ্‌বে। ফুলে ওঠা নেড়ামাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ছাদের দরজায় উঁকি মেরেই রক্ষাকালী স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। ... ...

মাঝরাত্রে বিছানা ছেড়ে উঠে এসে অন্ধকার ছাদে দাঁড়িয়ে শূন্যে ঘুসি ছোঁড়া কিসের লক্ষণ? জ্বর নয়—বিকার নয়—বদ্ধ পাগল নয় ত? নইলে একলা একলা কথা কওয়ার অর্থ কি? পেঁচোয় পাওয়া কা'কে বলে? অনেকক্ষণ পর পিসীমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হ'ল; ক্ষীণস্বরে ডাকলেন—"ও বাবা ঘুটুম্, ঘরে আয় মাণিক! অ ঘুটুম্, শুনছিস্?"

ঘুটুমের কানে অবশ্য সে স্বর পৌছয় নি। রক্ষাকালী কাতর অনুনয়ের সঙ্গে আবার ডাকেন—"অ বাপ্ ঘণ্টু, ঘরে এসে 'য়্যাক্‌টো' করো ধন।"

গেলবার সরস্বতী পূজোয় সখের থিয়েটারে মেঘনাদ সেজে ঘটোৎকচ অমনি ক'রে, আর্শির সামনে দাঁড়িয়ে শূন্যে ঘুসি ছুঁড়ে বিড়-বিড় ক'রে বকত, সেই কথা স্মরণ ক'রে পিসীমা আশায় বুক বেঁধে একটু জোরাল গলায় ডাকেন—"ঘেঁচু শুনছিস্, ঘরে এসে আলো জ্বেলে য়্যাক্‌টো কর্ না? অন্ধকারে গুলিয়ে ফেলবি যে—"

এতক্ষণে ঘটোৎকচের কান নিজের কাজ করে। চমকে উঠে' ঘটোৎকচ ভারীগলায় প্রশ্ন করে—"কে? ও পিসীমা? কি চাও?"

—"কিছু চাই না বাবা, তুই ঘরে চল্।"

—"ঘরে? না।"—অচল অটল স্বর ঘটোৎকচের।

—"না কিরে? এই শেষ ভাদ্দরের নতুন হিম—ঠাণ্ডা লাগবে যে—"

—"যাও বিরক্ত ক'রো না—আমি এখন প্রেরণা আনছি।"

—"কি আনছিস্?—" পিসীমা থতমত খেয়ে যান।

—"প্রেরণা—সে তুমি বুঝবে না, বোঝ ত খালি মোচার ঘণ্ট, আর কচুর শাক; গল্প চাই—বুঝলে? গল্প—আজ এখুনি এই রাত্রে। ওন্‌লি ওয়ান্ গল্প।"

পিসীমা এতক্ষণে ভরসা পেয়ে একগাল হেসে বলেন—"গপ্‌পো শুনবি, তাই বল্—ছোটবেলার কথা মনে প'ড়ে গেছে বুঝি? দুপুর রাত্তিরে উঠে' অমনি গপ্‌পো শোনার বায়না—না হ'লেই নয়। তা' কি শুনবি বল্, সেই ঢেঁকি চিংড়ির গপ্‌পোটা? না ভুষুণ্ডি কাগের?"

হঠাৎ ঘটোৎকচ খ্যাঁক্ ক'রে তেড়ে এসে চোখ পাকিয়ে ব'লে ওঠে—"মাথা খারাপ হয়েছে না কি? ভাগো—ভাগো হিঁয়াসে।"

পিসীমা আর দাঁড়ান না, মনে মনে ভাবেন—এ পেঁচো নয়, সত্ত মাম্‌দো; নইলে হিন্দিবুলি বেরোবে কেন? কাঁদো-কাঁদো হ'য়ে ও ঘরের দরজায় যেয়ে প্রায় আছড়ে প'ড়ে পিসীমা ডাক দেন—"বৌ, অ বৌ, শুন্‌ছো? ঘেঁটুকে আমার কিসেয় পেয়েছে।"

ঘটোৎকচ-জননী (অবশ্য হিড়িম্বা নয়) চোখ রগড়াতে রগড়াতে বেরিয়ে এসে বললেন—“ঠাকুরঝি, কি হয়েছে ?”

—“হয়েছে আমার মাথা—আর তোমার মুণ্ডু”—রক্ষাকালীর স্বাভাবিক স্বভাব কতকটা ফিরে আসে—“ধন্যি ঘুম বটে, নিশ্চিন্দি হ’য়ে ঘুমোচ্ছ ? এদিকে দেখ এসে ছেলের কাণ্ড !”

দু’জনে এসে দেখলেন—ঘটোৎকচ পায়চারী করতে করতে মাঝে মাঝে একটা বুকফাটা দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে বলছে—“একটা গল্প ! হে ঈশ্বর, একটুখানি প্রেরণা।”

ঠাকুরঝি ব্যস্তভাবে বলেন—“দাদাকে টেলিগ্গেরাপ করলে হয় না বৌ ?”

বৌ হতাশ-ভঙ্গীতে বলেন—“মাথায় হুঁকোর জল দিলে হ’ত না ঠাকুরঝি ?”

—“হুঁকোর জল ! কথাটা মন্দ নয়, কিন্তু জিনিসটা যে দুর্লভ। পাড়ার ত্রিসীমানায় কেউ তামাক খায় ব’লে, জানা নেই।”

বৌ ব্যাকুলভাবে বলেন—“আমাদের পঞ্চাননতলার কেষ্ট কোব্‌রেজ তামাক খান।”

রক্ষাকালী আকুল হ’য়ে বলেন—“তাই তবে কেউ ছুটে’ গিয়ে আনুক।”

—“কে যাবে ঠাকুরঝি ? ছ’টার গাড়ীতে রেলে চাপলে এগারোটার ইষ্টিমার পাবে।”

রক্ষাকালী ‘না’ সূচক গম্ভীর শিরশ্চালন করেন ; তারপর বলেন—“দাদা বাড়ী থাকলে ও যা হয় হ’ত—তবে নয় ভীম গিয়ে একবার শ্রীপদ ডাক্তারকে ডেকে আনুক।”

—“সে যে শ্যামবাজারে গো ঠাকুরঝি !”

—“তা’ বললে কি হবে ? ডাক্তারের বাড়ী শ্যামবাজারে ব’লে কি কালীঘাটের লোক বিনি চিকিচ্ছেয় প্রাণ হারাবে ? ষাঠ্ ষাঠ্ ষেঠের বাছা ষষ্ঠির দাস। ঘুটুমের আমার এক শো বচ্ছর পেরমাই হোক্। লোকের কথা বলছি।” … … …

অসময়ে কাঁচাঘুম ভেঙে, ছারপোকা-মণ্ডিত সুখশয্যা ছেড়ে উঠে’ এসে, বিশ্বের বিরক্তিমাখা মুখে শ্রীমান ভীমসেন প্রশ্ন করে—“আপনি বলছো কি পিসীমা ? ‘ছিপদ’ ডাক্তার ত আমাদের সেই হোথ্‌থায়—দুপুর রাত্তিরে বাস্ টেরাম কোথায় পাবো ?”

“আবার বাস্ টেরাম !”—পিসীমা ভীমকে এক ভীমতাড়া দিয়ে ওঠেন—“বাবু একেবারে নবাব সেরাজউদ্দোলা ! তোদের ‘কটকো জিলায়’ রাতদিন গাড়ী পাল্কী চ’ড়ে বেড়াস্ বুঝি ? ছোট নোকের পা, যাবি আর আসবি।”

ভীমসেন রক্ষাকালীকে ভয় করে না। পিসীমার মুখপানে এক কুলিশ-কঠোর দৃষ্টি হেনে উত্তর দেয়—“হুঁ-উ ! বলি সে ভদ্দর সন্তান আসবেন কিসেয় চেপে ? এই ছোট নোকের দুইকাঁধে দু’খান্ ঠ্যাং চাপিয়ে ? এই আপনাকে বলি শুনুন বড়মা—দাদাবাবুর মাথাটা একটু গরম হ’য়ে গেছে। হবে না ? বাইস্‌কোপ্ দেখে দেখে মাথার মধ্যি কিছু আর থাকে ? মানুষের ভীড়ে আর

আলোর গরমে ঘিলু একেবারে টগ্‌বগ্‌ টগ্‌বগ্‌। ওই সকালবেলা নাপ্‌তে ডেকে মাথার তেলোটুকুন কামিয়ে একডেলা মাখন চাপিয়ে রাখবেন, ব্যাস্‌ সব ঠাণ্ডা। তবু ত সন্ধ্যে রাত্তিরের কথাটা বলি নি আপনাদের। ক'দিন হ'ল একখান চিঠি এসেছিল, ঘুঁটের মাচায় তা' গুঁজে থুয়েছিলাম, দিতে বিস্মরণ হ'য়ে গেছি। ঘুঁটে পাড়তে চিঠিখান পড়ল—তা' বলি দাদাবাবুকে দিই। হাতে দিতেই—বললে বিশ্বাস করবেন না মা—'হুররি' ব'লে এক লাফ্‌ মেরে—ঠন্‌ ক'রে একটা আধুলী ছুঁড়ে বক্‌শিশই ক'রে ফেললে। তা' পরেই হঠাৎ চক্ষু রক্তবন্ন ক'রে বললে—'চিঠিখানা কবে এসেছিল রে—হতভাগা শুয়োর? দে আমার আধুলী ফেরৎ—বকশিশ নেবেন রাস্কেল কোথাকার।' সে মারমুখো মুর্ত্তি দেখে আমি আর নেই—আধুলিটে তুলে নে দে ছুট্‌। তখনই বুঝেছি বাইস্‌কোপের গরমে মাথাটাই বিগ্‌ড়েছে দাদাবাবুর।"

ইত্যবসরে ঘটোৎকচের বাকী দশটি ভাই-বোন গুটি গুটি উঠে' এসেছে এবং ঘটনাটা কতক আন্দাজ ক'রে প্রত্যেকেই একবার দাদাকে উঁকি মেরে দেখে আসছে।

ঘটোৎকচ ঘরে এসে কিছুক্ষণ অবাক্‌ হ'য়ে তাকিয়ে থেকে তেলে-বেগুনে জলে উঠে' বললে—"কি দেখছিস্‌ সব হাঁ ক'রে? রথ না দোল? সব ক'টা ঘুম ভেঙে উঠে' এসেছিস্‌ যে বড়? মা—এর মানে? পিসীমা—এর অর্থ? আবার ভীমে রাস্কেলও! ষ্টুপিড, বাঁদর! সং দেখছিস্‌?"

—"ওই গো মা, আবার—বরফের থলি মাথায় চাপান কেন" ব'লেই ভীমসেন উর্দ্ধশ্বাসে ছুট্‌। সঙ্গে সঙ্গে মেজ, সেজ, ন, ছোট, নতুন, রাঙা, কনে, ফুল, পুঁচ্‌কে, মটর, ক্ষুদে—সব ছুট্‌ ছুট্‌। শুধু পিসীমারই নিজের প্রাণ তুচ্ছ; তাই সাম্‌নে এগিয়ে এসে বিপন্নস্বরে বলেন—"ঘুটুম্‌, পায়ে একটু ঠাণ্ডা জল দিবি?"

"ঠাণ্ডা জল? পায়ে? কেন? আমার মাথা গরম হয়েছে না-কি? হাঃ হাঃ হাঃ। তোমরা একটি আস্ত পাগল। তা' নয় পিসী, তা' নয়। এই দেখ ওয়ারেণ্ট—'জেলখানা' থেকে এসেছে। আজকের মধ্যেই আসামী গ্রেপ্তার করতে হবে—হাঃ হাঃ হাঃ।" ঘটোৎকচ মাথার বালিশের তলা থেকে একখানি লম্বাটে খাম টেনে বার ক'রে দেখায়। পিসীমা পড়তে জানেন না—ঘটোৎকচ-জননী জানেন; দেখেন যথার্থ ই খামের উপর বড় বড় ক'রে লেখা—'জেলখানা'।

কারুর আর বাক্‌ সরে না। ঘটোৎকচ, কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে নিয়ে ঢক্‌-ঢক্‌ ক'রে সবটা খেয়ে, বীরত্বব্যঞ্জক স্বরে বললে—"পিসী, যাও, তোমাদের রেজিমেণ্ট নিয়ে স'রে পড়; একলা থাকতে দাও আমায়—খিল দিয়ে। অনেক কষ্টে একটু প্রেরণা এসেছে, সেটুকু নষ্ট করতে চাই না। যাও—সব যাও। একলা থাকতে চাই, একটু একলা—শুধু পৃথিবী আর আমি। না না—শুধু কলম আর আমি।"

আস্তে আস্তে সবাইকে পার ক'রে ঘটোৎকচ ক'সে খিল দিয়ে ফাউন্‌টেন নিয়ে বসে।

পাশের ঘরে গিয়ে কোলের ছেলের ঘামাচি মারতে মারতে ঘটোৎকচের মা বড় ছেলের জন্যে দুশ্চিন্তায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেন—"ছেলেটার শেষকালে হাতে দড়ি পড়বে ঠাকুরঝি ?"

পিসীমা কাঁদো-কাঁদো হ'য়ে বলেন—"ছেলেটার শেষকালে মাথাটা বিগড়েল ! বৌ !"

মন খারাপ ; কেউ কারুর প্রতিবাদ করে না। রক্ষাকালী বলেন—"দাদাকে টেলিগ্‌গেরাপ্‌ করা হোক বৌ !" বৌ ঘাড় নেড়ে সায় দেন, হুঁকোর জলের কথা আর তোলেন না।

নীটোল সুডোল একটি প্রকাণ্ড গল্প লিখে শেষ ক'রে মায় 'ফেয়ার কপি' পর্য্যন্ত সেরে, ঘটোৎকচ বেলা সাড়ে ন'টার সময় খিল খুলে বেরিয়ে আসে। হাতে-মুখে একটু জল দিয়ে—চুলে বারকতক চিরুণী চালিয়ে—এক কাপ্‌ চা মুখে দিয়ে চলল 'জেলখানা'র উদ্দেশে।

বিপিন উকিলের গ্যারেজের উপরকার দেড়তলার ঘরে 'জেলখানা'র অফিস। সম্পাদক মশাই এইমাত্র কুলুপ খুলে ঘরে ঢুকে' দরজাটি ভেজিয়ে দিয়ে ঝাঁটা দিয়ে ঘরটি ঝাঁট দিতে সুরু করছেন, এমন সময় কড়ানাড়ার শব্দ !

তাড়াতাড়ি ঝাঁটাটা বেঞ্চির তলায় ঠেলে দিয়ে, হাত ঝেড়ে, দরজা খুলে সম্পাদক মশাই গম্ভীরভাবে বলেন—"কাকে চান ?"

—"এই ইয়ে—সম্পাদক মশাইকে।"

—"আমাকেই সম্পাদক ব'লে জানবেন"—একটা অবজ্ঞা দৃষ্টি হেনে বিশ্বম্ভরবাবু বলেন—"বসুন ওই চেয়ারটায়।"

চেয়ারে ব'সে ঘটোৎকচ এক গাল হেসে বলে—"তবে আর কি আপনার সঙ্গেই কথাবার্ত্তা চলবে ! কথা আর কি, এই নিন্‌ আপনার গল্প।"

—"কিসের গল্প ?"—সন্দিগ্ধ প্রশ্ন করেন সম্পাদক, "কে পাঠিয়েছে আপনাকে বলুন তো ?"

—"আমাকে ! আমিই এনেছি—হাঃ হাঃ হাঃ। মানে—আমিই হচ্ছি ঘটোৎকচ সান্যাল, এগারোর তিন হারাণ হালদার লেন।"

সম্পাদক শেষের দিকটায় কান না দিয়ে কূটপ্রশ্ন করেন—"কিছুদিন আগে আপনি একবার এসেছিলেন না ? দেখে পর্য্যন্ত তাই ভাবছি। আচ্ছা বেহায়া লোক তো মশাই আপনি ? সত্যি কথা শুনতে চান তো বলি—ওসব সাপ ব্যাঙ্‌ অন্ততঃ আমার কাগজে চলবে না।"

অপমানে মুখ কালো ক'রে ঘটোৎকচ উত্তর দেয়—"হ্যাংলার মত অমনি আসি নি, দস্তরমত চিঠি পেয়ে আসা হয়েছে মশাই।"

—"চিঠি ? কে দিয়েছে ?"

—"আপনিই দিয়েছেন, এই তো দেখুন না—রয়েছে তো সঙ্গে।"—ঘটোৎকচ টেবিলে ফেলে দেয় চিঠিখানা।

সম্পাদক মশাই খামটা উল্টেপাল্টে দেখে নিয়ে গলা খাঁকারি দিয়ে বলেন—"হুঁ, তা' কতদিন বাসা বদলেছেন? বলি, এ বাসায় ক'দিন আসা হয়েছে?"

"এই—দিন কুড়ি"—ঘটোৎকচ অবাক্ হ'য়ে তাকায় বিশ্বম্ভরবাবুর মুখপানে। বাসা-বদলের কথা বললে কে? হাত গণে নাকি লোকটা?

—"তা' বেশ, বদলেছেন উত্তম করেছেন, তবে ভবিষ্যতে খামের চিঠি খোলার আগে দয়া ক'রে উপরের নামটা দেখে খুলবেন।...ঘণ্টেশ্বর সামন্ত—ফেমাস্ রাইটার—কিছুদিন ছিলেন ওই বাসায়—ওই এগারোর তিনে, চিঠিখানা তাঁর কাছেই নিবেদন করা হয়েছে। কষ্ট ক'রে একটু দেখে খুললে আর—। আপনার কাছে লেখা ভিক্ষে করতে যাবে বিশ্বম্ভর চাটুয্যে? হাসালেন!"

ঘটোৎকচ ফ্যাল্-ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে থাকে—বিশ্বম্ভরের মুখপানে নয়, চিঠির ঠিকানায়। হ্যাঁ, এখন চেষ্টা করলেই বোঝা যাচ্ছে ঘটোৎকচ নয়—ঘণ্টেশ্বর, সান্যাল নয়—সামন্ত। ঘুঁটের ঘসা লেগে অক্ষর ক্ষয়ে গিয়েই এই বিপদ!

সব দোষ ব্যাটা ভীমের। মহাভারতের আত্মীয় সম্বন্ধ বিস্মৃত হ'য়ে, মনে মনে ভীমসেনকে একটি কুটুম্ব সম্বোধনে আপ্যায়িত ক'রে, ঘটোৎকচ আড়াই হাত লম্বা, লড়বড়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে তর্‌তর্ ক'রে নেমে যায়। সব অপমানের প্রতিশোধ তুলবে সে। গল্প নয়—গল্প নয়। প্রতিশোধ! প্রতিশোধ!

বাজারের পথে ভীমসেন-ঘটোৎকচ সাক্ষাৎ। ভীমসেনের হাতে অরন্ধনের বাজার। একহাতে মুলো-বেগুন হ্যানো ত্যানো ভর্ত্তি থলে—আর এক হাতে এক বোঝা কচুর ডাঁটা। পয়সা আষ্টেকের ডাঁটার কমে পিসীমার মন ওঠে না।

হঠাৎ ডাঁটার বোঝা হ্যাঁচকা টানে ধরাশায়ী ক'রে ঘটোৎকচ ভীমসেনের চুলের মুঠি বাগিয়ে ধরে। অতঃপর এক-একগাছি কচুর ডাঁটা তুলে' সদ্ব্যবহার করতে থাকে তার পিঠে।

কলির সবই উল্টো। ভীমসেনের আত্মরক্ষার পথ নেই। শুধু পরিত্রাহি চীৎকার করতে থাকে—"ও পরামাণিকের পো, ক্ষুরখানা নিয়ে একবার এসো না দাদা। বাবু মশায়রা দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লেগেছেন! পয়সা চারেকের মাখন কেউ এনে দেন না ছাই।"

কোথায় বা পরামাণিক, কোথায় বা মাখন। কা কস্য পরিবেদনা। বাজে লোকের ভীড়ে রাস্তা ভর্ত্তি। ঘটোৎকচের ভ্রূক্ষেপ নেই; একগাছিও কচুর ডাঁটা আস্ত থাকতে যে, সে ভীমকে ছাড়বে এ আশা করা যায় না। আর ভীমই কি আস্ত থাকবে?

ক্যামেরার গোয়েন্দাগিরি

শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, বি. এস্-সি.

ক্যামেরায় ছবি তুলতে কে না ভালবাসে? তোমরাও ভালবাস নিশ্চয়! নিজ হাতে বাপ-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, গাছপালা, পাহাড়-পর্ব্বত—এ সবের ছবি তোলা কি আনন্দের ব্যাপার!

আজকাল ক্যামেরার যা উন্নতি হয়েছে তা'তে ছবি তুলবার হাঙ্গামাও অনেক ক'মে গেছে। খুব তাড়াতাড়ি ছবি তুলবার ক্যামেরা আর প্লেট, পকেটে ব'য়ে নেওয়া যায় এমন ছোট্ট আর হাল্কা ক্যামেরা, পর পর অনেকগুলো ছবি তোলা যায় এমন রোল্-ফিল্ম, বড় বড় লেন্স্, দ্রুতগতি সাটার, হরেক রকম ছাপার কাগজ আর ছবি ছাপার কায়দা—ইত্যাদি নানাদিক দিয়েই গত দশ-পনেরো বছরে ফটোগ্রাফির যুগান্তর হয়েছে।

দিনে-রাতে, ঝড়-তুফানে, ঘরের কোণে, মাঠে, মরুর বুকে, আকাশ-পথে, সাগরের নীচে—সব জায়গায়ই আজকাল সব জিনিসের সুন্দর সুন্দর ছবি তোলা যায়। মাইক্রো-ফটোগ্রাফি ও টেলিফটোগ্রাফির আজকাল যা উন্নতি হয়েছে, ফটোগ্রাফির আবিষ্কর্ত্তা ডেঁগুরে সাহেবেরও তা'তে তাক্ লেগে যাবে। অতি-লাল আলো (Infra Red) আমরা চোখে দেখতে পারিনে, কিন্তু ক্যামেরায় দূরীবণ লেন্স (Telephoto Lens) লাগিয়ে অতি-লাল প্লেটে আজকাল বহু দূরের ছবি অনায়াসেই তোলা যায়। খালি চোখে আমরা যা দেখতে পাই না, এ সব ছবিতে তা' স্পষ্ট উঠে।

অতি-লাল আলোর মত অতি-বেগুনি (Ultra-violet) আলোও আমাদের চোখের পর্দ্দায় ধরা পড়ে না। কিন্তু এই অতি-বেগুনি আলোর সাহায্যে ছবি তুলে' আজকাল নানারকম জাল, জুয়াচুরি ও খুনের মামলার সুরাহা হচ্ছে। অতি-বেগুনি আলোর মত এ সব ছবি তুলতে অতি-লাল এবং এক্স-রে আলোও আমাদের খুব কাজে আসে।

নানা বৈজ্ঞানিক গবেষণায়, নূতন জিনিসের আবিষ্কারে, অজানা রহস্যের সন্ধানে ক্যামেরা আজকাল বিজ্ঞানীদের মস্ত সহায়। পুলিশের হাতে প'ড়েও ক্যামেরা আজ মস্ত বড় ডিটেক্‌টিভের কাজ করছে। আজ তোমাদিগকে তেমনি কয়েকটি ডিটেক্‌টিভ্ কাহিনী শোনাব। ··· ···

তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। কর্ম্ম-ক্লান্ত সহরতলীতে নেমে এসেছে স্তব্ধতার ছায়া। এমনি সময় সন্ধ্যার আঁধারে জন-বিরল এক গোলাবাড়ীর সুমুখে এসে দাঁড়াল কালো রংএর একখানা মোটরগাড়ী। গাড়ী থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল একজন আরোহী। তার পরণে কালো রংএর পোষাক, হাতে খবরের কাগজে জড়ানো একটি ছোট্ট বাক্স। মিনিট খানেকের মধ্যেই লোকটি যেমন চুপ ক'রে এসেছিল তেম্‌নি নিঃশব্দে গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে গেল।

আধ ঘণ্টাও গেল না। এরই মধ্যে বজ্রগর্জ্জনে সেই নিস্তব্ধ পল্লী একেবারে ভূমিকম্পের মত কেঁপে উঠল। দেখা গেল, গোলাবাড়ীর ছাদ উড়ে' গেছে, কাঠের বেড়ায় আগুন ধরেছে, দরজা-জানালা চুরমার হ'য়ে কোথায় ছিট্‌কে পড়েছে!

তার খানিক বাদেই জানা গেল, কাগজে জড়ানো বাক্সটির মধ্যে একটি শক্তিশালী বোমা ছিল। তার বিস্ফোরণের ফলেই এই বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটেছে। সুখের বিষয় গোলাবাড়ীর মালিক তখন কি কাজে বাইরে ছিলেন, তাই সে-যাত্রা রেহাই পেয়ে গেছেন।

ডিটেক্‌টিভ্ মহলে হৈ-হৈ প'ড়ে গেল। সারারাত ধ'রে তন্ন-তন্ন ক'রে সব জিনিস-পত্র খোঁজাখুজি করতে লাগল, যদি কোন সূত্র মিলে! ভাঙা গোলাবাড়ীর ডজনখানেক ফটো নেওয়া হ'ল, গোলাবাড়ীর পিছনে যে-সব পায়ের দাগ দেখা গেল তার ছাঁচ তৈরী হ'ল, পথের ওপর মোটর টায়ারের যে চিহ্ন পাওয়া গেল তার মাপ-জোঁক নেওয়া হ'ল। যে বাক্সে বোমাটি ছিল তারও দুই-এক টুক্‌রা কাঠ পাওয়া গেল। পুলিশ যত্ন ক'রে তা'ও কুড়িয়ে নিল; আর এ থেকেই শেষে অপরাধীর সন্ধান মিলল।

ভাঙা বাক্সের টুক্‌রা ক'টি আতস কাচ দিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল, তার গায় যেন অস্পষ্ট লেখার ছাপ পড়েছে। তক্ষুণি পুলিশ-হেড্‌কোয়ার্টারে ফটোগ্রাফারের শরণ নেওয়া হ'ল। সেখানে মাইক্রো-ফটোগ্রাফির সাহায্যে ছবি নিয়ে দেখা গেল, বাক্সের গায় খবরের কাগজে ছাপা একটি সংবাদের উল্টো ছাপ পড়েছে, আর তারই সাথে আছে একটা পেন্সিলের লেখার ছাপ—জে. টমসন্, তা'ও উল্টো! যা হোক্, লেখাটার উদ্ধার ক'রে বুঝা গেল সেই খবরটি ঘণ্টা বারো আগে কাছেই এক খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে। খবরের কাগজের নাম পাওয়া গেল, আর পাওয়া গেল তারই গায় পেন্সিলে লেখা একটি নাম—জে. টমসন্। এর পর বাকীটুকু বা'র করতে ডিটেক্‌টিভ্‌দের আর বেশী বেগ পেতে হ'ল না।

তক্ষুণি তা'রা চ'লে গেল যেখান থেকে খবরের কাগজটি বের হ'য়েছে সেই সহরে। খুঁজে খুঁজে সেই সহরেই টমসন্ নামে এক সাহেবেরও সন্ধান মিলল। এ-ও বেরিয়ে পড়ল যে, এর সাথে গোলাবাড়ীর মালিকের বহুদিন যাবৎ শত্রুতা চলেছে। তাই তা'কে একেবারে শেষ ক'রে দেবার জন্যই এই চেষ্টা!

বেচারা টমসন্। পুলিশের জেরায় প'ড়ে তা'কে সব দোষ স্বীকার করতে হ'ল!

... ...

নিউ ইয়র্কের পুলিশ একবার ক্যামেরার সাহায্যে একজন খুনীর সন্ধান করে। পুলিশের নিকট খবর এল যে, সহরের শেষ-সীমানায় একটি মৃতদেহ প'ড়ে আছে। তৎক্ষণাৎ পুলিশের গাড়ী সেখানে গিয়ে হানা দিল। কিন্তু শুধু মৃতদেহ ছাড়া আর এমন কিছু তাদের নজরে পড়ল না যাতে এ খুনের কোন কিনারা হ'তে পারে। কে যে খুন করেছে আর খুনী যে কোথায় সট্‌কে পড়েছে তার কোন হদিস্ পাওয়া গেল না।

কিন্তু সহজে হাল ছেড়ে দেওয়া ত আর পুলিশের স্বভাব নয়। তাই তা'রা গোপনে গোপনে নানা জায়গায় সন্ধান ক'রে বেড়াতে লাগল। সপ্তাহখানেক পর সন্দেহের বশে একজন লোককে থানায় এনে নানা রকম জেরা করা হ'ল। কিন্তু লোকটিও এমনি সেয়ানা যে, পুলিশ তা'কে জেরা ক'রেও কিছুই বা'র করতে পারল না। হতাশ হ'য়ে তা'রা তার একখানা ফটো তুলে রাখা স্থির করল।

অতি-লাল প্লেটে ছবি তোলা হ'লে পর দেখা গেল, তার টাট্‌কা পাটভাঙা কোটের ওপর অস্পষ্ট কয়েকটা দাগ। ব্যাপারটা কিছুই নয়—খুবই সাধারণ। কিন্তু পুলিশের সন্ধানী চোখের কাছে তা'ও যেন একটা বিশেষ অর্থ নিয়ে দেখা দিল।

লোকটিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। তা'কে আবার থানায় আনা হ'ল। তার ধোপদোস্ত কোট যে এমনতর বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে বেচারী তা' স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। তাই পুলিশের জেরার উত্তরে এবার সে যা' তা' বলতে সুরু করল; শেষ পর্য্যন্ত স্বীকারই ক'রে ফেলল যে, সে-ই খুন করেছে।

লোকটি আরও বলল যে, খুন করবার সময় মৃত ব্যক্তির শরীর থেকে কয়েক ফোঁটা রক্ত ফিন্‌কি দিয়ে এসে তার কোটে লাগে। তক্ষুণি সে তা' পরিষ্কার ক'রে ধুয়েও ফেলে। তারপর ধোপার কাছ থেকে জামাটি ইস্ত্রিও ক'রে আনা হয়। কিন্তু সাদা চোখে যে রক্তের দাগ সম্পূর্ণ ধুয়ে গেছে ব'লে মনে হয়েছিল, ক্যামেরার চোখে যে তা' এমন ক'রে ধরা দেবে সে কি আর তা' বুঝতে পেরেছিল?

... ...

পুলিশের ক্যামেরা যে শুধু অপরাধীকেই খুঁজে বের করে তা' নয়, অনেক সময় নির্দ্দোষ ব্যক্তিকেও বৃথা শাস্তির হাত থেকে রক্ষা করে। একবার একজন স্ত্রীলোক শুধু ক্যামেরার সাক্ষ্যের বলেই স্বামী-হত্যার দায় থেকে মুক্তি পেয়েছিল।

ঘটনাটি এই। মেয়েটির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল যে, সে তার স্বামীকে গুলী ক'রে হত্যা করেছে। মেয়েটি সে অভিযোগ অস্বীকার ক'রে বলে, সে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। তার স্বামী একদিন খুব মদ খেয়ে মাতাল হ'য়ে বাড়ী ফিরে এবং মেয়েটিকে রিভলবারের গুলীতে মেরে ফেলবে ব'লে ভয় দেখায়। এই নিয়ে উঠোনের ওপর স্বামী-স্ত্রীতে খুব খানিকক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়। এরই মাঝে হঠাৎ তার মাতাল স্বামীর হাতের টিপ লেগে পিস্তলের গুলী ছুটে' তার নিজের গায়েই বিঁধে যায়, আর তা'তেই তার মৃত্যু হয়।

বাদী-পক্ষের উকিল এর প্রতিবাদ ক'রে বলেন,—মেয়েটির কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। ভদ্রলোক যখন বাড়ী ফিরেন তখন মেয়েটি ঘরের ভেতর থেকে গুলী ছোঁড়ে। সেই গুলী একটা জানালার সরু তারের জাল ভেদ ক'রে এসে ভদ্রলোকের গায়ে লাগে এবং তা'তেই তাঁর মৃত্যু হয়।

স্বামী-স্ত্রী ছাড়া আর কোন তৃতীয় ব্যক্তি সে-সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিল না। কাজেই মেয়েটির পক্ষে কোন সাক্ষীই ছিল না। ফলে হত্যার অপরাধে তার প্রাণদণ্ড একরকম নিশ্চিত ব'লেই যখন সকলে মনে মনে ধারণা করল, তখন মেয়েটির পক্ষের উকিল আদালতে জুরির সুমুখে একতাড়া ফটো এনে হাজির করলেন। দেখা গেল, প্রত্যেকটি ফটোই এক একটি বুলেটের, এবং একটি ছাড়া আর সব ক'টির গায়েই জালের মত দাগ রয়েছে। মেয়েটির স্বামীর শরীরে যে গুলীটি পাওয়া গেছিল, তা' যে ঘরের ভেতর থেকে ছোঁড়া হয় নি এবং জানালা ভেদ ক'রে আসে নি তা' প্রমাণ করবার জন্যই এ চেষ্টা।

উঠোনে একটা ওক্ কাঠের বোর্ড রেখে মেয়েটির ঘর থেকে তার ওপর পর পর কতগুলো গুলী ছোঁড়া হয় এবং প্রত্যেকটিই তারের জালের ভেতর দিয়ে আসে। মানুষের শরীরের চেয়ে ওক্ কাঠ অনেক বেশী শক্ত, কাজেই তারের জাল দিয়ে আসবার সময় গুলীর গায়ে যদি জালের একটু-আধটু দাগ লাগে তবে শক্ত ওক্ কাঠের ভেতর বিঁধবার সময় তা' একবারে মুছে যাবার কথা। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ফটোতে দেখা গেল, ঘরের ভেতর থেকে ছোঁড়া প্রত্যেকটি গুলীর গায়েই আঁকা-বাঁকা জালের দাগ রয়েছে, অথচ মৃত ব্যক্তির গায়ে যে গুলীটি পাওয়া গেছে তার ফটোতে এমন কোন দাগই নেই। এর দ্বারাই প্রমাণ হ'ল যে, মেয়েটি ঘর থেকে তার স্বামীর গায়ে গুলী ছুঁড়েছিল, এ যুক্তি একেবারেই অচল। জুরীরাও তাই বিশ্বাস করলেন। এভাবে শুধু ক্যামেরার সাক্ষ্যের জোরেই মেয়েটি ফাঁসির হাত থেকে রেহাই পেল। বলা বাহুল্য যে, এখানে ফটো তোলার সময় মাইক্রো-ফটোগ্রাফির সাহায্য নেওয়া হয়েছিল।

... ...

একবার এক ইংরেজ ভদ্রলোক ব্রাজিলের অধিবাসী আর এক ভদ্রলোককে হত্যা করার অপরাধে অভিযুক্ত হন। খোঁজ ক'রে জানা গেল, কিছুদিন ধ'রে এই দুই ভদ্রলোকের মধ্যে ভীষণ মনোমালিন্য চলছিল এবং তার ফলে প্রায়ই ঝগড়াঝাটি হচ্ছিল।

ঘটনার দু'এক দিন আগে তাঁদের আবার ভাব হয় এবং তাঁরা একটা নৌকো ক'রে একসাথে সমুদ্রে বেড়াতে যান। নৌকোটি যখন ফিরে এল, তখন দেখা গেল ব্রাজিলের ভদ্রলোক আর বেঁচে নেই। ইংরেজ ভদ্রলোক বল্লেন, তাঁর সঙ্গীটি পালের দড়ি খাটাবার জন্য মাস্তুলের আগায় উঠেছিলেন, সেখান থেকে পা ফস্‌কে প'ড়ে গিয়েই তাঁর মৃত্যু ঘটেছে।

নৌকোয় মাঝি বা আর কোন আরোহী ছিল না। কাজেই পুলিশ সহজে এ কাহিনী বিশ্বাস করতে চাইল না। তার ওপর তাদের দু'জনের মধ্যে দু'তিন দিন আগ পর্য্যন্ত ঝগড়া-বিবাদ চলেছে! তা' ছাড়া নৌকোর একটা ভারী দাঁড়ও নৌকা থেকে অদৃশ্য হয়েছে! কাজেই পুলিশের সন্দেহ আরও দৃঢ় হ'ল।

পুলিশেরা বলল, নৌকোয় হয়ত আবার দু'জনের মধ্যে পুরাণো ঝগড়া মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ফলে মারামারি হয় এবং ইংরেজ ভদ্রলোক নিশ্চয় দাঁড়ের আঘাতে সঙ্গীটিকে শেষ ক'রে দাঁড়টি সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে এসেছেন। ডাক্তারেরাও মৃতদেহ পরীক্ষা ক'রে বললেন, মাথায় কোন ভারী জিনিসের চোট্ পেয়েই ভদ্রলোকের মৃত্যু হয়েছে। আর এও অসম্ভব নয় যে, দাঁড়ের আঘাতই এই মৃত্যুর কারণ। ইংরেজ ভদ্রলোকও দাঁড়টি হারানো সম্বন্ধে কোন সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে পারলেন না। কাজেই সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণই তাঁর বিরুদ্ধে গেল। এমন সময় দৈবক্রমে একটা খবরের কাগজে প্রকাশিত একখানা ছবি মামলার গতি একেবারে ফিরিয়ে দিল।

নেহাৎই দৈবের ব্যাপার। যেখানে এই ঘটনাটি ঘটে তারই নিকটবর্ত্তী এক বন্দরে একখানা যাত্রী-বাহী জাহাজ কিছুক্ষণের জন্য নোঙর ক'রে থাকে। জায়গাটির প্রাকৃতিক দৃশ্যে মুগ্ধ হ'য়ে একজন যাত্রী তার একখানা টেলিফটো তোলেন এবং তাই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সেই ফটোতে নৌকোর ছবিটিও উঠেছিল এবং ব্রাজিলের ভদ্রলোক যখন মাস্তুলের আগা থেকে প'ড়ে যাচ্ছিলেন ফটোটিও ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই তোলা হয়েছিল! আদালতে ব্যারিষ্টারদের খই-ফোটানো বক্তৃতায় যা' হয় নি, ক্যামেরার এক নীরব সাক্ষ্যেই তার চেয়ে বেশী কাজ হ'য়ে গেল। ইংরেজ ভদ্রলোক খালাস পেলেন।

... ...

একবার এক রাজমিস্ত্রী কোন এক বীমা কোম্পানীকে ঠকিয়ে বেশ কিছু মোটা টাকা আদায়ের ফন্দী করে। কিন্তু ক্যামেরার চোখে বেচারার ফাঁকি ধরা প'ড়ে যাওয়ায় তা'কে কিভাবে সে আশায় নিরাশ হ'তে হয়েছিল সে-কথাই বলছি।

রাজমিস্ত্রীটি বীমা কোম্পানীতে বেশ মোটা টাকার একটি দুর্ঘটনা-বীমা করে। বীমার চুক্তি এই ছিল যে, কোন কারণে যদি তার শরীরের কোন অঙ্গ বিকল হ'য়ে সে তার কর্ম্মক্ষমতা হারায়, তা' হ'লে কোম্পানী তা'কে বীমার সমস্ত টাকা দিতে বাধ্য থাকবে।

বীমা করবার কয়েক মাস পরই মিস্ত্রীটি কোম্পানীকে জানায় যে, কাজ করতে করতে হঠাৎ একদিন দোতলা থেকে প'ড়ে গিয়ে তার ডান হাতে এমন আঘাত পেয়েছে যে, হাতটি চিরদিনের জন্য একেবারে অকেজো হ'য়ে গেছে। খবর পেয়েই কোম্পানীর ডাক্তার এসে লোকটির হাত পরীক্ষা ক'রে দেখেন, তার হাত ভাঙ্গা দূরে থাক, সামান্য একটু কাটার দাগ ছাড়া তার হাতে আঘাতের আর কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। কিন্তু রাজমিস্ত্রীটি বার বারই বীমার টাকার জন্য কোম্পানীর ওপর চাপ দিতে লাগল। তার যুক্তি হচ্ছে এই যে, তার হাতে এমন চোট্ লেগেছে যে, সে অতিকষ্টে তার হাত একটু-আধটু নাড়াচাড়া করতে পারে, এ দিয়ে ভারী কোন কাজ করা তার পক্ষে অসম্ভব।

উপায় না দেখে বীমা কোম্পানী পুলিশের শরণ নিল। একজন ডিটেক্‌টিভ্ তার ছোট্ট টেলি-ক্যামেরাটি নিয়ে মিস্ত্রীর বাড়ীর আশে-পাশে ঘুরতে লাগল। দেখা গেল, মিস্ত্রীটি বাইরে সবার নিকটই এমন ভাব দেখায় যে, তার হাতটি সত্য সত্যই অকেজো। ডিটেক্‌টিভটি কিন্তু এতে দমে' না যেয়ে সুযোগের প্রতীক্ষা করতে লাগল।

শেষে একদিন সে সুযোগ মিলেও গেল। সেদিন রবিবার। মিস্ত্রী তার বাড়ীর পেছনের বাগানে একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে সের পাঁচেক ওজনের একটা হাতুড়ি ঠুকে' মোটা মোটা ডাল পুঁতে বাগানের বেড়া মেরামত করছিল। তার হাত সত্যিই অকেজো হ'লে এমন ভারী হাতুড়ি নিয়ে এভাবে কাজ করা তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হ'ত।

ডিটেক্‌টিভ্ তার ক্যামেরা নিয়ে ওৎ পেতেই ছিল। সে চট্‌পট্ রাজমিস্ত্রীর হাতুড়ি-পেটার খান কয়েক ছবি তুলে ফেলল। বেচারী রাজমিস্ত্রীর সব চালাকি ভেস্তে গেল।

এভাবে কত জটিল ব্যাপারে যে ক্যামেরা আজকাল নিপুণ গোয়েন্দাগিরির পরিচয় দিচ্ছে, পুলিশের কাজে ক্যামেরা যে কত বড় বন্ধুর কাজ করছে তা' আর ব'লে শেষ করবার নয়। এই একচোখওয়ালা যন্ত্রটি আজকাল চোর-ডাকাত-বদমাসদের কাছে একেবারে যমের দোসর হ'য়ে উঠেছে!

একঘণ্টার অবসরে-

কে কে যাবি আয় রে তোরা ঐ সুদূরের গাঁয়

শ্রীগৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

ভোর হ'ল রে নতুন স্বপন নীল-গগনের গায়,
আয় রে সবে আয়—
কে কে যাবি আয় রে তোরা ঐ সুদূরের গাঁয় !
পূব আকাশে তরুণ রবি
আঁকলো রে ঐ নতুন ছবি,
প্রাণের সাড়া বিছিয়ে দিল ধানের আঙিনায় ;
আয় রে সবে আয়—
কে কে যাবি আয় রে তোরা ঐ সুদূরের গাঁয় !

হিজল-বনের ডালে ডালে ডাহুক-শ্যামা গায়,
আয় রে সবে আয়—
কে কে যাবি আয় রে তোরা ঐ সুদূরের গাঁয় !
ফুল-ফোটান বাতাস এলো
কোন্ গানে আজ এলোমেলো,
শিউলী-বকুল সরম-ভরে যায় রে ঝরে' যায়,
আয় রে সবে আয়—
কে কে যাবি আয় রে তোরা ঐ সুদূরের গাঁয় !

পার হ'ব ঐ মাঠের শেষে, খেয়া-ঘাটের নায়,
আয় রে সবে আয়—
কে কে যাবি আয় রে তোরা ঐ সুদূরের গাঁয় !
ছোট নদী আপন তানে
কোথায় ছোটে কে তা জানে,
দু'তীরে তার কাশের সারি দুলছে পূবের বায় ;
আয় রে সবে আয়—
কে কে যাবি আয় রে তোরা ঐ সুদূরের গাঁয় !

এমন দিনে আজকে ওরে ঘরে থাকাও দায়,
আয় রে সবে আয়—
কে কে যাবি আয় রে তোরা ঐ সুদূরের গাঁয় !
পথখানি আজ পরাগ-ঝরা
শিউলী ফুলের গন্ধ-ভরা,
গুন্-গুনিয়ে সুর শুনিয়ে গন্ধে অলি ধায় ;
আয় রে সবে আয়—
কে কে যাবি আয় রে তোরা ঐ সুদূরের গাঁয় !

মেঘের ভেলা ঐ যে ভাসে নীলিম নীলিমায়,
আয় রে সবে আয়—
কে কে যাবি আয় রে তোরা ঐ সুদূরের গাঁয় !
জাগল দোলা বেতস-বনে,
মরাল চরে আপন মনে
পানায় ঢাকা বিলের বুকে বেণু-বনের ছায় ;
আয় রে সবে আয়—
কে কে যাবি আয় রে তোরা ঐ সুদূরের গাঁয় !

নীল আকাশে তন্দ্রাহারা তারারা ঐ চায়,
আয় রে সবে আয়—
কে কে যাবি আয় রে তোরা ঐ সুদূরের গাঁয় !
ধানের ক্ষেতে ঢেউয়ের দোলা,
বাতাস এলো আপন ভোলা
সঙ্গোপনে মধুর তানে মন্দ নীরব পায় ;
আয় রে সবে আয়—
কে কে যাবি আয় রে তোরা ঐ সুদূরের গাঁয় !

বার্ষিক পরীক্ষার আগে, মধ্যে ও পরে

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত, এম. এ., বি. টি.

(আগে)

পড়ার ঘরে

এই ত পরীক্ষা ঘনিয়ে এল; কিছুই পড়া হয় নি। বাবাকে কত ক'রে বলেছিলাম একজন টিউটর রেখে দিতে। তা কিছুতেই রাজি হ'লেন না। কেন? আমার বেলায়ই বাবার যত হিসেব—আর ছোড়্দি'র? এই ত সেদিনও বাবা একটা নতুন কাপড় কিনে এনে দিলেন। দাম বল্লেন—পনের টাকা! এই পনের টাকায় কি আমার স্কুলের একজন মাষ্টার মশায় আমাকে পড়াতে পারেন না?

আর মনও হয়েছে তেম্নি ছাই! যা-কিছু পড়ি, পরক্ষণেই ভুলে যাই। কাল রাত্তিরে এত ক'রে, ভূগোলের পড়াটা ঠিক করলাম, কিন্তু সকালে উঠে বইটা হাতে নিয়ে দেখি একেবারে কিচ্ছুই মনে নেই। সব একেবারে হিজিবিজি!

কি করি? সেদিন বটা বলেছিল ওর মাষ্টার মশায় নাকি বলেছেন, ভোরে উঠে' ঠাকুরকে প্রণাম ক'রে পড়া আরম্ভ করলে পড়া খুব ভাল হয়। এই ত আজ ক'দিন ধ'রে ভোরে উঠে' মা কালীর মন্দিরে গিয়ে একবার ক'রে ধন্না দিচ্ছি—কৈ কিছুই ত হচ্ছে না। হে মা কালী, বাবা হরি, সিদ্ধিদাতা গণেশ!—এবারকার মত পরীক্ষাটায় উৎরে যেতে পারি, তবে আগামী বছর প্রথম থেকে ঠিক মত পড়ব। মাষ্টার মশায়দের আর কখনও ফাঁকি দেব না।

অ্যাঁ, মাষ্টার মশাই! তাই ত, কাল বৈকালে রাস্তায় পার্ব্বতী স্যারএর সঙ্গে দেখা। তাঁকে নমস্কার দেই নি! সারলে রে সারলে! পার্ব্বতী স্যার নাকি আবার নেবে ইংরাজির কাগজ।—মনেও থাকে না। পঞ্চা সেদিন বারবার ব'লে দিল—'দেখ্, পরীক্ষা ঘনিয়ে এলে—মাষ্টার মশায়দের দেখলেই নমস্কার করতে হয়।' তাই ত এমন ভুলটা হ'য়ে গেল! একে আমি টার্ম্মিনাল পরীক্ষায় ইংরাজিতে করেছি ফেল, তার ওপর কাগজ পড়বে পার্ব্বতী স্যারএর কাছে। নমস্কার দেই নি—নির্ঘাত ফেল।

তাই ত, এতক্ষণ যে কিছুই পড়ি নি—"অ্যা—এলিজাবেথের রাজত্বকালে ইংলণ্ডে—এলিজাবেথের রাজত্বকালে ইংলণ্ডে……"

বাবা আমাকে বলেছেন পরীক্ষায় ভাল করতে পারলে, আমাকে বিলেত পাঠাবেন। কী মজাটাই হবে। ছোড়দিটা আবার এখানে পড়ে। আমি ঠিকমত পড়ব। সব ঠিকমত মনে রাখব। ছোড়দির বিয়ে হ'য়ে যাবে—ওর বরকে আচ্ছা ক'রে কান মলতে হবে। ইস্, কাল কবির স্যারএর কানমলাটা বড্ড বেশী লেগেছিল। পারি নাই সামান্য একটু গ্রামার। তারই জন্য—ইস্ কানটা আজও একেবারে লাল হ'য়ে আছে!

পরীক্ষার আগে—পড়ার ঘরে!

দূর ছাই, ইতিহাসটা একটুও ভাল লাগে না। তাই ত জিউমেট্রিটা যে একবারে কিচ্ছুই হয় নি! তাই পড়া যাক্।

এই যে খাতা, পেন্সিল? পেন্সিল কোথায় গেল? এই ছোড়দি, ছোড়দি, মুখপুড়ি, গামলামুখী, গন্নাকাটা বুড়ী—তুই আমার পেন্সিল নিয়েছিস্ কেন? আমার এখন এক মুহূর্ত্তও সময় নেই নষ্ট করার। হতভাগী সাড়াও যে দেয় না। যাই দেখি পেন্সিলটা নিয়ে আসি গে।

(মধ্যে)

পরীক্ষার হলে

এই ত মোটে প্রথম 'ওয়ার্নিং-বেল' দিল। আর একটু বইটা দেখি। ইস্, এই যে মুঘল-সাম্রাজ্যের পতনের কারণ—এটা নিশ্চয়ই আসবে। স্যার বলেছিলেন, 'মোষ্ট ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট।' এটা যা পড়েছি—একেবারে—। আর একবার ঝালাই ক'রে নিই। মা কালী, সিদ্ধিদাতা গণেশ, হরি, হরি—সব পরীক্ষাগুলো এক রকম মন্দ হয় নি। আজই শেষ। আর কখ্খনও ফাঁকি দেব না। ঐ যে স্যার—প্রশ্ন নিয়ে 'হলে' ঢুকে পড়লেন। অ্যাঃ, কি বলছেন—খাতা বই সব টেবিলে এখ্খুনি রেখে দিতে হবে!

কিচ্ছুই ত হ'ল না।—'দুর্গা, গণেশ, বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা, মা কালী! হে মসজিদের আল্লা, গির্জ্জার যিশু!'

(প্রশ্ন হাতে) একটা প্রশ্নও যে পারি না—কিছুই ত বুঝি না। হায় হায়, কি হবে! সময় মোটে তিন ঘণ্টা। এই ত এই যে "মুঘলদের পতনের কারণসমূহ লিখ"। কেল্লা মার দিয়া, এইবার আরম্ভ করতে হবে। আগে নিবটা ঠিক ক'রে নিই। নাম, রোল-নম্বর, সেক্সন লেখা হ'ল। এইবার খাতার ওপরে আগে একটা কিছু লিখে নিই। কি লিখব?—কাল লিখেছিলাম "God is good", পরশু লিখেছিলাম "হরি হে তুমিই সত্য।" আজ? আজ লিখি—"মা কালি, দেখব তুমি সত্য কি না। সত্য হ'লে আমি পরীক্ষায় পাশ করব।"

এইসা কলম চালাব। বিভুদানবাবুর সাধ্যি থাকবে না আমায় ফেল করেন।

(পরে)

ফল জানবার পূর্ব্বে

এই ত ইংরাজি প্রশ্ন। এই প্রশ্নটায় না হয় দশের মধ্যে আমাকে আট নম্বরই দিল। আচ্ছা যাক, ছয় দিল।—এটা ভাল হয়েছে, এটায় নিশ্চয়ই দশই পাব। তা হ'লে মোট কত দাঁড়াল? পাঁচ আর ছয় হ'ল এগার আর চার পনের আর নয় চব্বিশ, চব্বিশ আর আট বত্রিশ, বত্রিশ আর দশ—বিয়াল্লিশ। ঠিক পাশ। যাই দেখি, প্রণব বলেছে আজ পার্ব্বতী স্যারএর কাছে নম্বর জানতে যাবে। না, এই পরিষ্কার কাপড়টা প'রে যাব না, ঐ ময়লা কাপড়টা প'রে যাব। আর ঐ ছেঁড়া সার্টটা গায় দিয়ে যাব। মাষ্টার মশায়দের মন বড় দয়ালু। গরীব দেখলে, মলিন দেখলে তাঁদের দয়া হবে বেশী। যদিই বা দুই-চারটা নম্বর টানও থাকে—একেবারে পায়ে প'ড়ে— আবার শুনছি, হেডমাষ্টার নাকি নোটিশ দিয়েছেন—'যে পরীক্ষার নম্বর জানতে যাবে, তার মার্ক কাটা যাবে।' কি করি? এক কাজ করা যাক, স্যারএর বাড়ী গিয়ে এমনি আলাপ করব। স্যার নিশ্চয়ই আপনা থেকে আলাপ করবেন। পাশ করলে তাঁর মুখে হাসিই দেখা যাবে। প্রণব বলল, ও নাকি পাশ করেছে। প্রণব পাশ করলে আমিও নিশ্চয় পাশ করব।

ইস্, বেলা যে নয়টা বাজে! স্যার নিশ্চয়ই এতক্ষণে খাতা দেখে উঠে খড়ম পায়ে দিয়ে হুঁকোটি হাতে নিয়েছেন! তা হ'লে এইবার যাই।

জড়ের গঠন-বিন্যাস

অধ্যাপক ডাঃ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, ডি. এস্-সি., পি. আর. এস্.

জড় কাহাকে বলে তাহা তোমরা জান। যাহাদের চেতনা নাই, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যাহাদের দৈহিক পরিবর্ত্তন, পরিপুষ্টি ও পরিবর্দ্ধন সংসাধিত হয় না, তাহারাই জড় বলিয়া খ্যাত।

চক্ষু, কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জড়ের স্ব স্ব রূপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমরা ইহাদিগকে কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকি। কিন্তু এইপ্রকার শ্রেণীবিভাগ কোন সুদৃঢ় যুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত নহে। বরফ, জল ও জলীয় বাষ্প—জলের এই তিন রূপের সহিত তোমরা সকলেই পরিচিত। বিজ্ঞানীরা বহু পরীক্ষায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তাপশক্তির প্রভাবে জড়ের উক্ত রূপান্তর সম্ভবপর হয়। একই পদার্থ তাপশক্তির ক্রিয়ায় কখনও গ্যাসীয়, কখনও তরল আবার কখনও বা কঠিন অবস্থাপন্ন হইতে পারে। সুতরাং পদার্থের বাহ্যরূপে বিশ্বাস করিয়া তাহাদের শ্রেণীবিভাগ করা যুক্তিসঙ্গত হয় না। শ্রেণীবিভাগে পদার্থের অন্তর্নিহিত এমন কোন গুণ বিবেচনা করিতে হইবে যাহা তাহার কঠিন, তরলাদি অবস্থাত্রয়ে অক্ষুণ্ণ থাকিবে। এই গুণ বিভিন্ন পদার্থে বিভিন্ন হইয়া তাহাদের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য নির্দ্দেশ করিবে। এই সন্ধানেই সর্ব্বপ্রথমে রাসায়নিক বিজ্ঞানীগণ জড়ের গঠন-বিন্যাসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। তাহাতেই গড়িয়া উঠিয়াছে বর্ত্তমান রসায়ন-বিজ্ঞান।

ঋষি কণাদ প্রচার করেন—

জড়ের গঠন-প্রণালীর আলোচনা অল্পকালের প্রসঙ্গ নহে। খৃষ্টের জন্মের এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় ঋষি কণাদ প্রচার করেন যে, জড়মাত্রেই অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমধর্ম্মা কণার সংহতিতে সমুৎপন্ন। ইটের উপর ইট সাজাইয়া যেমন নানাপ্রকার ইমারত প্রস্তুত হয়, জড় মাত্রেই সেইরূপে

কণার সাহায্যে গঠিত। কণাসকলের মধ্যে ফাঁক বা অবকাশ থাকার জন্যই পদার্থের গঠন সাবকাশ। কণাদের এই মত কোনপ্রকার পরীক্ষালব্ধ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। সেইজন্য উহা তেমন লোকপ্রিয় হয় নাই। কিন্তু বহুকাল পরে বৌদ্ধযুগে এই মতবাদ অতিশয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ইউরোপে প্রচারিত হয়। গ্রীক দার্শনিক লিউকিপাস ও তাঁহার শিষ্য ডিমোক্রিটাস্ যে কণাবাদ প্রচার করেন, তাহাও বৌদ্ধভাবে প্রভাবিত কণাদের মত বলিয়াই অনেকে মনে করেন। যাহা হউক, ক্রমে গ্রীসদেশে নানাপ্রকার কণাবাদ প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু পরীক্ষিত সত্যে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় ইহাদের একটিও পণ্ডিত-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে যখন পরীক্ষাগারে বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রথম সূত্রপাত হইল, তখনই কণাবাদ পরমাণুবাদরূপে ন্যায়সঙ্গত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল।

পরমাণুবাদ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত নহে। পরমাণু চক্ষে দেখা যায় না। এমন কোন যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নাই যাহাতে পরমাণু দৃষ্ট হইতে পারে। সাধারণ জলপৃষ্ঠ কত মসৃণ; অথচ পরমাণুর সংহতিতে গঠিত হওয়ায় উহাও সাবকাশ। একটি ক্ষুদ্র কস্তুরীখণ্ড ঘরে রাখিয়া দিলে, তাহার গন্ধে চারিদিক আমোদিত হয়। কস্তুরীর কণাসমূহ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়াতেই এরূপ সম্ভব হয়। ইহা ত চক্ষুর গোচর হয় না। পদার্থের পরমাণু কত সূক্ষ্ম তাহা ইহা হইতেই অনুমেয়। পরমাণুর প্রসার সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রীক প্রণালীতে নিম্নবর্ণিত জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়। বিশুদ্ধ সীমার একটি ঘন লওয়া হউক, যাহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা প্রত্যেকই ১০ সেণ্টিমিটার। এই
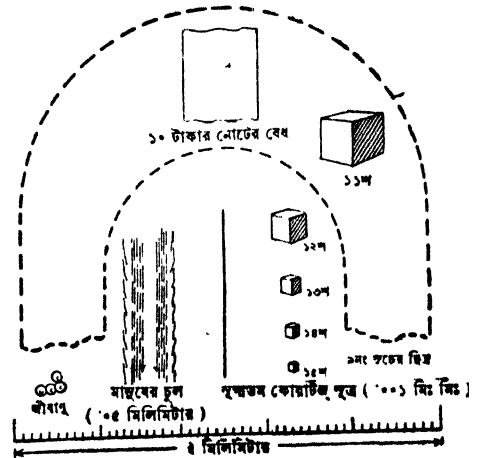
ঘনটি এইভাবে ত্রিমাত্রায় ছেদ করিতে হইবে যে, বিচ্ছিন্ন নূতন ঘনটির দৈর্ঘ্যাদি মাত্রা আদিম ঘনটির অর্দ্ধেক—অর্থাৎ ৫ সেণ্টিমিটার। সুতরাং ইহা আয়তনে আদিম ঘনটির $\frac{১}{৮}$ অংশ মাত্র। এখন এই বিচ্ছিন্ন নূতন ঘনটিকে পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়ায় পুনরায় ছেদ করিলে যে দ্বিতীয় ঘন হইবে তাহার আয়তন আদিম ঘনের $\frac{১}{৮} \times \frac{১}{৮} = \frac{১}{৬৪}$ অংশ হইবে। এই ভাবে বিচ্ছিন্ন করিতে করিতে নব নব ঘন প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, কিন্তু তাহাদের আয়তন অতি দ্রুত হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তৃতীয় ঘনটির আয়তন আদিম ঘনটির প্রায় $\frac{১}{৫১২}$ অংশ হইবে।

কিন্তু বিজ্ঞানীগণ পরমাণুর যে আকার মানসনেত্রে অবলোকন করেন, তাহার আয়তন এত ক্ষুদ্র যে, পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়ায় অষ্টাবিংশ ছেদনে যে ঘন পাওয়া যাইবে তাহা সীসার পরমাণুর আয়তনের তুল্য হইবে। চিত্রে ছেদন প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত একাদশ হইতে পঞ্চদশ ঘন প্রদর্শিত হইল ও তুলনার নিমিত্ত একই স্কেইলে অঙ্কিত কয়েকটি পরিচিত বস্তুর চিত্রও প্রদর্শিত হইল। ইহাদের তুলনা হইতেই পরমাণু কত ক্ষুদ্র তাহা তোমরা অনুমান করিতে পারিবে।

বিজ্ঞানী বুদ্ধি প্রভাবে যে সকল পরীক্ষণ-যন্ত্র উদ্ভাবিত করিয়াছেন তাহারা আমাদের ইন্দ্রিয় সমূহকে যথেষ্ট সাহায্য করিলেও তাহাদের সহায়তায় পর্য্যবেক্ষণেরও একটা সীমা আছে। রাসায়নিকের তুলাযন্ত্র এমত বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই যে, তাহার সাহায্যে নবম ঘনটির গুরুত্ব নির্ণয় করা যাইতে পারে। সূক্ষ্মতম গুরুত্ব নির্দ্দেশক তুলাযন্ত্রেও যদি এক সেরের এক সহস্র কোটি অংশ পর্য্যন্ত পরিমাপ করা চলে তবুও তাহা চতুর্দ্দশ ঘনটির ভার নির্ণয়ে সমর্থ হইবে না। এরূপ ক্ষুদ্র বস্তুর অস্তিত্ব কেবলমাত্র বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা যায়।

তৃতীয় চিত্রে সপ্তদশ হইতে একবিংশ ঘন পর্য্যন্ত আপেক্ষিক আকৃতি ও আয়তন প্রদর্শিত হইল। জলের উপর তৈলেব যে স্তর পড়ে তাহার বেধ ও সেই তুলনায় আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য কত বৃহৎ তাহাও এই চিত্রে প্রদর্শিত হইল। আলোক-তরঙ্গ কখনও দৃষ্টিগোচর হয় না। সুতরাং একবিংশ ছেদনের পরও আমরা যে পরমাণু হইতে বহুদূরে রহিয়াছি, তাহা কত ক্ষুদ্র ?

চতুর্থ চিত্রে ষড়বিংশ ঘন ও তাহার অভ্যন্তরস্থ পরমাণু সমূহ প্রদর্শিত হইল। হিসাবে যদি অষ্টাবিংশ ছেদনে পরমাণু পাওয়া যায় তাহা হইলে এই ঘনটিতে ৬৪টি পরমাণু রহিয়াছে। পরমাণুর আকার পদার্থভেদে বিভিন্ন। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সিজিয়ম পরমাণু ও সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র অঙ্গার পরমাণুর তুলনায় সীসার পরমাণু কিরূপ হইবে তাহাও এই চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে।

চিত্রে অঙ্কনের সুবিধার জন্য পরমাণুগুলি বর্ত্তুলাকার প্রদর্শিত হইলেও, সাধারণতঃ তাহারা ঐরূপ নহে। নানা কারণে ইহাদের আকৃতির পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। সীসার অভ্যন্তরে তাহার পরমাণু যে প্রকার ব্যবধানে অবস্থিত, আদিম ঘনটির সমস্ত পরমাণু পরস্পর তদ্রূপ ব্যবধানেই শৃঙ্খলাকারে সজ্জিত করিতে পারিলে প্রায় ৬০ হাজার কোটি মাইল দীর্ঘ হইবে। ইহার একপ্রান্তের প্রজ্বলিত আলো অপর প্রান্ত হইতে দৃষ্টিগোচর হইতে প্রায় এক বৎসর সময় অতিবাহিত হইবে।

এইভাবে পরমাণুর সংহতিতেই মূলতঃ সমস্ত জড়পদার্থের উৎপত্তি। এই সকল পরমাণু কখনই স্থির নহে। পরমাণুর চাঞ্চল্য হইতেই জড়ে তাপ উৎপন্ন হয়। বাহির হইতে তাপ প্রয়োগে ভিতরের চাঞ্চল্য বাড়াইয়া দিলে কঠিন পদার্থের পরমাণুর পরস্পর ব্যবধান বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অবশেষে এক বিশিষ্ট উষ্ণতায় পদার্থটি গলিয়া যায় ও তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ঐ তরলকে আরও উত্তপ্ত করিলে পরমাণুর চাঞ্চল্য আরও বাড়িতে থাকে ও অবশেষে গ্যাসীয় পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জন্যই বরফ কোনও পাত্র ব্যতীতও ধারণ করা যায়, জল ধারণ করিতে পাত্র প্রয়োজন। কঠিন অবস্থায় পদার্থের পরমাণুর মধ্যে সংহতি ও পরস্পর প্রীতি বিদ্যমান। তাপবৃদ্ধিতে সেই সংহতি ও প্রীতি দূর হইয়া তাহাদের ব্যবধান বাড়িতে থাকে ও গ্যাসীয় অবস্থায় যেন ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইয়া যাইতে চায়।
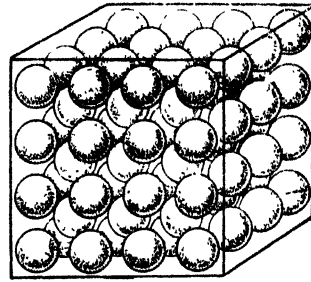
২৬শ

ঘন—সীসার পরমাণুর বিন্যাস

কঠিন পদার্থের পরমাণুসমূহ অতিশয় শৃঙ্খলায় অবস্থিত থাকে। ইহাদের পরস্পর ব্যবধান অক্ষুণ্ণ থাকে বলিয়াই এরূপ সম্ভব হয়। তরলাবস্থায়ও শৃঙ্খলা একেবারে নষ্ট হইয়া যায় না। কিন্তু গ্যাসীয় অবস্থায় পূর্ণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। পদার্থের নানাপ্রকার পরিবর্ত্তনেও রাসায়নিক ক্রিয়ায় উহার পরমাণু অব্যাহত থাকে। অক্সিজেনের দুই পরমাণু ও হাইড্রোজেনের এক পরমাণু সংবদ্ধ হইয়া জলের অণু হয়। কিন্তু জলে ঐ দুইটি পদার্থ তাহাদের সত্তা একেবারে হারায় না। কারণ জল হইতে উহাদের পুনরুদ্ধার সম্ভবপর।

এই ভাবে নানাপ্রকার পরমাণুর সমবায়ে আমাদের দৃশ্যমান্ জড়জগৎ সমুৎপন্ন। বিজ্ঞানীগণ এ যাবৎ ৯৩ প্রকার পরমাণুর সন্ধান পাইয়াছেন।

বাঙ্‌লা মা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

একেকবার ভাই, মনে কি হয় জানিস্?
—বাঙ্‌লা আমার সত্যিকারের মা!
তোরা হয়তো মিথ্যা ব'লে মানিস্,
ভাবিস্—এটা নিছক কল্পনা!

কবে যে মোর মা গিয়েছেন ম'রে—
তা'তো তোদের জানাই সবার আছে।
বল্‌তো—তবু চল্‌ছে কেমন ক'রে?
ক্ষুধার অন্ন জুট্‌ছে কাহার কাছে!

শুধু কেবল ক্ষুধার অন্ন নয়,
তৃষার বারি কার কাছে, বল্, পাই?
আকাশ বাতাস স্নেহের পরিচয়
নিত্য যে দেয়, তাঁরই তো সব্ ভাই!

নিত্যি দেখি, দশহাতে তাঁর দান,
দশটি হাতে আগ্‌লে আছেন ধ'রে;
তাঁরই দয়ায় বাঁচে যে এই প্রাণ,
বল্ তো—তোরা ভুলিস্ কেমন ক'রে?

একেক সময়, বলব কি হয় মনে?
যোগ্য ছেলে আমরা মায়ের নই,
গুণের শেষ যে পাইনে তাঁহার গণে',
তবু কেন আমরা এমন হই!

মনে ভাবি, কি ক'রে এই মাকে
বসাই আবার সোনার সিংহাসনে,—
রাজার রাণী ক'রে আবার তাঁকে
দেশ-বিদেশে দেখাই জনে-জনে!

দেহের রক্ত দিতেও যদি হয়,
আমি তো ভাই, এক্ষুণি হই রাজি,
মার কাছে তা জানি কিছুই নয়,
যা-কিছু মোর দিতেই পারি আজই।

তোদের সবার ধরছি দু'টি পায়ে,—
আমার সঙ্গে আয় না সবাই আজ,
তাঁরই পুজোয় মিল্‌ব ভায়ে-ভায়ে—
আজকে হ'তে তাই যেন হয় কাজ!

কারসাজি

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

দত্তমশায়—সাতকড়ি মুখুয্যের মুহুরি বিপ্রদাস দত্ত—কাজে এসেছেন সেই বেলা এগারোটায়। এখন বাজ্‌ল রাত সাড়ে সাতটা।

তাঁর সাম্‌নে কাঠের হাত-বাক্‌স, তার ওপর খেরো-বাঁধানো মোটা খাতাখানা খোলা; ডান পাশে সীসের দোয়াত, হাতে হাঁসের পালকের কলম। হারিকেনটা ছিল সাম্‌নে খানচারেক পুরোনো পাঁজির ওপর একখানা পুরু পিচবোর্ডে বসানো। তেলটা খারাপ, পল্‌তেটাও সম্ভবতঃ কয়দিন কাটা হয় নি। তাই আলোর চেয়ে ধোঁয়ার প্রাচুর্য্য বেশি। চিম্‌নিটা ঝাপ্‌সা হ'য়ে এসেছে।

দত্তমশায় পল্‌তেটা একবার কমিয়ে আবার তখনই অনেকটা উস্কে দিলেন। ফলে প্রচুর ধোঁয়া বার হ'য়ে চিম্‌নিটার ভেতর ঘুরপাক দিয়ে শিখাটাকে আরও ঢেকে ফেল্‌ল। দত্তমশায় তাড়াতাড়ি পল্‌তেটা কমিয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে ভাব্‌লেন, চাকরটাকে ডাক্‌বেন কিনা।

কিন্তু আর কতটুকু সময়ই বা কাজ কর্‌বেন? রাত হ'য়ে এসেছে। তার ওপর ঝুপ্‌ঝুপ্‌ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে। বেশি দেরি কর্‌লে আবার সঙ্গী পাবেন না। সেখান থেকে তাঁকে বাড়ী যেতে পথ ভাঙতে হবে পাকা এক ক্রোশ।

দত্তমশায়ের হাতে তখন ভুলি দাসীর আড়াই বছরের হিসেব।

কর্ত্তার ভাগ্নে মহিম এসে বল্‌ল—"বিপ্রদাসবাবু, এই অঙ্কটা কষে' দিন না, কিছুতেই মিল্‌ছে না।"

—"যা—যা এখন।"

—"আপনার ছুটি পায়ে পড়ি। না হ'লে কাল মার খাব।"

—"কাল কষে' দেব—"

—"না, বিপ্রদাসবাবু, আপনার—"

—"রোজ কাজের সময় এসে গোলমাল!"

মহিম ফরাসে উঠে' শ্লেটখানা দত্তমশায়ের বাক্সের ওপর রেখে অনুনয়ের সুরে বল্‌ল—"দিন—দিন—"

—"কি অঙ্ক ? পাটীগণিত কই ? কি বল্‌ছে দেখি—'এক মহাজন একটা চাষীকে বাৎসরিক সাত টাকা হার সুদে সাতাশী টাকা ধার দিল। চাষী তাহাকে তিন বৎসর পরে বাকী সুদে ও আসলে দিল এক শত টাকা সাড়ে পাঁচ আনা। তাহা হইলে মহাজনটি চাষীর কাছ হইতে ইতিমধ্যে কতটাকা সুদ পাইয়াছিল ?' এ ত খুব সোজা অঙ্ক রে! প্রথমে বার করতে হবে—".

শ্লেটখানা দত্তমশায়ের বাক্সের ওপর রেখে…

বাইরে খড়মের আওয়াজ হ'তে লাগ্‌ল—খট্ খট্। মহিম চট্ ক'রে শ্লেট ও পাটীগণিত তুলে নিয়ে নিঃশব্দে অদৃশ্য হ'ল। দত্তমশায়ও সুদ গুণতে লাগ্‌লেন।

কর্ত্তা ঘরে ঢুকেই হাঁক্‌লেন—"কেদার—কেদারে—"

কেদার সাড়া দিয়ে একটু পরেই ঘরে ঢুক্‌ল। তার বাঁ হাতে হুঁকো, ডান হাতে কল্‌কে। কল্‌কেটায় সে ফুঁ দিতে দিতে আস্‌ছিল। কল্‌কের তলা দিয়ে তূলোর পাঁজের মত ধোঁয়া বা'র হচ্ছে, তার একটু উড়ে গিয়ে কর্ম্মক্লান্ত দত্তমশায়ের নাকে ঢুক্‌ল। তিনি আরাম বোধ কর্‌লেন।

মুখুয্যেমশায় বল্‌লেন—"এখানে মহিম এসেছিল না ?"

—"মহিম ?—আজ্ঞে—চ'লে গেছে।"

—"সে ত দেখ্‌তেই পাচ্ছি। আজ ক'জনের হিসেব কর্‌লে ?"

—"হিসেব ? ভোলা বিশ্বাস, নরেন হাজরা, সতীশ গুঁই, আর লক্ষ্মীমণির।"

—"মোটে এই ক'জন! ভুলির কি হ'ল ?" ব'লে মুখুয্যেমশায় হুঁকোটা কেদারের হাত থেকে নিয়ে টান্‌তে লাগ্‌লেন।

—"আরম্ভ করেছি। কিন্তু এদিকে রাত—"

—"রাত আর কতটুকু ? তুমি ওদিকে আস্‌বে বেলা দুপুরে, যাবে সন্ধ্যের বাত্তি জ্বল্‌তে না জ্বল্‌তে। তোমাকে ত এর আগে অনেক দিন বলেছি—না পার, ছেড়ে দাও।"

—"আজ্ঞে খেয়া-পারের পথ। রাত হ'য়ে গেলে সঙ্গী—"

—"বেশ ছেড়ে দাও। কাজের মধ্যে ত দেখি, মহিমের সঙ্গে গল্প—"

কথাগুলো দত্তমশায়ের বুকে গিয়ে বিঁধ্‌ল। গল্প তিনি করেন, সত্যই; কিন্তু সে পনেরো-কুড়ি মিনিটের বেশি হবে না। তিনি এক সময়ে আসামের চা-বাগানে চাকরি কর্‌তেন। ছেলের মন! সেই জঙ্গলা গল্পই শুন্‌তে ভালবাসে। তবে কখন কখন সে অঙ্কটা করিয়ে নিয়ে যায়, দু'চারটে ইংরেজী কথারও মানে জিজ্ঞাসা করে। তিনি শুভঙ্করীর অঙ্ক ভালই জানেন; ইংরেজী কথাও দুটো চারটে যে না জানেন এমন নয়। তবে বড় বড় কথা—! ছেলেটাকে তাঁর লাগে ভাল। সারাদিনই ত খাতার ওপর ঘাড় গুঁজে থাকেন। কেদারের দয়া হ'লে, দু'একবার তামাক খাইয়ে যায়। দিনের মধ্যে দু'চারজন খাতক আসে। তখনই যা দুটো চারটে কথা বলেন, কিন্তু তাও দুঃখের; সকলেই বলে—'কষ্টে আছি।'

দেড় বছর আগে তিনি চা-বাগান থেকে এসেছেন। ছেলে-মেয়েটাকে খেয়েছে কালাজ্বরে; দেশের জায়গা-জমি গিলেছে পাঁচভূতে। দুইয়ের কোনটাই আর ফিরে আস্‌বে না। এখন সম্বল ভিটেটুকু। সংসারে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী। মন ভেঙে গেছে, শরীরও অপটু হ'য়ে পড়েছে। নূতন আর কিছু কর্‌বার উপায়ও নেই। তাই এই মাসিক বারো টাকা মাইনের মুহুরিগিরি। কিন্তু এও দিনের মধ্যে তিন-চারবার টলমল করে। দত্তমশায়ের চোখ দুটো কেমন ক'রে উঠ্‌ল।

কর্ত্তা একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বল্‌লেন—"ওটা আজ শেষ ক'রে যেতে হবে।"

ঘরের পিছনেই বড় রাস্তা। জানালা খোলা ছিল। ঐ দূরে অন্ধকারে একটা আলো জ্বল্‌ছে। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে দত্তমশায়ের গাঁয়ের যদু ঘোষ ডাক্‌ল—"ওগো দত্তমশায়! যাবে নাকি? দেয়া চেপে আস্‌ছে।"

দত্তমশায় চকিতে একবার কর্ত্তার মুখের দিকে তাকিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বল্‌লেন—"দেরি আছে।"

যদু কথাগুলো স্পষ্ট শুন্‌তে পেল না; বল্‌ল—"তবে এস। আমরা ঐ যোগেন ঠাকুরের দোকানে 'প্রেতীক্ষে' কর্‌ছি। বলাইও যাবে; পিছে আস্‌ছে।"

দত্তমশায় আর জবাব না দিয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেলে ভুলি দাসীর হিসেব কষতে লাগ্‌লেন।

কর্ত্তা বল্‌লেন—"আমি যে দ্বিজপদর বাগানখানা কিন্‌ব একথাটা ষষ্টি জান্‌ল কি ক'রে?"

ষষ্টি কর্ত্তার এক শরিক; উপস্থিত দত্তমশায়দের গ্রামে বাস করেন।

দত্তমশায় বল্‌লেন—"আজ্ঞে, আমি তা জানি নে।"

—"তুমি জান না? আমি যে কিন্‌ব একথা এক তুমি ছাড়া আর কারও জান্‌বার কথা নয়।"

দত্তমশায় নীরব। কর্ত্তার সন্দেহ প্রবল হ'য়ে উঠ্‌ল; বল্‌লেন—"তুমি তলে তলে ওর সঙ্গে যোগ দিয়ে আমার সর্ব্বনাশ কর্‌বার মতলব করেছ?"

দত্তমশায় বল্‌লেন—"দেখুন, আপনি অযথা আমার ওপর সন্দেহ কর্‌ছেন। যাই হোক, আপনার যখন ইচ্ছা নয় যে, আমি আপনার এখানে আর কাজ করি তখন আমাকে জবাব দিন।"

মুখুয্যেমশায় চিরকাল লোকের কাতর প্রার্থনা শুনে এসেছেন; এমন সরল জবাব কখনও শোনেন নি। কাজেই ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠ্‌লেন; বল্‌লেন—"বটে···বেশ যেতে পার।"

দত্তমশায় খাতার ওপর কলমটা রেখে বল্‌লেন—"আজ চৌদ্দই আশ্বিন। গত মাসের মাইনে এখনও পাই নি।"

মুখুয্যে শান্ত কণ্ঠে বল্‌লেন—"কাল এসে নিয়ে যেয়ো।"

—"দেখুন, আমি আর এখানে আস্‌তে চাই না। আমার হাতেও কিছু নেই।"

মুখুয্যেমশায় কি যেন বল্‌তে যাচ্ছিলেন; কিন্তু নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে বল্‌লেন—"তুমি কি নিয়েছ না-নিয়েছ, আগে দেখি; তারপর ত হিসেব ক'রে দেব।"

—"এই ত খাতা রয়েছে। আমি একটি পয়সাও নিই নি।"

—"আজ আমার সময় নেই। কেদার···কেদারে—"

কেদার বারান্দায় বেড়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা শুন্‌ছিল। সকল কথা লুকিয়ে শোনাই তার স্বভাব। সে ঘরে ঢুক্‌তেই মুখুয্যেমশায় বল্‌লেন—"নরহরিকে চট্‌ ক'রে ডেকে নিয়ে আয় ত।"

কেদার ছুট্‌ল। বৃষ্টি তখন আর একটু জোর হ'য়ে এসেছে। নরহরির বাড়ী

সেখান থেকে খান দুই বাড়ী পরে।' সে বাড়ীতেই ছিল। সে অবিলম্বে এসে উপস্থিত হ'ল, যেন এইটুকুরই সে অপেক্ষা কর্‌ছিল।

কর্ত্তা বল্‌লেন—"ওকে খাতাপত্র বুঝিয়ে দাও।···নরহরি সব বুঝে নে।"

বুঝাবার বিশেষ কিছু ছিল না; দত্তমশায় কয়েক মিনিটের মধ্যেই নরহরিকে খাতাপত্র বুঝিয়ে বেড়ার গা থেকে উঁচু কলার ও চওড়া-কফ-ওয়ালা শার্টটা খুলে নিয়ে, ফরাস থেকে নাম্‌লেন। তারপর কাদামাখা ক্যাম্‌বিসের জুতো জোড়া পায়ে দিয়ে ঘরের কোণ থেকে তালি-দেওয়া ও বাঁটভাঙ্গা ছাতাটা হাতে ক'রে বল্‌লেন—"আমি যাচ্ছি বাবু।"

কর্ত্তা কোন উত্তর দিলেন না।

দত্তমশায় নমস্কার ক'রে অন্ধকারে বা'র হ'য়ে গেলেন। সৌভাগ্যবশতঃ যোগেন ঠাকুরের খাবারের দোকানে তখনও যদু ঘোষেরা তাঁর জন্যে 'প্রেতীক্ষে' কর্‌ছিল। তাঁকে আর একা বাড়ী যেতে হ'ল না।···

পরদিন ঘুম ভাঙতেই দেখেন, ষষ্টি মুখুয্যের লোক এসে তাঁকে ডাক্‌ছে। লোকটি বল্‌ল—"কর্ত্তা একবার ডেকেছেন। তাড়াতাড়ি চলুন।"

সংবাদ সুখের হ'লেও তাঁর মন সঙ্কুচিত হ'য়ে গেল। তিনি দুঃস্থ ব'লে ষষ্টিবাবু ডাকেন নি, ডেকেছেন তাঁর শরিকের সর্ব্বনাশ কর্‌বার উপায়রূপে তাঁকে ব্যবহার কর্‌বেন ব'লে। ইচ্ছা না থাক্‌লেও দত্তমশায় তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে এলেন; কাজেও বহাল হ'লেন। কিন্তু সেদিন আর কাজে গেলেন না।

সারাদিন ব'সে ব'সে পুরানো কথা ভাব্‌তে লাগ্‌লেন···আসামের চা-বাগানে থাক্‌লেই বা ক্ষতি ছিল কি? সেখানে ত—।

সহসা মনে পড়্‌ল, সেদিন মাইনে পাবার কথা। তখনও বেলা অনেক আছে। তিনি জামাটা গায়ে দিয়ে জুতো জোড়া প'রে, ছাতাটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। তারপর যখন সাতকড়ি মুখুয্যের বাড়ী গিয়ে পৌঁছলেন, তখন বেলা চারটে বাজে। সূর্য্য বাঁশবনের মাথায় ঢ'লে পড়েছে।

মুখুয্যেমশায় কাছারিঘরেই ছিলেন; তাঁকে দেখেই বল্‌লেন—"কি খবর হে?"

—"মাইনের টাকা ক'টা—"

—"মাইনে? কিসের মাইনে? তুমি কি আজকাল নেশা-টেশা কর্‌ছ? না ষষ্টির সেরেস্তায় কাজে বহাল হ'য়েই জোচ্চুরি—"

দত্তমশায় অবাক্ ; বল্‌লেন—"আজ্ঞে, একি কথা বল্‌ছেন ?"

—"মাইনে নিয়েও যখন তুমি—"

—"মাইনে ত আমি নিই নি।"

—"নাও নি ? জোচ্চুরি ? ঐ খাতায় সই রয়েছে কার ?" ব'লে মুখুয্যেমশায় মাইনের খাতাখানা তাঁর ভূতপূর্ব্ব মুহুরির সাম্‌নে মেলে ধর্‌লেন।

দত্তমশায় বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে দেখ্‌লেন, খাতায় এক মাস চৌদ্দ দিনের মাইনে নিয়ে তিনি সই ক'রে দিয়েছেন—শ্রীবিপ্রদাস দত্ত। মায় আঁকড়ি ও টানটি পর্য্যন্ত ঠিক তেমনই হেলে আছে।

কাছারিঘরের পাশেই একখানা কাঠ-কুটো রাখবার চালা। তার পর অন্দরের উঠোন। কাঠ-কুটোর ঘরে দাঁড়িয়ে কাছারিঘরের সব কথা শোনা যায়।

দত্তমশায় একটা নিঃশ্বাস ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন ; কর্ত্তাকে নমস্কার কর্‌তেও তাঁর মনে পড়্‌ল না।

পথ দিয়ে চলেছেন। বেলা প'ড়ে আস্‌ছে। ছায়া কোথাও হচ্ছে দীর্ঘতর, কোথাও হচ্ছে আরও ব্যাপক, কোথাও গড়িয়ে নীচে নেমে গেছে এবং যেখানে ছিল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন সেখানে আর ভেদ নেই—সব মিশে গেছে।

দত্তমশায় মাঠে এসে পড়্‌লেন। দূরে দেখা যায় খেয়া-ঘাট। খেয়াখানা যাত্রী নিয়ে ধীরে এপারে আস্‌ছিল। তাঁর পাশ দিয়ে পরিচিত দুই-একজন চ'লে গেল। তিনি তাদের চিনেও চিন্‌তে পার্‌লেন না।

সূর্য্য এবারে একেবারে ডুবে গেছে ; সব অস্পষ্ট হ'য়ে এল। ঘাটও একেবারে সাম্‌নে।

হঠাৎ কে যেন পিছন থেকে ডাক্‌ল—"দত্তমশায়—দত্তমশায়—"

স্বরটা পরিচিত ও মিষ্ট ; ফিরে দেখেন, মহিম।

তিনি অবাক্ হ'য়ে গেলেন ; কয়েক পা এগিয়ে এসে বল্‌লেন—"কি মহিম !"

—"একটু দাঁড়ান।"

মহিমের বয়স দশ-এগারো বছর হবে ; কিন্তু ভারী সাহসী ছেলে। পাড়াগাঁয়ে তার বাস—না হবেই বা কেন ?

সে কাছে এসে কোমর থেকে কতকগুলো টাকা ও নোট বার ক'রে বল্‌ল—"নিন্—মামীমা পাঠিয়েছেন।"

দত্তমশায় প্রথমটা বুঝতে পার্‌লেন না; বল্‌লেন—"কেন? কা'কে?"

—"আপনাকে। আপনাকে ওরা টাকা দিল না। তাই মামীমা বল্‌লেন, গরীবের পাওনা টাকা না দিলে অমঙ্গল হবে। নিন্—" ব'লে সে দত্তমশায়ের হাতখানা টেনে ধর্‌ল।

দত্তমশায়ের চোখ দুটি জলে ভ'রে গেল। তিনি প্রথমটা কথা বল্‌তে পার্‌লেন না। ক্ষণপরেই নিজেকে সংযত ক'রে গলাটা একটু পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বল্‌লেন—"না বাবা! এ টাকা আমি নিতে পারি না। তোমার মামীমা, মা লক্ষ্মী। তাঁকে আমার প্রণাম দিও।"

"না বাবা! এ টাকা আমি নিতে পারি না"

মহিম বল্‌ল—"না, সে হবে না। আপনাকে নিতেই হবে।" ব'লে সে আবার হাত চেপে ধর্‌ল।

দত্তমশায় চোখ দুটো মুছে বল্‌লেন—"যাঁর টাকা তাঁকেই ফিরিয়ে দিও; আর ব'লো—দত্তমশায় প্রণামী দিয়েছেন।"

—"না নিলে আপনার বাড়ী গিয়ে দিয়ে আস্‌ব।"

—"না। রাত হ'য়ে আস্‌ছে। চল, তোমাকে এগিয়ে দিই।"

—"আমায় এগিয়ে দিতে হবে না। এপথে কতদিন সন্ধ্যের পর আমি একা এসেছি। নিন্—"

দত্তমশায় মহিমের হাত চেপে ধ'রে খেয়া-ঘাটের দিকে এগোতে এগোতে বল্‌লেন—"এ টাকা নেওয়া বড় অপরাধের। এ ত আমার প্রাপ্য নয়।"

তাঁর কথাগুলো শেষ হ'তে না হ'তে কারা যেন পিছন থেকে ছুটতে ছুটতে এসে তাঁর ও মহিমের হাত চেপে ধ'রে ব'লে উঠ্‌ল—"পেয়েছি! শালা পালাচ্ছে—ছেলেটাকে চুরি ক'রে নিয়ে যাচ্ছে—এই যে টাকাও আছে—"

দত্তমশায় চম্‌কে উঠে ফিরে দেখেন, নরহরি ও তিনজন পেয়াদা! অতঃপর তাঁর ভাগ্যে যে লাঞ্ছনা সুরু হ'ল, তা না বলাই ভাল।

নরহরিরা এসেছিল কর্ত্তার আদেশে। কেদারের স্বভাবসুলভ চাপল্যবশে আড়ালে দাঁড়িয়ে সে গিন্নীঠাকরুণকে মহিমের হাতে টাকা দিতে দেখে এবং তাঁদের দু'জনের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হয়, তাও শোনে। মহিম টাকাগুলো পেটকাপড়ে গুঁজে খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে পুকুরের ধার ধর্‌তেই সে এসে কর্ত্তার কাছে নালিশ করে। কর্ত্তা দেখ্‌লেন, দত্তমশায়কে আরও খানিকটা শাস্তি দেবার চমৎকার সুযোগ। তবে এবারকার শাস্তিটা হবে কঠোর। বেটা ষণ্ডির দোসর! ··· ···

দত্তমশায়কে পুলিশে দেওয়া হ'ল; পুলিশও যথারীতি তাঁকে মহকুমায় চালান দিল। তাঁর নামে অভিযোগ—শিশু মহিম ও একশ' টাকা চুরি। যদিও পাওয়া গেল মাত্র পঁচিশ টাকা; তাও আবার ছিল মহিমের কাছে!

অপহৃত বস্তুগুলোর একটি ত কথা বল্‌তে পারে।

সাতকড়ি মুখুয্যে মহিমকে বল্‌লেন—"খবরদার! কথা-গুলো যেন মনে থাকে। উকিল জিজ্ঞাসা কর্‌লেই বল্‌বি—'বিপ্রদাস আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল'; আর, হাকিমকে বল্‌বি 'হুজুর'।"

মহিম বল্‌ল—"হাঁ।"

নির্দ্দিষ্ট দিনে মামলা উঠ্‌ল। মজার মামলা; সেইজন্যে তা দেখ্‌বার জন্য আদালতে লোক ভেঙে পড়ল।

সাতকড়ি মুখুয্যে মহিমকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"মনে আছে?"

—"হাঁ।"

—"কি বল্‌বি?"

মহিম পাখীর মত শিখানো বুলিগুলো ব'লে গেল।

বেচারা দত্তমশায়ের পক্ষে দাঁড়ালেন এক ছোকরা উকিল। যদি লোকটাকে খালাস করা যায়, নাম হবে। নাম হ'লেই পসার। উকিলটি ছোকরা হ'লেও বেশ চালাক। তিনি এতক্ষণ কাছারির বাইরে একটা আমগাছের তলায় দাঁড়িয়ে একটি লোকের সঙ্গে কি যেন পরামর্শ কর্‌ছিলেন। লোকটি একখানা বাড়ীর দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে তাঁকে কি যেন বল্‌ছিল।

সাতকড়ি মুখুয্যের সাক্ষীর অভাব ছিল না; তাদের মধ্যে মহিমও একজন। দত্তমশায়ের উকিল অন্যান্য সাক্ষীকে জেরা কর্‌বার পর মহিমকে জেরা কর্‌তে উঠ্‌লেন; কিন্তু মহিমের মাথা কাঠগড়া ছাড়িয়ে উঠ্‌ল না। সে তার মধ্যে ডুবে রইল। আদালত-শুদ্ধ লোক তাকে দেখ্‌বার জন্য উদ্‌গ্রীব হ'য়ে দাঁড়াল।

হাকিম একজন পেয়াদাকে বল্‌লেন—"ওকে কোলে নিয়ে দাঁড়াও।"

পেয়াদা মহিমকে কোলে নিয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়াতেই সে ভয়ে বিস্ময়ে আদালত-ঘরের চারধারে একবার তাকিয়ে হাকিমের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ কর্‌ল।

দত্তমশায়ের উকিল তাকে জেরা কর্‌বার উদ্যোগ কর্‌তেই হাকিম মহিমকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"তোমার নাম কি?"

—"শ্রীমহিমকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।"

বিপ্রদাস দত্তকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"ঐ লোকটাকে চেন?"

মহিম দত্তমশায়ের ম্লান ও শুষ্ক মূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—"হাঁ স্যার—হুজুর।"

—"ও তোমাকে ভুলিয়ে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল?"

—"দত্তমশাই?···উনি ত আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে যান নি। মামীমা আমাকে ওঁর হাতে দেবার জন্যে পঁচিশ টাকা দিয়েছিলেন। আমি তাই দিতে ওঁর সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিলাম।···মামা ওঁকে মাইনে দেন নি কি না।"

আদালত-কক্ষে সহসা কৌতুক ও বিস্ময়ের গুঞ্জন উঠ্‌ল।

হাকিম জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিলে কেন?"

—"উনি কিছুতেই নিতে চাইছিলেন না যে···উনি তখন কাঁদ্‌ছিলেন; বল্‌ছিলেন,—এ টাকা আমি নিতে পারি না।"

হাকিম আর কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌লেন না; বল্‌লেন—"যাও।"

মুখুয্যেমশায়ের উকিল বল্‌লেন—"হুজুর, ও ছেলেমানুষ!"

দত্তমশায়ের উকিল বল্‌লেন—"হুজুর, হুকুম দিলে মহিমের মামীমাকেও আদালতে উপস্থিত করতে পারি…"

মুখুয্যেমশায়ের উকিল ব'লে উঠ্‌লেন—"সে কি ক'রে হয়? তিনি পর্দ্দানশীন মহিলা।"

সাতকড়ি মুখুয্যে তখন আদালত-কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেছেন। দত্তমশায়ের চোখ ছুটি জলে ভ'রে উঠেছে। কাগজের ওপর হাকিমের কলম চল্‌ছে, লোকে কানা-ঘুষো করছে, আর মুখুয্যেমশায়ের উকিল মাথা চুলকোচ্ছেন।

মামলার পরিসমাপ্তি ঘট্‌ল। দত্তমশায় খালাস পেলেন। কিন্তু গ্রামে আর তাঁর ঠাঁই হ'ল না। মহিমও মাতুলগৃহে ফিরে গেল। তার সেখানে একটু ঠাঁই হ'লেও মাতুলের স্নেহ থেকে সে হ'ল বঞ্চিত। বঞ্চিত হ'লেও মামীমার কাছে তার আদর আরও বাড়ল। আর তার স্থান হ'ল—সকলের অন্তরে।

কোগ্রামের মাঠ

কাদের নওয়াজ

এই মাঠ হেরি মনে পড়ে মোর
বালক-কালের স্মৃতি,
এই পথ দিয়ে পুলিনবাবুর
পাঠশালা গেছি নিতি।

শিরীষ ফুলের সুবাস আসিত,
'খঞ্জন' চেয়ে চেয়ে
দেখিত মোদেরে, তিতির-পাখীরা
পুকুরেতে যেত নেয়ে।

অজয়ের কূলে ফুলে' ফুলে' ঢেউ
জানাতো স্নেহের মায়া,
অশথের কোলে নামিয়া আসিত
বিকালেতে কালো-ছায়া।

সেই ছায়াপানে চেয়ে চেয়ে মোরা
ফিরিতাম যবে ঘর —
'মঙ্গলকোট্' গ্রাম দেখি দূরে,
নাচিত যে অন্তর।
আমাদের নদী কুনুর তখন
ছল্‌ছল্‌ চোখে চেয়ে —
জানাতো মোদের কত যেন প্রীতি
গেলে এই পথ চেয়ে।
সেদিন গিয়েছে স্মৃতি ডুবে গেছে
কালের গহীন-সরে,
এই মাঠ হেরি তবু যেন আজ
কত কথা মনে পড়ে।
শৈশবকাল বাঁধা পড়ি গেছে
যেন এই মাঠ 'পরে,
হেথা এলে আমি শিশু হ'য়ে যাই
যেন ক্ষণিকের তরে।
মনে পড়ে 'তারা' 'রঞ্জন' সনে
মন্দির-প্রাঙ্গণে—
খেলিতাম খেলা দিবসে দুপুরে
ছুটিতাম কভু বনে।
'মঙ্গলকোটে' মস্‌জিদে গিয়ে,
'মলু' 'আমু' 'নীলু' 'মাবু'—
তর্ক করিয়া মোল্লারে মোরা,
করিতে চেয়েছি কাবু।

তাহের্ সেখের গলার আওয়াজ
শুনিলেই ভয়ে ভয়ে,—
ছুটিতাম মোরা গ্রাম-পথ পানে
কত যে ব্যাকুল হ'য়ে—
সেই সব কথা মনে হ'লে ওঠে
অন্তর বেয়াকুলি,
কোথা শিশু-সাথী বন্ধুরা মোর
কোথা সেই দিনগুলি ?

'কোগ্রাম-মাঠ' দূর হ'তে হেরি
যতবার আঁখি দিয়া,
মনে হয় আজো এই মাঠে গেলে
ফিরে পাবো শিশু-হিয়া।
মিছে এই আশা, শৈশব গেছে
ফিরিবে না কোন দিন ;
আছে শুধু সেই পরিচিত মাঠ,
আর আছে স্মৃতি-চিন্।

সাইপ্রাস্

অধ্যাপক শ্রীবৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম. এ., এফ. আর. জি. এস.,
এফ. আর. এস. এ. (লণ্ডন)

শরৎকাল। পূজার ছুটি। আমার ছুটি প্রায় দুই মাস। এতদিন বাড়ীতে বসিয়া থাকিব ? না—না ; কিছু দিন নগরের বদ্ধ বায়ু ছাড়িয়া বাহিরের মুক্ত বায়ু সেবন করিয়া আসিলে, বিদেশের লোকের সঙ্গে মেলামেশা করিলে, স্বাস্থ্য ও মনের পরিবর্ত্তন হইতে পারে, কিন্তু যাই কোথায় ? হঠাৎ ভূগোলের পাতা উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে চোখে পড়িল একটি দ্বীপের নাম। নামটি হইতেছে সাইপ্রাস্। সাইপ্রাস্ দ্বীপে গেলে মন্দ হয় না ; খুব বেশী দূরেও নয়, অথচ সেখানে আমাদের দেশের লোক বড় বেশী যান না। একদিন এক ভদ্রলোক ওই দ্বীপটি সম্পর্কে অনেক কিছু বলিয়াছিলেন। তাই শুভদিনে ব্যাগ্-ব্যাগেজ, বেডিং ও যথোপযুক্ত অর্থাদি সঙ্গে লইয়া চলিলাম।

ভোর সাড়ে পাঁচটায় গাড়ী। গাড়ী চলিল হুড়্‌হুড়্ করিয়া। গাড়ীর গবাক্ষ-পথে চাহিয়া দেখিলাম, গাছপালা সব ছুটিয়া চলিয়াছে ; গ্রাম হইতে গ্রামান্তর, প্রান্তর হইতে প্রান্তরান্তর পশ্চাতে ফেলিয়া আমরা ছুটিয়া চলিয়াছি।

গাড়ী থামিল—উঠিতে হইল ষ্টীমারে। এইবার স্থলপথ শেষ করিয়া জলপথ আরম্ভ হইল। ঢেউয়ের উপর আসিতেছে ঢেউ, কত জল-জন্তু মাথা উঁচু করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছে ! যেদিকে চাওয়া যায় শুধু জলের উচ্ছ্বাস—আর সোঁ-সোঁ ধ্বনি !

তাহার পর—মনে পড়ে, সেই ষ্টীমারও আসিয়া থামিল। অপরাপর যাত্রীদের সহিত আমি সাইপ্রাস্ দ্বীপে অবতরণ করিলাম।

এসিয়া মাইনরের দক্ষিণে, সিরিয়ার পশ্চিমে এই ক্ষুদ্র দ্বীপ। দ্বীপটি নূতন নয়—বহু প্রাচীন। দূর হইতে সাইপ্রাসের দিকে দেখিলে মনে হয় কে যেন একখানা হরিণের চামড়া বিছাইয়া রাখিয়াছে। উহার সংলগ্ন দীর্ঘ ও সরু উপদ্বীপটির নাম কারপাস্। কারপাস্ উপদ্বীপকে দেখিলেও মনে হয়, উহা বুঝি ঐ হরিণের চামড়ার লাঙ্গুল !

ওখানকার লোকদের সঙ্গে বহু কথাবার্ত্তা হইল। একজন বিশেষজ্ঞ লোক বলিলেন—"দেখুন, আপনি এই দ্বীপটিকে যতটা ছোট মনে কর্‌ছেন—দ্বীপটি কিন্তু তত ছোট নয়। এটা লম্বায় প্রায় একশ' মাইল এবং চওড়ায় প্রায় ষাইট মাইল। অবশ্য কারপাস্ উপদ্বীপ বাদ দিয়েই বল্‌ছি।"

আমি একটু বিস্মিতই হইলাম—একশত মাইল তো নিতান্ত অল্প জায়গা নয়। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আচ্ছা দেখুন, দ্বীপটির আয়তন কত হইবে ?"

তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"তিনহাজার পাঁচশ' চুরাশী বর্গমাইল।"

দেখিলাম, লোকটির ভৌগোলিক জ্ঞান বেশ আছে। বুঝিলাম লোকটি ভাল করিয়াই ভূগোলের চর্চ্চা করেন। তিনি আমাকে কথাটা আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য বলিলেন—"সম্মিলিত নরফোক্ ও সাফোকের অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ বড় এই দ্বীপটি।"

দ্বীপটির সমস্ত জায়গা দেখিতে বাহির হইলাম। ঘুরিতে ঘুরিতে প্রায় বার মাইল দূরে চলিয়া গেলাম। ঐস্থান দেখিয়া মনে মনে সুস্পষ্ট অনুভব করিলাম যে, সাইপ্রাসের বায়ুমণ্ডল বেশ মুক্ত—বেশ স্বচ্ছ। আমি যেখানে গিয়া পড়িয়াছিলাম সেইখানেই ছিল সাইপ্রাস্ দ্বীপের তিন তিনটি পর্ব্বত। একটির নাম বাকাভেন্টো, আর একটির নাম সেন্ট হিনারিয়ন্ এবং অন্যটির নাম পেন্টিড্যাক্টি।

পর্ব্বত ছাড়াইয়া গেলাম দক্ষিণে; সেখানে দেখিলাম, একটি সুন্দর উপত্যকা। শুনিলাম, এক সময় সেই উপত্যকায় প্রচুর শস্য জন্মিত। কিন্তু কালের কুটিল আবর্ত্তে উহার আর সেদিন নাই। কয়েক বৎসর হইল সেখানকার শাসক ও অভিভাবকগণ সেই স্থানের প্রচলিত জল-সেচন-প্রণালীর বিষয়ে ঔদাসীন্য অবলম্বন করায় এবং পাতকুয়াগুলিও সংস্কারের অভাবে নষ্ট হওয়ায় জমির উৎপাদিকাশক্তি এতই হ্রাস পাইয়াছিল যে, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে সামান্য কিছুদিন অনাবৃষ্টির জন্যই সেইস্থানে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। তাহাতে অধিবাসিগণের আর কষ্টের সীমা ছিল না।

দেখিলাম, সাইপ্রাস্ দ্বীপের পশ্চিম-পর্ব্বতমালা ঐ দেশের পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের প্রায় সর্ব্বত্র বিস্তৃত রহিয়াছে। ঐ পর্ব্বতমালার সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত ট্রোডোস্ প্রায় ৬৩৫২ ফুট উচ্চ। ট্রোডোসের ক্রমনিম্ন ভূমিতে অনেক দীর্ঘকায় পাইন্ বৃক্ষ রহিয়াছে। স্থানটি মনোরম ও স্বাস্থ্যকর। এই জন্যই লিয়াসোল্ ও অপরাপর স্থান হইতে প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে সৈন্যগণ আসিয়া সেই স্থানে বাস করে। শুনিলাম, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ইজিপ্টে যে দারুণ সংক্রামক জ্বর ও পেটের অসুখ আরম্ভ হয় তাহাতে ভুগিবার পর তথাকার "ব্রিগেড্ অফ্ গার্ডস্" সৈন্যগণ ঐস্থানে আসিয়া স্বাস্থ্য ফিরিয়া পায়। সাইপ্রাসে কোন বন্দর না থাকিলেও লারণকো ও লিয়াসোল্ সমুদ্র-তীরবর্ত্তী সহর। সেই সহর দুইটিতে সরাসর রাস্তা আছে, কিন্তু বন্দরের কোনও ব্যবস্থা নাই। ঐ স্থানের সমুদ্র

গভীর নয়, এইজন্যই ষ্টীমারগুলি তীর হইতে বহু দূরে নঙ্গর করিতে বাধ্য হয়। ইহা ছাড়া,—ঝড়ের দিনে সমুদ্রের ঢেউ এরূপ প্রবলবেগে তীরে আঘাত করে যে, ঐ সময় তীরে অবতরণ করা একেবারেই অসম্ভব হইয়া উঠে। প্রচুর বর্ষার জলে বা বরফগলা জলে সাইপ্রাসের নদীগুলি জলপূর্ণ হয়। অন্য সময় ঐ সকল নদী একেবারেই শুকাইয়া যায়। পারালিম্‌নি ছাড়া সেখানে আর কোনও হ্রদ নাই। গ্রীষ্মকালে সেই হ্রদে মোটেই জল থাকে না। শীতকালে হ্রদে প্রচুর মৎস্য পাওয়া যায়। কি করিয়া সেই সময় এত মাছ আসে তাহা আজ পর্য্যন্ত কেহই নির্ণয় করিতে পারেন নাই। শীতকালে ঐ হ্রদের মাছ ধরিয়া অন্যান্য দেশে চালান দেওয়া হয়।

১৯০১ খৃষ্টাব্দের লোক-গণনায় দেখা গিয়াছে, সাইপ্রাস্ দ্বীপে ২৩৭০২২ লোকের বাস। উহাদের প্রায় তিনভাগই গ্রীক্ ধর্ম্মাবলম্বী, অবশিষ্ট মুসলমান।

সাইপ্রাসের অধিকাংশ লোকই বর্ত্তমান গ্রীস্‌দেশীয় ভাষাকে তাহাদের মাতৃভাষা মনে করে ও অধিবাসীদের মধ্যে প্রায় ৪৬,০০০ অধিবাসী তুর্কী ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে। দ্বীপের স্ত্রীলোকগণ অপেক্ষা পুরুষেরাই দেখিতে বেশী সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান্।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুলাই সাইপ্রাস্ ইংরেজদের অধীনে আসে। রাজস্ব হিসাবে ৯২,৮০০ পাউণ্ড মুদ্রা সাইপ্রাস্ হইতে প্রতিবৎসর ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়। সাইপ্রাসের পুলিশ বিভাগে ২১৫ জন ঘোড়সওয়ার এবং ৪৬০ জন কনেষ্টবল ইংরেজ কর্ম্মচারিগণের অধীনে কার্য্য করিয়া থাকে। পালিমিডিয়ায় একদল বৃটিশসৈন্যও রাখা হইয়াছে। কোন কামান বা কামান-সঞ্চালক সৈন্য সেই দ্বীপে নাই। খৃষ্টানদিগের দুই শত প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মুসলমানদিগের একশ' কুড়িটি বিদ্যালয় সেখানে আছে।

সাইপ্রাসে গম, যব, তূলা, রেশম, শণ, তামাক, পশম, জিপ্‌সাম্ নামক ধাতু এবং কমলালেবু, বেদানা, স্পঞ্জ, গঁদ প্রভৃতি প্রচুর পাওয়া যায়। ক্যারোব্ বা লোকাষ্ট্ বিন্ সেখানে প্রচুর জন্মে এবং বিদেশে চালান দিয়া প্রতিবৎসর প্রায় ৭০,০০০ হইতে ১,১৩,০০০ পাউণ্ড পাওয়া যায়। সেখানকার ১৯০০ খৃষ্টাব্দের রিপোর্টে জানা যায় যে, ঐ বৎসর ২০,৭২৭ পাউণ্ড মূল্যের গম এবং ৫৮,০৯৪ পাউণ্ড মূল্যের যব বিক্রয় হইয়াছিল। ওই দ্বীপে এত বেশী যব জন্মে যে, ঘোড়া, গরু প্রভৃতিকে দানার পরিবর্ত্তে যবই খাওয়ান হয়। সেখানে ঘাস মোটেই হয় না। পশম ও রেশম প্রচুর উৎপন্ন হয়। স্থানীয় লোকগণ তাঁতের সাহায্যে ঐ সকল তন্তু হইতে নানাবিধ মনোহর দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া

বিভিন্ন দেশে চালান দেয়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে কেবলমাত্র গ্রেট্ বৃটেনেই ৫০,৩৪০ পাউণ্ড মূল্যের পশম এবং ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ১,২২,৬২৯ পাউণ্ড মূল্যের রেশম রপ্তানী হইয়াছিল। প্লাষ্টার্ অফ্ প্যারিস্ ও লবণ সাইপ্রাসে প্রচুর পাওয়া যায়। তুর্কীরা প্রতিবৎসর প্রায় ৪০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের লবণ রপ্তানী করিত, কিন্তু ইংরেজেরা বর্ত্তমানে আইন করিয়া উহা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

সিরিয়া ও এসিয়া মাইনরের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে যে সকল জীবজন্তু ও গাছপালা পাওয়া যায় তাহাদের প্রায় সকলগুলিই ঐ দ্বীপে দৃষ্ট হয়। তথাকার মৌক্লন নামক
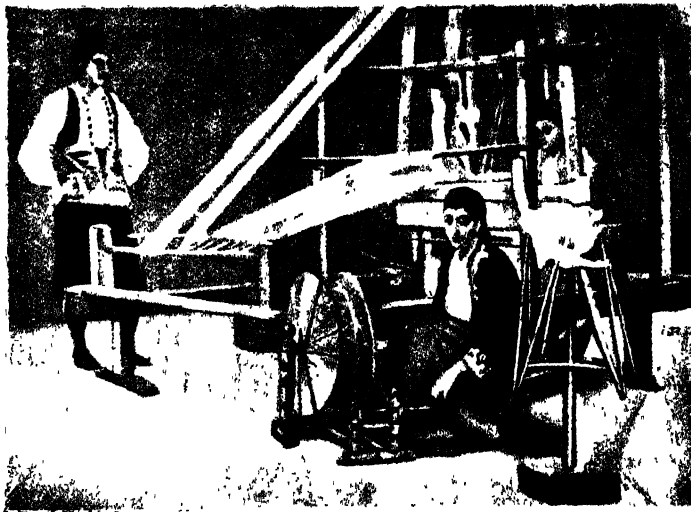
সাইপ্রাস্-বাসীরা তাঁতে বস্ত্র বয়ন করিতেছে

বন্য মেষ, অশ্বতর ও ছাগলই বিশেষ প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমানে এই মৌক্লন মেষের বংশ খুবই হ্রাস পাইয়াছে, কিন্তু ছাগ-বংশ এতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে যে, তাহাদের দন্তাঘাতে সাইপ্রাসে ছোট ছোট গাছপালা বাড়িতে পারে না। অঙ্কুর হইতে গাছ বাহির হইতে না হইতেই উহারা ঐগুলিকে খাইয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলে। সেখানে একবার এত পঙ্গপাল হইয়াছিল এবং উহারা শস্যের এতই ক্ষতি করিয়াছিল যে, উহাদের ধ্বংসের জন্য গভর্ণমেণ্টকে একটি স্বতন্ত্র আইন প্রচার করিতে হইয়াছিল।

সাইপ্রাসে প্রায় একমাস সুখে অবস্থান করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

পঞ্চায়ুধ জাতক

শ্রীঅশ্বিনীকুমার শর্ম্মা

পুণ্যতোয়া গঙ্গার তীরে বারাণসী নগর—কাশী রাজ্যের রাজধানী। অনেক—অনেক দিনের কথা, মহাবুদ্ধের তখনও জন্ম হয় নি ; কপিলাবাস্তর নাম তখনও কেউ শোনে নি।

কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের পাটরাণী সুনন্দার কোলে বোধিসত্ত্ব জন্ম নিলেন, যেন একটা শান্ত সরোবরের বুকে এক পশলা চাঁদের আলো। ঢাক-ঢোল বাজল,—মেয়েরা উলু দিল, পুরোহিত শাঁখ বাজিয়ে গৃহ-দেবতার আরতি করলেন ; পূর্ণিমার সন্ধ্যা আলোয় আর গানে মেতে উঠল।

নাম-করণের দিন আটশ' দৈবজ্ঞ এলেন পাঁজি-পুঁথি নিয়ে—শ্লোক আওড়িয়ে। রাজা শুধালেন ছেলের ভবিষ্যৎ—মা-বাপের প্রাণ চায় সংসারে যত রকম সুখ আছে, আনন্দ আছে, ছেলের হোক।

রাজার ছেলের ভবিষ্যৎ বসন্তের বনভূমির মত উজ্জ্বল হবে—এই অনুমান ক'রে চতুর দৈবজ্ঞেরা বলল—"মহারাজ! আপনার ছেলে যুবরাজ অবস্থায় এক বিকট রাক্ষসের মুখে পড়বে। কিন্তু জাতকের গুরু আছেন অনুকূল স্থানে। সুতরাং ভয়ের কোন কারণ নেই। এই বিপদ কেটে গেলে ওঁর জ্যোতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে রাহুমুক্ত সূর্য্যের মত। হাতের এই পঞ্চরেখা থেকেও অনুমান হচ্ছে, পাঁচটি বাণ নিয়ে ইনি অদ্ভুত কর্ম্ম সাধন করবেন। সমগ্র জম্বুদ্বীপে ওঁর আর তুলনা থাকবে না।"

পুরোহিত মন্ত্র পড়লেন মাথায় হাত দিয়ে

পাঁচটি বাণের ভবিষ্যৎবাণী শুনে ব্রহ্মদত্ত জাতকের নাম রাখলেন পঞ্চায়ুধ।

দেখতে দেখতে পঞ্চায়ুধ ষোল বছরে পা দিলেন। ব্রহ্মদত্ত বললেন—"এবার পুত্র, বেরিয়ে পড়। এতদিন তোমাকে সকল বিপদ-আপদ থেকে আগলে রেখেছি ; কিন্তু এখন তোমার বয়স হয়েছে। এবার স্বাধীনভাবে দেশ-বিদেশে ঘুরে রাজা হবার মত সাহস আর বিদ্যা অর্জ্জন কর।"

"কার কাছে বিদ্যালাভ করব ?"—রাজপুত্র শুধালেন।

রাজা বললেন—"গান্ধার-দেশে তক্ষশীলার বিশ্ব-বিশ্রুত আচার্য্যদেবের কাছে। এই তোমার গুরুদক্ষিণা।"—ব'লে, এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা পুত্রের হাতে তুলে দিলেন।

পাঁজি-পুঁথি দিনক্ষণ দেখে মা-বাপের পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে রাজকুমার ঘরের বাইরে পা দিলেন। শয়ন-কক্ষের দরজা থেকে ফটক পর্য্যন্ত পথের দু'ধারে পূর্ণকুম্ভ থেকে আরম্ভ ক'রে সব রকম মাঙ্গলিক দ্রব্য সাজিয়ে রাখা হয়েছিল; কুমার একে একে সবগুলো স্পর্শ ক'রে চললেন।

মা ডাকলেন পেছন থেকে। পুরোহিত মন্ত্র পড়লেন মাথায় হাত দিয়ে। বন্ধু-বান্ধব চোখের কান্না মুখের হাসিতে চেপে রেখে বললেন—"শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ!"

কুমার চললেন হাসিমুখে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে।

—২—

গান্ধারের রাজধানী তক্ষশীলা হিন্দুকুশ পর্ব্বতের স্নিগ্ধ ছায়ায় শুয়ে। সুলেমান পর্ব্বতের উত্তর প্রান্তে খাইবার গিরিসঙ্কট, তারই মুখে তক্ষশীলা; কাবুল নদী চলেছে পাশ কেটে।

একখানা পরিচ্ছন্ন কুটীরের আঙ্গিনায় ভোরের রৌদ্রে পিঠ দিয়ে ব'সে আছেন তক্ষশীলার আচার্য্যদেব। একটু দূরে সার বেঁধে ব'সে বেদ পাঠ করছে শিষ্যেরা। আঙ্গিনার একপাশে এক দ্রাক্ষালতা বাউনি বেয়ে বেয়ে পেছনে দাঁড়ান এক গৈরিক পাহাড়ের গায়ে এঁকে দিচ্ছে তার সবুজ পাতার আল্পনা। তার থেকে দুলছে গুচ্ছ গুচ্ছ আঙ্গুর। একটা ছোট সবুজরঙ্গের পাখী তাই ঠোকরাচ্ছে আর থেকে থেকে ঘাড় বাকিয়ে বেদপাঠরত শিষ্যমণ্ডলীর দিকে চেয়ে দেখছে। এমন সময় সেখানে দেখা দিল এক অপরিচিত কিশোর। মুখখানি তার পৌরুষ-লাবণ্যে দীপ্ত। মাথায় কালো কালো কোঁকড়া চুল পাগড়ীর নীচ থেকে গুচ্ছ গুচ্ছ বেরিয়ে প'ড়ে সেই মুখখানাকে ঘিরে আছে। গৌর ললাটে রক্তচন্দনের তিলক। চওড়া বুকের পাটা, তা'তে দুলছে হৃদ্‌পিণ্ডের আকৃতি একটি মণি। পিঠে কম্বলের পোট্‌লা, হাতে বর্শা, কোমরে খাপে-ভরা তরোয়াল। দেহ উলঙ্গ, কটিতে ক্ষৌমবস্ত্র এবং পায়ে পাদুকা। কিশোর প্রণাম ক'রে আচার্য্যদেবের সমুখে দাঁড়াল। আচার্য্যদেব হেসে হেসে বললেন—"কি গো! এস, এস। কোত্থেকে এলে তুমি বল ত?"

কিশোর বলল—"আমি এসেছি গঙ্গাতীর থেকে—আপনার চেলা হ'ব ব'লে।"

—"বাঃ! বাঃ! গঙ্গার তীর থেকে এসেছ—নিষ্পাপ নির্ম্মল হবে তোমার হৃদয়টি; আর তা' ত মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে!"

কিশোর জোড়হাতে বলল—"গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ।"

—"আনন্দ রহো আনন্দ রহো! আশ্রমের কঠোরতা সইতে পারবে ত?"

—"গুরুদেবের কৃপা হ'লে সবই পারব। কাশী থেকে তক্ষশীলায় পায়ে হেঁটে আসাও ত গুরুর কৃপায়ই সম্ভব হয়েছে!"

—"তাই ত! এত পথ পায়ে হেঁটে এসেছ—একি যার তার কাজ? বাঃ রে! তোমার কপালে যে দেখতে পাচ্ছি রাজ-চিহ্ন!"

কিশোর যেন মহা লজ্জিত হ'য়ে কপাল মুছতে হাত তুলল। আচার্য্যদেব হেসে বললেন—"ও কি আর মোছা যায় বাবা? বিধাতার ছাপ। কিন্তু এবার ধরা প'ড়ে গেলে; হাতের তেলোতে দেখতে পাচ্ছি বজ্র আঁকা। রসো—রসো, কপালে রাজ-তিলক, হাতে বজ্র-চিহ্ন নিয়ে জন্মেছে কে? বছর ষোল আগে হবে—হাঁ—হাঁ—মনে পড়েছে; কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের পুত্র! তাই না?"

কিশোর মাথা নুইয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

"তোমারই ত নাম পঞ্চায়ুধ?"—আচার্য্যদেব শুধালেন।

কিশোর কিছু না ব'লে আবার গুরুর পায়ের ধুলো মাথায় নিল।

তখন রাজপুত্রকে সতীর্থ পেয়ে শিষ্যেরা ভারি খুশী। আচার্য্যও খুশী; কারণ এতদিনে এমন একটি শিষ্য পাওয়া গেল, বিদ্যাদান যার মধ্যে সার্থক হবার সম্ভাবনা আছে।

—৩—

রাজপুত্র পঞ্চায়ুধ গুরুর বিদ্যা এমন দ্রুত আয়ত্ত করতে লাগলেন যে, দেখে গুরুরও বিস্ময় জন্মে গেল।

আচার্য্যদেবের শিষ্যদের অলস হবার সময় নেই। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ঘণ্টা বাজে; তখন তাদের বিছানা ছেড়ে উঠে' পৃথিবী, জল, আকাশকে প্রণাম করতে হয়। তারপর নদীতে নেয়ে হাঁটু-জলে দাঁড়িয়ে তা'রা বেদ পাঠ করে। বেদগান হ'তে হ'তে সূর্য্যোদয়; তারপর সূর্য্য-প্রণাম। সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিয়ে প্রণাম ক'রে ফেরে তা'রা আশ্রমে। অধ্যয়ন চলে বেলা একপ্রহর পর্য্যন্ত। তারপর কুশ-সমিধ আহরণ। দুপুরবেলায় খাওয়া-দাওয়া সেরে দুই দণ্ড কাল বিশ্রাম করতে হয়। তখন চলে পরস্পরের মধ্যে আলোচনা। আলোচনায় আচার্য্যদেব উপস্থিত থাকেন। কিন্তু প্রায়ই কুমার পঞ্চায়ুধের বুদ্ধিই সকলকে সাহায্য করে। আলোচনা শেষ হ'লে যুদ্ধ-বিদ্যা—তীর ছোড়া, তরোয়াল খেলা, বর্শা-চালনা। এ বিদ্যায়ও পঞ্চায়ুধ অদ্বিতীয়।

রৌদ্র যখন প'ড়ে আসে, তখন ঘোরা-ফেরার ছুটি। ঘোরা-ফেরার ভেতরেও চলে কাজ—দুর্ব্বলকে রক্ষা করা, দুর্জ্জনকে আঘাত করা, পশু-পক্ষীর সেবা-শুশ্রূষা, গাছপালার পরিচর্য্যা।

একদিন এক ব্যাধ কোত্থেকে এসে তীর ছুড়ল এক পাখীর ডানায়। বিদ্ধ হ'য়ে পাখীটি টুপ্ ক'রে প'ড়ে গেল ব্যাধেরই হাতে। তার সঙ্গী পাখীটি তখন উড়ে' এসে পঞ্চায়ুধের পায়ের কাছে প'ড়ে ছট্‌ফট্ করতে লাগল। কি তার আর্ত্তনাদ! পঞ্চায়ুধ অমনি সেই ব্যাধকে ডেকে বললেন—"ভাই, পাখীটিকে ছেড়ে দাও। বোবা জাত; কথা কইতে পারে না। কিন্তু দেখ-না, তার সঙ্গীটি কী কান্না কাঁদছে! দুর্ব্বলকে ভাই, পীড়ন ক'রো না!"

ব্যাধ বলল—"মেরেছি পাখী, ছেড়ে দেব কেন? মানুষের আমোদ আর আহারের জন্যই ত এসব দুর্ব্বল প্রাণী!"

রাজকুমার বললেন—"আমি আর তর্ক করব না। হয় পাখীটিকে ছাড়; নয় যুদ্ধ কর।"

ব্যাধ দেখল, এ-ত শিশু—এক আছাড়ে শেষ করা যাবে; বলল—"এস মল্লযুদ্ধ করব।"

"তথাস্তু" ব'লে পঞ্চায়ুধ বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালেন। ব্যাধ এক লাফে এগিয়ে এসে হানল এক বজ্রমুষ্টি তাঁর কপাল লক্ষ্য ক'রে। কুমার টপ্ ক'রে ব'সে পড়াতে ব্যাধের মুষ্টি লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ে গেল এবং ব্যাধ নিজেকে সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল কুমারের মাথার ওপরে। কুমার সুযোগ পেয়ে সবেগে ব্যাধের পেটে মারলেন মাথার গুঁতো। বেচারা 'মা-গো' ব'লে উল্টে পড়ল, আর মাটিতে মাথা লেগে ঘাড়টাই তার গেল ভেঙ্গে। কিন্তু বাঁ-হাতে শিকারটি ছিল, তা' ছাড়ল না।

রাজকুমার বললেন—"এবার তবে পাখীটিকে ছেড়ে দাও!"

ব্যাধের গলা যন্ত্রণায় কাঁপে; তবু সে দৃঢ়কণ্ঠে বলল—"প্রাণ থাকতে হার মানব না।"

পঞ্চায়ুধ অবাক্ হ'য়ে গেলেন ব্যাধের সাহস আর জেদ দেখে; বললেন—"আমিই ভাই হার মেনেছি। এখন পাখীটিকে একবার আমার হাতে দাও; তুমি সুস্থ হ'য়ে উঠলে তোমার পাখী আবার তোমাকে ফিরিয়ে দেব।"

ব্যাধের হাত থেকে পাখীটি নিয়ে কুমার তা' এক সমপাঠীর হাতে দিলেন। তারপর ব্যাধের ঘাড়টি সোজা ক'রে তা'তে কি জানি এক বনের পাতা বেঁধে দিলেন এবং কোলের ওপর মাথাটি রেখে কপালে হাত বুলোতে লাগলেন। পদ্ম হাতের শীতল স্পর্শে দেখতে দেখতে ব্যাধের ঘুম এল। তারপর হঠাৎ সে ঘুমের ঘোরে জড়িতকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল—"ছেড়ে দে-রে—ছেড়ে দে-রে!" তারপর কিছুক্ষণ চুপ ক'রে প'ড়ে থেকে আবার চেঁচিয়ে বলল—"জয় বোধিসত্ত্বের জয়!"

তখন সন্ধ্যারবি আধখানা ডুবে গেছে; বাতাস হিম হ'য়ে এসেছে। যার হাতে ডানা-ভাঙ্গা পাখীটি ছিল, তার পায়ের কাছে প'ড়ে সাথী পাখীটি লুটোপুটি খাচ্ছে। ব্যাধের ঘুম ভেঙ্গে গেছে তার নিজেরই চীৎকারে; সঙ্গে সঙ্গে সে ব'লে উঠল—"না না না! এ আমি সইতে পারি না!"

"কি সইতে পার না, ভাই?"—মধুরকণ্ঠে পঞ্চায়ুধ শুধালেন।

যেন কোন্ স্বপ্নের ঘোরে সে বলল—"এমন সুন্দর—এমন আনন্দময়—তার মধ্যে পাখীটার এ কাতর চীৎকার! ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও!"

তখন পঞ্চায়ুধের আদেশে পাখী দুটিকে একখানা অতিথ-নীড়ে তুলে রাখা হ'ল। অতিথ-নীড় হচ্ছে একটা খড়বিছান চুপড়ি—উঁচু খোঁটার ওপর বাঁধা। সন্ধ্যার সময় দিশাহারা পাখীরা সেখানে আশ্রয় নিয়ে রাত্রি কাটায়।

পাখীটার আর্ত্তনাদ শান্ত হ'লে ব্যাধ পঞ্চায়ুধের হাতখানা কপালের ওপর চেপে ধ'রে বলল —"আঃ! কি শীতল! আমার সব জ্বালা জুড়িয়ে গেছে! অপরূপ এক স্বপ্ন দেখলাম দেবতা!"

"কি স্বপ্ন, ভাই?"—পঞ্চায়ুধ জিজ্ঞাসিলেন।

ব্যাধ স্বপ্নকথা বলতে লাগল :—

"দেখলাম, আমি যেন এক স্বপ্নের রাজ্যে বেড়াচ্ছি। সে-রাজ্যে আলো, ছায়া একে অন্যে জড়িয়ে আছে। পশু-পাখী মানুষের মত কথা বলে, আর গাছের ফুল-পাতা শিশুদের মত হাসে কাঁদে।

সে-রাজ্যে বোধিসত্ত্ব জন্ম নিয়েছেন কুরঙ্গ হ'য়ে। এক নির্ম্মল জলপূর্ণ হ্রদ। তার তীরে গভীর অরণ্য; সে-অরণ্যে এক ঝোপের ভেতর থাকে কুরঙ্গ। গাছে থাকে এক কাঠ-ঠোক্‌রা, আর জলে থাকে এক কচ্ছপ। তিনজনে ভারি ভাব।

কুরঙ্গ হ্রদে নামে জলপান করতে—পথে পড়ে ক্ষুরের দাগ। তাই দেখে এক ব্যাধ পেতে গেল ফাঁদ। রাত্রির প্রথম প্রহরে হ্রদে নামতে গিয়ে বোধিসত্ত্ব পড়লেন সেই ফাঁদে ধরা। হরিণেরা ফাঁদে ধরা প'ড়ে যেমন চেঁচায়, তেমনি চেঁচিয়ে উঠলেন বোধিসত্ত্ব। চীৎকার শুনে কাঠ-ঠোকরা নেমে এল তার গাছের ডাল থেকে, কচ্ছপ উঠে' এল জল থেকে। তিন বন্ধুতে পরামর্শ চলল। কাঠ-ঠোক্‌রা বলল—'বন্ধু কচ্ছপ! তোমার দাঁত আছে, তুমি এই ফাঁদের বাঁধন কেটে দাও। ব্যাধ ততক্ষণ যাতে না আসতে পারে, আমি তার ব্যবস্থা করব।'

কচ্ছপ তখন ফাঁদের তন্তু কাটতে লাগল, আর কাঠ-ঠোক্‌রা উড়ে' গেল ব্যাধের বাড়ী।

রাত পোহালে ব্যাধ ছুরি হাতে ক'রে ঘরের বাইরে পা দিতে যাচ্ছে, এমন সময় কাঠ-ঠোক্‌রা ছুটে এসে মারে তার মুখে পাখার ঝাপ্‌টা। ব্যাধ চম্‌কে উঠে' ভাবে, বাধা পড়ল—এ অশুভ লক্ষণ। আবার সে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে। খানিক পরে ফের সে উঠে' দাঁড়ায়। পাখী ভাবে, এবার ব্যাধ পেছনের দরজা দিয়ে বা'র হ'তে চাইবে। ব্যাধ ভাবে, আগে সমুখের দরজায় বাধা পড়েছিল, এবার পেছনের দরজা দিয়ে যাই। সুতরাং দু'জনাই যায় পেছন দিকে। ব্যাধ এবারও বাইরে পা দিতেই পাখী বিকট চীৎকার ক'রে মারল তার মুখে পাখার ঝাপ্‌টা।

'পাখীটা এবারও বাধা দিল!'—ব'লে সে মন ভারী ক'রে গিয়ে শুয়ে পড়ে এবং সূর্য্য না ওঠা পর্য্যন্ত আর বিছানা ছেড়ে ওঠে না। তারপর আবার তার ছুরি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

কাঠ-ঠোক্‌রা ওদিকে উড়ে' গেছে বন্ধুদের কাছে; বলছে—'ঐ দেখ ব্যাধ এল ব'লে।'

কচ্ছপ ততক্ষণে ফাঁদের রজ্জু সব প্রায় কেটে ফেলেছে। কিন্তু একখানা রজ্জু চামড়ার তৈরী, এমনি শক্ত যে বেচারার দাঁতগুলো বুঝি খসে' যায়। মাঢ়ী থেকে ঝলকে ঝলকে রক্ত ঝরে' পড়ছে;—

প্রাণ তার যায়-যায়। কুরঙ্গ চেয়ে দেখল ব্যাধ ছুরি হাতে ছুটে আসছে বিদ্যুতের মত। মরিয়া হ'য়ে সে এমন বেগে পা ছুঁড়ে মারল যে, বাঁধন গেল ছিঁড়ে, আর সে পালিয়ে গেল বনের আড়ালে।

দেখে একদিকে যেমন আমার প্রাণটা আনন্দে নাচে, অপর দিকে তেমনি কচ্ছপের জন্য ব্যথিয়ে ওঠে। ধিক্ আমার জাতিকে—নিষ্ঠুর ব্যাধ কচ্ছপের অন্তরাত্মাকে জানল না; তাকে এক থলিয়ায় পূরে নিল। আমার সমস্ত প্রাণ তখন আকুল হ'য়ে বলতে চায়—ছেড়ে দে! ওরে ছেড়ে দে! ওরে ছেড়ে দে! কিন্তু কথা বেঁধে যায় গলায়—শ্বাস হ'য়ে যায় রুদ্ধ।

ব্যাধ ছুরি হাতে ছুটে আসছে

বোধিসত্ত্ব দেখেন, কচ্ছপ ধরা পড়েছে; হয়তো ভাবেন, প্রাণ দিয়েও তাকে বাঁচাতে হবে। ব্যাধকে দেখা দিয়ে তিনি মাটির ওপর শুয়ে পড়েন—যেন ভয় ক্লান্ত এভাবে। ব্যাধ তখন কচ্ছপকে এক গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে ছোটে কুরঙ্গকে ধরতে। কুরঙ্গ উঠে' আবার দৌড়ায়, কিন্তু যেন অত্যন্ত দুর্ব্বল। ব্যাধকে সে ধরা দেয়, দেয় না। এমনি ক'রে লোভ দেখিয়ে তাকে নিয়ে যায় অনেকদূর! আমার প্রাণ উদ্বেগে কাঁপতে থাকে। হঠাৎ কুরঙ্গ ছুটে' পালায় আর চোখ পালটিতে কচ্ছপের কাছে হাজির হ'য়ে শিং দিয়ে দেয় সেই থলেটি ছিঁড়ে; কচ্ছপ মাটিতে প'ড়ে পালিয়ে যায় হ্রদে! আর আমি আনন্দে চীৎকার ক'রে উঠি—'জয় বোধিসত্ত্বের জয়!' "

—৪—

স্বপ্ন বলা শেষ হ'লে ব্যাধ প্রতিজ্ঞা করল—"আজ থেকে আমি আর পশু-পাখী মারব না। ওই পাখীটার ওপরও আমার দাবী আর রইল না।"

আচার্য্যদেব সব দেখে পঞ্চায়ুধকে আশীর্ব্বাদ ক'রে বললেন—"পুত্র! তোমার শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে। তুমি এখন দেশে যেতে পার। এই লও আমার আশীর্ব্বাদ সহ পাঁচটি বাণ। এই পঞ্চবাণের গুণে তুমি সকল বিপদ থেকে মুক্ত হবে।"

পঞ্চায়ুধ পঞ্চ অস্ত্রে সজ্জিত হ'য়ে আচার্য্যের পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে চললেন দেশের দিকে। তক্ষশীলা হ'তে বারাণসী পায়ে হেঁটে গেলে আড়াই মাসের পথ। সেই অরণ্য-পথে

বাঘ-ভালুকের অন্ত ছিল না। কিন্তু রাজপুত্রের মনে ছিল না হিংসা। তাই বাঘ-ভালুকও তাঁকে পথ ছেড়ে দিল নির্ব্বিবাদে।

বাঘ-ভালুক ছাড়াও ঐ অরণ্যে আর এক আপদ ছিল—সে এক দানব; নাম তার কেশী। পঞ্চায়ুধ ধনু কাঁধে ফেলে বুক ফুলিয়ে মনের আনন্দে শিস্ দিতে দিতে চলেছেন, এমন সময় তাঁর পথ রোধ ক'রে দাঁড়াল কেশী। কেশীর দেহ তালগাছের মত উঁচু। মাথাটি জালার মত প্রকাণ্ড।

চোখ দুটি ভাটার মত। ঠোঁট বাজের ঠোঁটের মত। তার দু'দিক থেকে বেরিয়েছে দুটি দাঁত—যেন দুটি প্রকাণ্ড সাদা মূলো। ভুঁড়িটি রক্তবর্ণ; আর হাতের তেলো ঝুলের মত কালো। পঞ্চায়ুধকে দেখে সে ঢোলের মত কড়্‌কড়্ ক'রে বলল—"কে হে ছোকরা? কোথায় যাওয়া হচ্ছে? থাম!"

পঞ্চায়ুধ বললেন—"দানব! তোমার সঙ্গে আমার যে দেখা হবে তা আমি আগেই জানি। কিন্তু আমাকে ঘাটালে তোমার ভাল হবে না বলছি। আমার কাছে বিষ-মাখানো তীর আছে! আর এক পা এগিয়েছ কি, তার একটা তোমার কপালে বিঁধেছে!"

পঞ্চায়ুধের কথা শুনে কেশী হেসে উঠল—যেন শালগাছের মাথায় বাজ পড়ল! পঞ্চায়ুধ ধনুকে তীর জুড়ে দানবের কপাল লক্ষ্য ক'রে মারলেন। কিন্তু তীর কেশীর কপালভরা কেশের মধ্যে লেগে ঝুলে রইল। রাগে রাজকুমার আর এক তীর ছুঁড়লেন—তারপর আর একটি—তারপর আর একটি—একে একে পঞ্চাশটি, কিন্তু সবগুলো তীরই কেশীর দেহভরা কেশে লেগে ঝুলে রইল! দানব তখন গা ঝাড়া দিয়ে উঠে হাত বাড়িয়ে পঞ্চায়ুধকে ধরতে চাইল। পঞ্চায়ুধ "আয় দেখি" ব'লে তরোয়ালের আঘাত হানলেন তার মাথায়; কিন্তু লম্বা তরোয়ালখানা লেগে রইল তার ঝাকড়া চুলে তীরগুলোর মত। তা' দেখে তিনি ছুঁড়লেন বর্শা,

তার বুক লক্ষ্য ক'রে, তাও ঝুলে রইল তার বুকের লোমে লেগে। তারপর হানলেন গদার ঘা, গদাও জড়িয়ে রইল তার লোমে। পঞ্চায়ুধ গর্জ্জন ক'রে বললেন—"দানব! এখনো তুমি রাজপুত্র পঞ্চায়ুধের নাম শোন নি। আমি যখন এ অরণ্যে প্রবেশ করি, তখন অস্ত্রশস্ত্রের ওপর আমার নির্ভর ছিল না; আমার নির্ভর ছিল আমার নিজের ওপর। দেখ, এই বজ্রমুষ্টির এক আঘাতে তোমাকে ধূলির ওপর গুঁড়িয়ে দিচ্ছি।" এই ব'লে তিনি কেশীর কপালে ডানহাতে ঘুষি মারলেন; ডানহাত তার লোমে জড়িয়ে গেল। মারলেন তখন বাঁ-হাতের আঘাত—বাঁ-হাতও লেগে রইল। তারপর দুই পা, তারপর মাথা—সব জড়িয়ে গেল কেশীর কেশে! এম্‌নি ক'রে পঞ্চ অঙ্গে জড়িত হ'য়েও পঞ্চায়ুধ ভীত হ'লেন না; চেঁচিয়ে বললেন—"আমার শরীর তোর কাছে বন্দী, কিন্তু আমার আত্মা এখনও মুক্ত; তাই দিয়ে তোকে আঘাত করব।"

সে দানব ভাবল—এ তো সাধারণ মানুষ নয়! এ পৌরুষের অবতার, বীরের সেরা বীর, আমার মত দানবের হাতে একেবারে অসহায়ের মত বন্দী হ'য়েও কাঁপছে না তার একগাছি কেশ! এত নির্ভীক ও কি ক'রে হ'ল?—এসব ভেবে, সে শুধাল—"যুবক! মৃত্যুকে কি তুমি ভয় কর না?"

পঞ্চায়ুধ বললেন—"মৃত্যুকে ভয় করব কেন? প্রত্যেক জীবনেরই একটা অন্ত আছে। মরণ ত স্বাভাবিক! ভয় ক'রে তাকে ঠেকিয়ে রাখবে কে? তা' ছাড়া দেহের ভেতর আছে কুলিশ-কঠিন তরবারি, তার নাম জ্ঞান। আমাকে গিলে ফেললেও সে তরবারি তুমি হজম করতে পারবে না। তোমার শরীরের লোম তোমাকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করেছে, কিন্তু সেই তরবারি দিয়ে ভেতরে যে আঘাত হানব, তার থেকে তোমাকে বাঁচাবে কে? তোমার হাতে আমার মৃত্যুর অর্থ তোমারও মৃত্যু। এই জন্যই আমি নির্ভীক।"

দানব চিন্তা করতে লাগল; ভাবল—এই তরুণ বিদ্যার্থী যা বলছে, তা সত্য—খাঁটি সত্য। এই বীরের এতটুকু কণাও আমি হজম করতে পারব না। আমি তাকে মুক্তি দেব। এই ভেবে সে পঞ্চায়ুধকে ছেড়ে দিয়ে বলল—"যুবক! তুমি পুরুষ-সিংহ। আমি তোমাকে খাব না। আমার কেশ-গ্রহ থেকে মুক্তি পেয়ে রাহু-মুক্ত চন্দ্রের মত দেশে ফিরে গিয়ে বাপ-মার আনন্দ বর্দ্ধন কর।"

পঞ্চায়ুধ বললেন—"আমি ত যাচ্ছি; কিন্তু তুমি স্মরণ কর তোমার পূর্ব্বজন্মের কথা। কোন্ জন্মে কি পাপ করেছিলে, তাই জন্মেছ পিশাচ হ'য়ে;—পেটুক হয়েছ, মানুষ মারছ, মাংস খাচ্ছ। এজন্মেও যদি পাপ-পথ না ছাড়, তবে ছুটে' চলবে চিরদিন অধঃপাতের দিকে।"

এমনি ক'রে পঞ্চায়ুধ তাকে শিখালেন পাঁচটি নিষেধ;—হিংসা করবে না, চুরি করবে না, লোভ করবে না, অহঙ্কার করবে না এবং মিথ্যা বলবে না। আর শিখালেন পাঁচটি আদেশ;—চিত্তকে সংযত রাখবে, বাসনা ত্যাগ করবে, পবিত্র বিষয় চিন্তা করবে, পরের উপকার করবে, সুখ-দুঃখকে শান্তমনে বরণ করবে।

তাঁর উপদেশে, যে ছিল নরভুক্ রাক্ষস, সে হ'ল আত্মত্যাগী পুরুষ, পঞ্চশীলে সংস্থিত—অর্থাৎ পাঁচটি সদাচারে অভ্যস্ত। তখন পঞ্চায়ুধ তাকে বনের রাজা ক'রে এবং ধর্ম্মে স্থির থাকতে ব'লে সে-বন থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'লেন।

পথে পথে দুর্জ্জনকে শাসন ক'রে এবং দুর্ব্বলকে অভয় দিয়ে দেড়মাস পরে পঞ্চ অস্ত্রে শোভিত পঞ্চায়ুধ বাপ-মার কোলে ফিরে এলেন। কিছুদিন পর রাজ্যশুদ্ধ লোকের আনন্দের মধ্যে তিনি রাজ্য-ভার মাথায় নিলেন। বুড়ো রাজা গুণী পুত্রকে রাজ্য দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ধ্যান-ধারণায় মন দিলেন।

আগমনীর আগে

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ

শিশুদের বাবা-লোক যে-সাহিত্যে ভোলে শোক, তাই লিখি পড়ি ;
বাবাদের বংশধর যা পেতে বাড়ায় কর, কেমনে তা গড়ি ?
মানি, মোর গৃহাঙ্গন মুখরিয়া শিশুগণ করে দাপাদাপি,—
কিন্তু তা'রা কি যে খোঁজে, কোন্ পথে কি যে বোঝে, কি দিয়ে তা মাপি ?
কুচায়ে পাথরকুচি কেহ বসি ভাজে লুচি কাদা-গোলা জলে,
জুড়িয়া কাঁঠালপাতা, কেহ বা বানায়ে ছাতা, মাথা ঢেকে চলে ;
পথ থেকে ধ'রে আনা বাঘের মাসীর ছানা চট্‌কায় কেহ,
পুতুলের মেটে গালে অকারণে কেহ ঢালে অযাচিত স্নেহ ;
ছিঁড়িয়া পড়ার বই, বাতাসে ছড়ায় খৈ কেহ বা দু'হাতে,
কেউ বকে, কেউ শোনে, আকাশের তারা গোণে শুয়ে বিছানাতে !

... ...

এ-হেন শিশুর সাথী, কোথা পাবো রাতারাতি, ভাবিতেছি তাই,
চড়িয়া মেঘের তরী, খুসী-ভরা কোনো পরী এলে বেঁচে যাই।
দু'খানি ডানায় তা'র, ঢালিয়া ভাবনা-ভার, চোখ বুজে বসি—
উঠে ঐ নদীকূল, মাঠ-ঘাট, ফল-ফুল, স্বতঃই সরসি' !...
যতদূর দেখা যায়, ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্নায় ছবি-বৎ সব—
বায়ু বহে ঝির্-ঝির্, তরুশির, নদীতীর, প্রতীক্ষা-নীরব,

টেবিলেতে জ্বলে বাতি,
দ্রুত বেড়ে চলে রাতি,
চলে না লেখনী!

কোথা তরী, কোথা পরী?
চোখ আসে ঘুমে ভরি'!
ঢুলি যে এখনই!

অবিরত ডাকে ঝিঁঝিঁ,
লেখাগুলো হিজিবিজি,
শ্লথ সারা দেহ—

টিক্‌টিকি দেয়ালেতে,
চলেছে ফড়িং খেতে,
ঘরে নাই কেহ।

ঘুটঘুটে আঁধিয়ার,
নাহি তল নাহি পার,
ঘুমের সাহারা!

অতিবাহি চ'লে যাই,
আগুপিছু কেহ নাই
সজাগ পাহারা!

দোলায় গমের শীষ,
স্বপনের ওয়েসিস্
আলেয়ার শিখা

তিমিরের বুক চিরে,
হারাণো স্মৃতির তীরে,
আলো ধরে ফিকা!

সে-আলোর পথ ধরি'
সহসা আসিয়া পড়ি
এ-কোন্ পাহাড়ে?

ষাঁড়ে চ'ড়ে এক বুড়ো
সর্ব্বাঙ্গে ছাই-এর গুঁড়ো,
এসে পড়ে ঘাড়ে!

পিছু হটে উঠি হাঁকি—
"কে? মহেশ-খুড়ো নাকি?"—
চায় সে ফিরিয়া;

"এত রাতে কোথা চল?"
—"আর বাবা, কেন বল—
চটিতং প্রিয়া!"

"চড়িয়া হাতীর পিঠে
যাবেন বাপের ভিটে,—
লিখিয়াছে পাঁজী,

নন্দী এনেছে ঘোড়া,
তাও এক ঠ্যাং খোঁড়া—
বেটা মহা পাজী!

নিজেই চলেছি তাই,
দেখি কোথা হাতী পাই,
না পোহাতে রাত,

তুমি খুঁজে ফেরো পরী,
আমি খুঁজিতেছি করী,
দাও হাতে হাত।"

... ...

হাত লেগে বাতিদান
মেঝে প'ড়ে খান্ খান্,
ঘুম গেল ছুটে;

প্রভাতী গাহিছে পাখী,
শেফালি ঝরায় শাখী,
পড়িলাম উঠে।

আসিছেন দশভুজা,
সমারোহে হবে পূজা
দক্ষিণ পাড়ায়,

বন্ধুগণ সেথা বসি'
আয় ব্যয় মাজি' ঘষি'
হিসাব বাড়ায়;

চাল-কলা, ফলমূল,
ঘট, সরা, জবাফুল,
ঢাক-ঢোল কাঁসি—

যাত্রা-গান, থিয়েটার,
যা' আসে খেয়ালে যার,
চলে ফরমাসি!

সব হিসাবের শেষে,
প্রশ্ন ওঠে মনে ভেসে—
"হাতীর খোরাক

কে যোগাবে অতঃপর?"—
এস, এস বন্ধুবর,
তাই ভাবা যাক্!

সময় নাকি নাই ?

শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী

ভদ্রলোকটি নাকি বেজায় ব্যস্ত—এক মুহূর্ত্তও তাঁর সময় নাই। কথা জিজ্ঞাসা করলেই বলেন, "আমার মরবারও সময় নাই।" সবাই বলে—"আরে, অত ব্যস্ত হ'য়ো না ;—কোন্‌দিন তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে কি বিভ্রাট বাধাবে।" শেষটায় হ'লও তাই। 'সময় নাই' মনে ক'রে দারুণ বেগে মোটর চালাতে গিয়ে হঠাৎ একদিন মোটরের টায়ার ফেটে, গাছের সঙ্গে ভীষণ বেগে ধাক্কা লেগে মোটর, চালক, সকলের দফা একেবারে শেষ! এখন আর তাঁর মোটেই সময় নাই ;—অর্থাৎ, তিনিই নাই। কলির মানুষের অবস্থা অনেকটা এই রকমেরই। তবু মানুষ বলে, "সময় বাঁচাও ;—তাড়াতাড়ি কর!—কেন না, কলিযুগে সময়ই টাকা (Time is money), আর পৃথিবী টাকার বশ!!"

ইংলণ্ডে যখন প্রথম রেলগাড়ীর চলাচল আরম্ভ হয়, তখন এক পত্রিকায় লিখেছিল, "মানুষের সখ কিছু কম নয়। ঘণ্টায় দশ মাইল বেগে চলবার মত এঞ্জিন বানিয়েছে ; আবার তার সঙ্গে গাড়ীও লাগিয়েছে। যে রাস্তা দিয়ে এই গাড়ীগুলো যাবে, তার

আধুনিক দ্রুতগামী রেল-এঞ্জিন

আশেপাশের লোককে পাগল না ক'রে ছাড়বে না। এত বেগে চলা কি সহজ কথা?" এর অল্পকাল পরে একদিন রেল-দুর্ঘটনা হ'য়ে এঞ্জিন লাইন থেকে প'ড়ে গেল, আর গাড়ীর আরোহীদের কয়েকজন মারা গেল। তখন সেই পত্রিকা লিখল—"ঘণ্টায় দশ-বারো মাইল বেগে যাবার সখ হয়েছিল,—এবার সে সখ নিশ্চয়ই মিটবে!" মিটে যাওয়া

তো দূরের কথা, তখন থেকেই আরো বেগে রেল চালাবার চেষ্টা হ'তে লাগল। ঘণ্টায় দশ-পনের মাইল থেকে এখন একশ' মাইলও ছাড়িয়ে গেছে। সেদিন আমেরিকার একটি রেল ঘণ্টায় দেড়শ' মাইল বেগে চলেছিল। মানুষ এতেও সন্তুষ্ট নয়; ভবিষ্যতের রেল নাকি আরও অনেক বেগে যাবে।

ইতিমধ্যে যে আবার মোটর দেখা দিয়েছে, তারও অবস্থা ঐ রকমেরই; রেলের চেয়ে কিছুই কম যায় না। সেদিন এক সাহেব একটা রেসিং মোটরে চ'ড়ে ঘণ্টায় দুইশ' মাইল বেগে গিয়েছিলেন। পরে এর চেয়েও তাড়াতাড়ি যাবার আশা আছে।

আধুনিক যাত্রিবাহী এরোপ্লেনের ভেতরের দৃশ্য

কিন্তু, এ সবেও চলবে না। রেলপথ বা মোটরের রাস্তা সুবিধামত আঁকিয়ে-বাঁকিয়ে নিয়ে যেতে হয়;—কোথাও নদীর বাধা, কোথাও পাহাড়, কোথাও সহর। বেশী জোরে চালালে নানা রকমে দুর্ঘটনা ঘটারও সম্ভাবনা।

কলির ব্যস্ত মানুষ ভাবল—"আকাশপথে যদি উড়ে' যাওয়া যায়, তা' হ'লে তো রাস্তা একেবারে সোজা হ'য়ে যায়। নাক-বরাবর গেলেই হ'ল। কাজেই, উড়ে' যাবার চেষ্টা করতে হবে।" বহুকাল ধ'রে এসব জল্পনা-কল্পনা চলছিল। আকাশপথে বাতাসে ভেসে চলার জন্য ডানাওয়ালা যন্ত্র 'Glider' তৈরী ক'রে অনেককাল আগে

থেকেই পরীক্ষা চলেছিল ;—পরীক্ষা অনেকটা সফলও হয়েছিল। একজন ভাবলেন, "এই গ্লাইডার যন্ত্রে এঞ্জিন লাগিয়ে ওড়ার ব্যবস্থা করলে কেমন হয় ?" শেষটায় তাই হ'লও। একটি এঞ্জিনের সঙ্গে বৈদ্যুতিক টেবিল-পাখার 'পাখা'র (blades) মত জিনিস লাগিয়ে, সেই পাখা বন্-বন্ ক'রে সাম্‌নে ঘুরবার ব্যবস্থা হ'ল। এই রকমেরই একটি কল (যাকে এরোপ্লেন নাম দেওয়া হ'ল), আজ থেকে ত্রিশ বছরের কিছু বেশী আগে, অল্পক্ষণ আকাশে উড়ে' সমস্ত পৃথিবীর লোককে অবাক্ ক'রে দিয়েছিল। সে তো বহুদিনের কথা। আধুনিক বিরাট ধাতু-নির্ম্মিত এরোপ্লেন বাতাস, ঝড়, বৃষ্টি প্রভৃতিকে অগ্রাহ্য ক'রে মেঘের রাজ্য দিয়ে, অনেকগুলো আরোহী নিয়ে, ঘণ্টায় প্রায় দুইশ' মাইল বেগে পাড়ি দিচ্ছে। তার ভেতরে শোবার, বসবার, খাবার ব্যবস্থা আছে, ডাঙ্গার সঙ্গে রেডিও-যন্ত্রে যোগ রাখা হচ্ছে। রেলে যেখানে যেতে প্রায় আট-দশ ঘণ্টা লাগে, এরোপ্লেনে যেতে মাত্র এক ঘণ্টা লাগে। যুদ্ধের জন্য যে সব এরোপ্লেন তৈরী করা হয়েছে, তার এক একটির এর দ্বিগুণ বেগে যাবার ক্ষমতা আছে। একবার ভেবে দেখ !
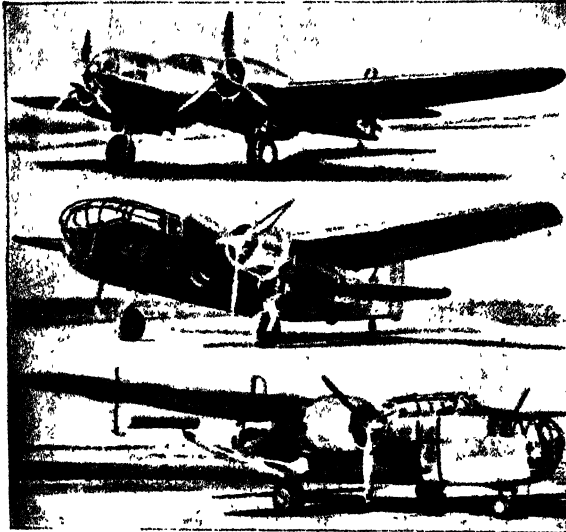
আধুনিক দ্রুতগামী এরোপ্লেন—মিনিটে ৬ মাইল যায় !

তা'তেও মানুষ সন্তুষ্ট নয়। সে ভাবছে, "এরোপ্লেন যখন ঘণ্টায় চারশ' মাইল বেগে চলে, তখন বাতাসের বাধাও সাংঘাতিক হ'য়ে দাঁড়ায়। তার চেয়ে বাতাসের এলাকার বাইরে গিয়ে উড়ে' চললেই তো আরো বেগে চলার উপায় হয় !" তাই সে এখন হাউই-এরোপ্লেন বানাবার চেষ্টা করছে। সেটিকে একটি কামানের মত জিনিস থেকে ঠিক গোলার মত ছুঁড়ে মারা হবে। সেটিও আকাশপথে প্রায় খাড়াভাবে উঠে মুহূর্ত্তে বাতাসের এলাকা ছাড়িয়ে, হাল্কা হ'য়ে যাবে। তখন তার পেছনে লাগানো-হাউই ফেটে সেটিকে আরো জোরে জোরে চালাবে। এই অবস্থায় এরোপ্লেনের

ডানা দুটি মোড়া থাকবে। যখন এরোপ্লেনের গতি আবার নীচের দিকে হবে, তখন আস্তে আস্তে ডানা খুলে যাবে আর সাধারণ এরোপ্লেনের মত সেই কলটি মাটিতে নামবে। এই উপায়ে নাকি ঘণ্টায় সাতশ' কি আটশ' মাইল পর্য্যন্ত বেগে আকাশপথে চলাফেরা করা যাবে। কিন্তু, হিসাবের একটু নড়চড় হ'লেই আরোহী এবং এরোপ্লেন সবারই দফা শেষ! এযুগের মানুষ কিন্তু তা'তে কিছুমাত্র দম্‌বার পাত্র নয়।

আকাশে তো আর বাস করা যায় না; তাই স্থলপথে চলাফেরা করতেও হবে। তা'তেও যথাসাধ্য সময় বাঁচান চাই। মোটরে ব'সেই চিঠি ডাকে দেওয়া, ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেওয়া—এমন কি, সিনেমা দেখা পর্য্যন্ত যাতে হয়, তার ব্যবস্থা হচ্ছে! মোটরের
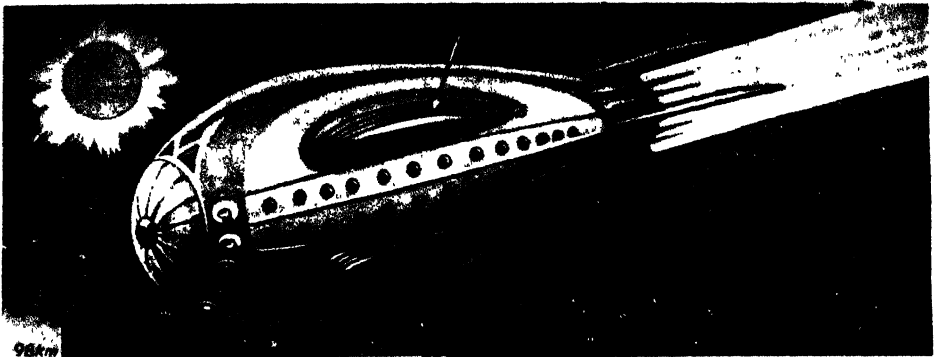
হাউই-এরোপ্লেন বাতাসের এলাকা ছাড়িয়ে চলেছে (কল্পিত); ডানা দুটি মোড়া।

রাস্তা ভবিষ্যতে এমনভাবে তৈরী করা হবে যে, মোটরে চ'ড়ে একেবারে সাত-আট তলার সাম্‌নে দিয়ে যাওয়া চলবে; যে তলায় তোমার ঘর, সেখানে নেমে গেলেই হ'ল। রাস্তারই অংশ নাকি ভবিষ্যতে 'চলন্ত' হবে। একটি অংশ থাকবে দাঁড়িয়ে; তা' থেকে চলন্ত অংশে চ'ড়ে ঘণ্টায় পাঁচ-সাত মাইল বেগে অনায়াসে এগিয়ে যেতে পারবে। দোকানে গেলে আর সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠতে হবে না। সিঁড়ির একটি ধাপে দাঁড়ালে সেই ধাপটিও ক্রমশঃ ওপরে উঠে যাবে। 'লিফ্‌ট্' চড়লে অনেক অসুবিধা, তা'তে একসঙ্গে তিন-চার জনের বেশী উঠতে পারে না। আবার একসঙ্গে ওঠা-নামাও চলে না। চালক না হ'লে 'লিফ্‌ট্' ব্যবহার করাও যায় না। চলন্ত সিঁড়িতে সে-সব কোন অসুবিধা নাই। অর্দ্ধেকটা তার ওপর-মুখী, অর্দ্ধেকটা নীচ-মুখী। চড়তে হ'লে বাঁয়ের অংশের নীচের

ধাপে উঠলেই হ'ল। আর নামতে হ'লে, ওপর থেকে ডাইনের অংশের (অর্থাৎ, নীচ থেকে দেখলে যেটা ডাইন) ওপরের সিঁড়িতে দাঁড়ালেই হ'ল। এই ধরণের সিঁড়ির নাম escalator ; বিলাতে অনেক জায়গায় এ রকম সিঁড়ি লাগানো হয়েছে।

শুধু কি চলাফেরার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করছে মানুষ? যে-কোনও আধুনিক কারখানায় যাও, দেখবে সময় বাঁচাবার কত রকমের ব্যবস্থা। সব কলই চাই 'অটোমেটিক'; অর্থাৎ, মানুষের সাহায্য ছাড়া যা চলতে পারে। ছাপাখানা ব্যাপারে তো 'অটোমেটিক' কল চারদিকেই দেখবে। টক্‌টক্ ক'রে কী-বোর্ড টেনে চট্‌পট্ লাইন-কে-লাইন অক্ষর কলের সাহায্যেই ঢালাই হ'য়ে যাচ্ছে। ঢালাই অক্ষর থেকে ছাঁচ নিয়ে, তা' থেকে চোঙ্গার আকারে সীসার নকল ঢেলে, চোঙ্গার গায়ে কালী লাগিয়ে, প্রকাণ্ড 'রোটারি' ছাপা-কলে শত শত গজ লম্বা কাগজের থান থেকে ঘণ্টায় কুড়ি-পঁচিশ হাজার সংবাদপত্র ছাপা হ'য়ে, কাটা এবং ভাঁজ হ'য়ে হুহু শব্দে কল থেকে বেরিয়ে আসছে।
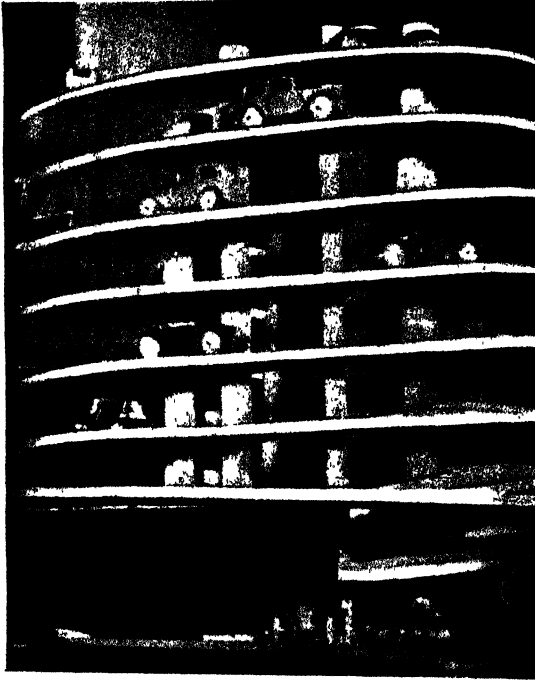
বাড়ীর আটতলায় মোটর উঠে' চলেছে

সবই যদি তাড়াতাড়ি করা দরকার, খাওয়াই বা কেন তাড়াতাড়ি হবে না? একথা ভেবে মানুষ খাবার জিনিসকে যথাসম্ভব নরম, আঁশহীন ক'রে তুলেছে। খাবারে 'খাদ্যপ্রাণ' আছে, কিন্তু সে খাবার তৈরী করতে হ'লে রান্নার পাঠ অনেকটা বাদ দেওয়া দরকার। যত কাঁচা খোসাযুক্ত শক্ত খাবার আমরা খাব, ততই চিবিয়ে খাবার দরকার হবে এবং খাবার সময়ও তত বেশী লাগবে। খাবার সময় আমরা অনেক

কমিয়েছি সন্দেহ নাই, কিন্তু তার ফলে আমাদের স্বাস্থ্যের সর্ব্বনাশ হচ্ছে। কি মুস্কিল! এদিক থাকে তো ওদিক থাকে না।

কৃষির ব্যাপারে, ফুল-ফলের চাষেও কি এই তাড়াতাড়ির নেশা ধরেছে?—হ্যাঁ, ধরেছে বই কি! দিনে রাতে চাষ ক'রে, খুব ভাল সার দিয়ে, বৈদ্যুতিক তাপে আর বিদ্যুৎপ্রবাহে অনিষ্টকারী পোকা-মাকড়দের মেরে শিকড়কে তাজা ক'রে, তরকারী আর ফলকে কৃত্রিম আলোর সাহায্যে পাকিয়ে তোলা হচ্ছে। অসময়ে ফসল জন্মাবারও চেষ্টা হচ্ছে। মোট কথা, এই ব্যাপারেও "সময় নাকি নাই!"

এযুগের সভ্যতার কলঙ্ক, যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যাপারেও দেখা যাচ্ছে—"সময় নাই"। মোটর সাইকেল, লরি, 'ট্যাঙ্ক' নামক চলন্ত গোলাবর্ষী দুর্গ, বোমাবর্ষী, কামানবাহী এরোপ্লেন প্রভৃতির সাহায্যে এযুগের সৈন্যদল প্রতিদিন পঁচিশ-ত্রিশ মাইল অনায়াসে এগিয়ে যাচ্ছে। আকাশপথে বিরাট এরোপ্লেন, কামান, বোমা ইত্যাদি নিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে এসে শত্রুকে আক্রমণ করছে। সবারই শুধু "মারো! মারো" রব; কারণ, "সময় নাই"।

যেদিকে তাকাই, দেখি তাড়াতাড়ির নেশা;—"সময় নাই! সময় নাই!" রব। চল তাড়াতাড়ি, কাজ কর তাড়াতাড়ি, খাও তাড়াতাড়ি, টাকা রোজগার কর তাড়াতাড়ি, লড়াই কর তাড়াতাড়ি! সবার উপরে—মর তাড়াতাড়ি; অর্থাৎ এই সব তাড়াতাড়ির ফলে, দুর্ঘটনায় মর তাড়াতাড়ি! ব্যস্!—ফুরিয়ে গেল কলির 'সভ্য' মানুষ।

মরা মানুষের উপদ্রব

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, এম. এ., পি-এইচ্. ডি., বি. লিট্.

মৃত্যুর পর সাধারণতঃ মানুষের উপকার বা অপকার করিবার ক্ষমতা থাকে না। মৃতব্যক্তি যদি ভূত হইয়া উপদ্রব করে সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু মরা মানুষ সত্য সত্যই ভূত হয় কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ইতিহাসে দেখা যায় যে, ভূত না হইয়াও কখনও কখনও মরা মানুষ উপদ্রব করিতে পারে যদি তাহার মৃত্যু সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে। ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় রিচার্ড তাঁহার জ্যেষ্ঠ

ভ্রাতা চতুর্থ এডোয়ার্ডের দুইটি শিশুপুত্রকে গোপনে হত্যা করিয়াছিলেন। কখন, কেমন করিয়া তিনি বালক দুইটিকে খুন করিয়াছিলেন, কোথায় তাহাদের মৃতদেহ লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল, সাধারণ লোকে তাহা জানিত না। কাজেই রাজকুমারদিগের মৃত্যু সম্বন্ধে তাহারা একেবারে নিঃসন্দেহ হইতে পারে নাই। ইহার ফলে অনেকদিন পরে একজন দুষ্ট লোকে কনিষ্ঠ রাজকুমার বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়া দেশে অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছিল।

তোমরা নিশ্চয়ই পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধের কথা পড়িয়াছ। সেই যুদ্ধে মারাঠা-সেনাপতি সদাশিব রাও ভাউর মৃত্যু হয়। যুদ্ধের পরে তাঁহার মৃতদেহের সৎকার হইয়াছিল। সদাশিব রাও তখনকার পেশবা বালাজী রাওর পিতৃব্য-পুত্র। পাণিপথের যুদ্ধে মারাঠা-পক্ষে এত লোকের মৃত্যু হইয়াছিল যে, সদাশিব রাওর মৃত্যুর প্রত্যক্ষ সাক্ষী খুব বেশী ছিল না। সুতরাং কিছুদিনের মধ্যেই মারাঠা রাজ্যে একটা জনরব উঠিল যে, প্রকৃতপক্ষে ভাউ সাহেবের মৃত্যু হয় নাই, পরাজয়ের অপমানে তিনি আত্মীয়-স্বজনকে মুখ দেখাইতে পারিতেছেন না। তাঁহার পত্নীর মনে প্রথম অবধিই সদাশিব রাওর মৃত্যু সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল; এই জন্য তিনি কখনও সধবার চিহ্ন ও আচার ত্যাগ করেন নাই। শেষে মারাঠা দেশে সত্য সত্যই এক নকল ভাউ সাহেব আসিয়া হাজির হইলেন। তাহার দলে যোগ দিবার লোকেরও অভাব হইল না। অনেক কষ্টে তখনকার মারাঠা-কর্তৃপক্ষ তাহাকে ধরিয়া কয়েদ করিয়া রাখিলেন। লোকটার চেহারার সহিত মৃত ভাউ সাহেবের চেহারার এমন মিল ছিল যে, মারাঠা-প্রধানেরা কখনও তাহাকে ভাউ সাহেবের স্ত্রীর সম্মুখে হাজির করিতে সাহস পান নাই। তাঁহারা তদন্ত করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন যে, নকল ভাউ সাহেব এক কনোজিয়া ব্রাহ্মণ, আদৌ মহারাষ্ট্রীয় নহে।

দ্বিতীয় বাজীরাও যখন ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন তখন তাঁহার সেনাপতি ছিলেন বাপু গোখলে। গোখলে তখনকার মারাঠা-সেনানায়কদিগের মধ্যে সাহসে ও প্রভুভক্তিতে অদ্বিতীয় ছিলেন। যুদ্ধে নিহত হইলেও তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে সন্দেহের কোন সঙ্গত কারণ ছিল না; যেহেতু বহু পরিচিত লোকের সম্মুখে তাঁহার মৃতদেহের সৎকার হইয়াছিল। তথাপি কেমন করিয়া বলিতে পারি না কাহারও কাহারও মনে ধারণা হইয়াছিল যে, গোখলে বাঁচিয়া আছেন। তাঁহার স্ত্রী যমুনা বাঈ মনে করিতেন, গোখলে আরবদেশে লুকাইয়া আছেন। এই বিশ্বাসে তিনি মধ্যে মধ্যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র করিয়া বেড়াইয়াছেন, কিন্তু ইংরাজ সরকারের কোন অনিষ্ট করিতে পারেন নাই।

সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম নেতা নানা সাহেবের মৃত্যু সম্বন্ধেও এদেশে নানা প্রকার জল্পনা-কল্পনা হইয়াছে। সিপাহী যুদ্ধের শেষে নানা সাহেব যে কোথায় পলায়ন করিয়াছিলেন কেহ জানে না। এতদিনে যেখানেই হউক তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার পত্নী নেপালে জঙ্গ বাহাদুরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং নানা সাহেবও বোধহয় নেপালের কাছাকাছি কোথাও লুকাইয়া ছিলেন। তারপর কোথায় কি অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে কেহ বলিতে পারে না। কাণপুরের নির্ম্মম হত্যাকাণ্ডের জন্য নানা সাহেবের প্রতি ইংরাজদিগের খুব রাগ ছিল। নানা সাহেবকে ধরিতে পারিলে প্রচুর পুরস্কার পাইবার সম্ভাবনা ছিল। এই জন্য মধ্যে মধ্যে অনেক নিরীহ সাধু-সন্ন্যাসীকে নানা সাহেব সন্দেহে ধরপাকড়ও করা হইয়াছে। আমাদের ছেলেবেলায় একবার খবরের কাগজে পড়িয়াছিলাম যে, নানা সাহেব ভ্রমে পুলিশ একজন সন্ন্যাসীকে গ্রেপ্তার করিয়া পরে ছাড়িয়া দিয়াছে। আমার পরিচিত একজন বৃদ্ধ একদিন গম্ভীরভাবে বলিয়াছিলেন, 'নানা সাহেব কোথায় আছেন জান? রুশ-তুর্কী যুদ্ধের সময় যে ওসমান পাশা এত বীরত্ব দেখাইয়াছেন তিনিই নানা সাহেব, আর কেহ নহেন। নিজের দেশ হইতে সকলের চক্ষু এড়াইয়া একেবারে তিনি তুর্কী দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।'

সিপাহী যুদ্ধের আর একজন নায়ক সম্বন্ধেও তাঁহার নিজের প্রদেশের অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে একটি ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। প্রায় বিশ বৎসর আগে একজন ভোজপুরী দারোয়ানের সঙ্গে বাবু কুমার সিংহের কথা আলোচনা করিয়াছিলাম। কুমার সিংহের মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া সে ত হাসিয়াই অস্থির। অনেকক্ষণ পরে হাসি থামাইয়া সে আমাকে গম্ভীরভাবে জানাইয়া দিল যে, 'বাবু কুমার সিংহের মৃত্যু হয় নাই, হইতে পারে না। যেখানেই হউক তিনি তপস্যা করিতেছেন, সময় হইলেই আবার দেখা দিবেন।' সিপাহী বিদ্রোহের পর প্রায় একশত বৎসর হইতে চলিল, এখনও যদি তাঁহার অনুচরদিগের প্রপৌত্রেরা কুমার সিংহের ফিরিবার আশা করে তাহাদিগকে নিরাশ হইতে হইবে।

নেপোলিয়নের সেনাপতি মার্শাল নে সম্বন্ধেও এই রকমের একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। ইতিহাসে লেখে নেপোলিয়ন এলবা হইতে ফিরিবার পর নে বিনা আপত্তিতে তাঁহার সঙ্গে যোগ দেন। এই অপরাধে সামরিক আদালতের বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়। সৈনিকদিগের রীতি অনুসারে মার্শাল নে'কে গুলি করিয়া মারা হইয়াছিল। ফরাসীদেশে তাঁহার সমাধির উপরে এখনও তাঁহার নাম ও পরিচয় লেখা আছে।

এই বিবরণে যাঁহারা বিশ্বাস করেন না তাঁহারা বলেন যে, সেনাপতি ওয়েলিংটন ও নে উভয়েই ম্যাসন সম্প্রদায়ের লোক। ওয়েলিংটনের তদ্বিরে নে'র প্রাণদণ্ড রহিত হয়। প্যারিসে যেদিন নে'র প্রাণদণ্ড হইবার কথা তাহার কয়েক সপ্তাহ পরে চার্লস পীটার নে নামক এক ব্যক্তি আমেরিকায় একটি ছোট বন্দরে অবতরণ করেন। দুই বৎসর পরে তিনি একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতে আরম্ভ করেন। ঐ বিদ্যালয়ের একজন ছাত্রের সাক্ষ্যে প্রকাশ যে, নেপোলিয়নের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া নাকি তাহাদের মাষ্টার মহাশয় ক্লাসের ভিতর অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। তার পরদিন তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। এই ছেলেদের অভিভাবক মাষ্টার মহাশয়কে তাঁহার বোকামির জন্য তিরস্কার করিলে তিনি বলেন যে, 'আমার ভবিষ্যতের সকল আশা-ভরসা নষ্ট হইয়াছে, প্রাণ রাখিয়া আর লাভ কি?' মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে এই অজ্ঞাত-পরিচয় শিক্ষক নাকি তাঁহার চিকিৎসকের নিকট স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, তিনিই বিখ্যাত ফরাসী সেনানায়ক মার্শাল নে!

মরিয়াও তাঁহার অব্যাহতি নাই, নে'র শেষজীবন এখনও আমেরিকা ও ইউরোপের বহু লোকের নিকট এক সমস্যার বিষয়।

এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ যে, ভূত না হইয়াও মরা মানুষ কি ভাবে জীবিত মানুষের উদ্বেগ ও অশান্তির কারণ হইতে পারে।

আমার গ্রাম

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

শ্যামল বনের কোমল ছায়ায়
শীতল রহে আমার গ্রাম;
নীলাকাশ তার ঘরে বাঁধা,—
স্বপ্ন-ঘেরা পুণ্যধাম।
তার দরজায় দেয় পাহারা
কোকিল, দোয়েল আর শ্যামা;
দীঘির বুকে ফুটিয়ে কমল
নিত্য পূজে কোন্ বামা?

তারই বনের মধু খেয়ে
ভ্রমর মাতে গুণ-গানে;
নবীন উষা পরায় মুকুট,
চাঁদ চেয়ে রয় তার পানে।
গাভী ডাকে হাম্বা রবে
দূর পথিকে নয় জানা;
তাল, নারিকেল, ঝাউয়ের দলে
মাথা তুলে দেয় হানা।

'কানা নদী' পথ চেনে না—
এদিক ওদিক যায় ছুটে,
সদাই সুখে গ্রাম-জননীর
পায়ের ধুলা লয় লুটে।
সবুজ শাড়ীর পাড় বুনে দেয়
জুঁই, ধুতুরা, মল্লিকা।
পায়ের তলায় শালুক ফুটে,
টিপ্ দিয়ে যায় চন্দ্রিকা!

কালো মেঘে ধীরে এসে
মাথায় খোঁপা দেয় বেঁধে;
নীরব পদে রাত্রি নামে
ঝিল্লি জাগে গান সেধে।
আমের বনে ঘুঘু ডাকে
সকাল, সাঁঝ ও দুপুরে;
চাল্‌তা-তলায়, ঘাটের ধারে
শালিক ডেকে যায় ঘুরে।
পুকুর-পাড়ে বক ব'সে রয়
সকালবেলা একমনে;
কাক নেয়ে যায় ঝটঝাপটি,
ষাঁড় পিয়ে জল প্রাণপণে।

কলাবনের লম্বা ছায়ায়
সাপ শুয়ে রয় নির্ভয়ে;
সজনে, বাকস্, বাবলা, নোনার
সবুজ সারি দিক্ ছেয়ে।
দুষ্টু ছেলে দৌড়ে খেলে
কোলে, বুকে, দিন ভরি';
সন্ধ্যা বুলায় ঘুমের কাজল,—
কে কোথা যায় ঘর ফিরি'।

শেয়াল ডাকে নিঝুম রাতে,
পাহারা দেয় তান ধ'রে;
মা তো ঘুমায় অগাধ ঘুমে,
ঘুমাই মোরা রাত ভ'রে।
শান্ত মায়ের শান্ত ছেলে
আমরা যে ভাই সকলে;
দিনের পরে দিন চ'লে যায়
ঘুমের ঘোরে কোন্ ছেলে।
স্বভাব রাণীর স্নেহের মেয়ে
গ্রামের সেরা আমার গ্রাম;
শান্তি হেথা ঘর বেঁধেছে,
নেইকো এমন পুণ্যধাম।

বীজ-পত্র
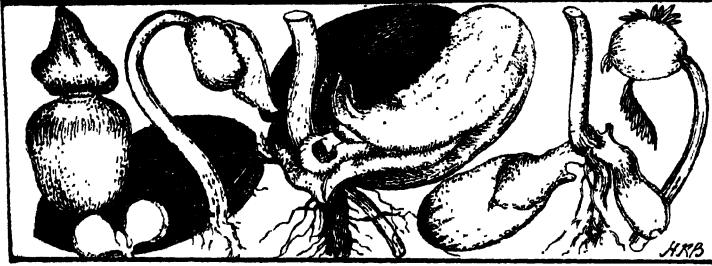
অধ্যাপক শ্রীহেমেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, এম. এ.

উদ্ভিদের বীজ এবং পত্র যে কি তাহা তোমরা সকলেই জান। কেননা, বহু উদ্ভিদের বীজ এবং পাতা তোমরা দেখিয়াছ। কিন্তু বীজ-পত্র (cotyledon) যে কি, তাহা হয়ত তোমরা সকলে জান না। উপরের ছবিতে তোমাদের পরিচিত কয়েকটি উদ্ভিদের বীজ-পত্র চিত্রিত রহিয়াছে। উহাদিগকে তোমরা প্রায় সব জায়গাতেই দেখিতে পাও, সুতরাং বীজ-পত্র দেখ নাই একথা কেহই বলিতে পারিবে না। বীজের ভিতর ভ্রূণে যে পত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারাই বীজ-পত্র নামে অভিহিত হয়। এই বীজ পত্রের সংখ্যা উদ্ভিদের শ্রেণী-ভেদে—সাধারণতঃ একটি কিংবা দুইটি। যাহার ভ্রূণে মাত্র একটি বীজ-পত্র থাকে, তাহাকে এক বীজ-পত্রী (monocot), আর যাহার ভ্রূণে দুইটি বীজ পত্র থাকে, তাহাকে দ্বিবীজ-পত্রী (dicot) উদ্ভিদ্ বলে। বীজ হইতে উৎপন্ন ক্রম-বর্দ্ধমান চারায় লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে যে, উহার অন্যান্য পাতা বীজের আবরণের বাহিরে গঠিত হয় এবং উদ্ভিদ্-বিশেষে প্রত্যেক গ্রন্থিতে একটি, দুইটি কিংবা ততোধিক পাতার উৎপত্তি হয়। কিন্তু বীজ-পত্র, ভ্রূণমুকুল (plumule) ও ভ্রূণমূলের (radicle) একসঙ্গে, বীজের ভিতর ভ্রূণভাণ্ডে (embryo-sack) গঠিত হইয়া থাকে। দ্বিবীজ-পত্রী ভ্রূণের বীজ-পত্রদ্বয় সকল ভ্রূণেই একটি গ্রন্থিতেই বিপরীতদিকে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। বীজ-পত্র, বীজ-উৎপাদক সকল উদ্ভিদেরই প্রথম পাতা।

সুইডেন-দেশবাসী সুপ্রসিদ্ধ উদ্ভিদ্‌বিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতপ্রবর লিনিয়াস (Linneous) এই বীজ-পত্রের সংখ্যার উপর নির্ভর করিয়াই অসংখ্য বীজ-উৎপাদক উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই শ্রেণীবিভাগের ফলে আজ উদ্ভিদ্-বিদ্যার আলোচনার যথেষ্ট সুবিধা

হইয়াছে। অধিকন্তু ডাল জাতীয় বহু শস্যের বীজ-পত্রই আমাদের খাদ্য। মুগ, মুশুরী, খেসারী, ছোলা, অরহর প্রভৃতি ডাল যাহা আমরা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করি তাহারা সকলেই ভ্রূণে উৎপন্ন বীজ-পত্র ছাড়া আর কিছুই নহে। এই সকল বিষয় ও বিভিন্ন বীজ-পত্রের বিচিত্র গঠন ও কার্য্যাবলীর বিষয় বিবেচনা করিয়া উহাদের সম্পর্কে আলোচনা করিলে, তোমরা যে বিশেষ আনন্দ লাভ করিবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

উহারা সরু, মোটা, গোল প্রভৃতি নানা আকারের হইয়া থাকে। উহাদের অনেকেরই আকার দেখিয়া উহারা যে উদ্ভিদের পাতা, সে বিষয়ে তোমাদের মনে সন্দেহ হওয়া মোটেই বিচিত্র নহে। কেননা, সাধারণ পাতার সঙ্গে উহাদের অনেকেরই আকারগত সাদৃশ্য খুবই কম। বিশেষতঃ ভ্রূণদণ্ডে, উহাদের উৎপত্তিস্থান, সাধারণ পাতার ন্যায় দণ্ডের অগ্রভাগে না হইয়া মাঝামাঝি স্থানে হইয়া থাকে। কি কি কারণে এবং কোন্ প্রয়োজনে এই সকল বীজ-পত্র এইরূপ বিচিত্র আকার ধারণ করে, তাহা অবশ্য ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। যদিও উহাদের প্রত্যেকের গঠন-বৈচিত্র্যের সম্পূর্ণ কারণ নির্দ্ধারণ করা খুব সহজ ব্যাপার নয়, তথাপি সাধারণভাবে এবিষয়টি বুঝা তোমাদের নিকট তেমন কোন কঠিন বিষয় বলিয়া মনে হইবে না। বীজ-পত্র ভ্রূণভাণ্ডের (embryo-sack) ভিতর আবদ্ধ অবস্থায় গঠিত হয় বলিয়া, মুক্ত বায়ুতে বর্দ্ধিত সাধারণ পাতার চাইতে উহারা আরও অতিরিক্ত কতকগুলি বিশিষ্ট কারণের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে। তাহারই ফলে বীজ-পত্রের নানারূপ গঠন বৈচিত্র্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

ছোলার বীজ-পত্র

শিমের চারার খাদ্যপূর্ণ বীজ-পত্র

ভ্রূণে বীজ-পত্রের সংখ্যানুযায়ী বীজ-উৎপাদক উদ্ভিদ্‌কে দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে, তাহার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। উহাদের মধ্যে কোন কোন উদ্ভিদের বীজে, ভ্রূণের খাদ্য বীজ-পত্রেই সঞ্চিত থাকে। আবার কোন কোন বীজে এই খাদ্য বীজ-পত্রের বাহিরে, বীজের আবরণের ভিতর, বীজ-পত্রের সহিত সংলগ্নভাবে সঞ্চিত দেখিতে পাওয়া যায়। বীজ-পত্র সেই সঞ্চিত খাদ্য শোষণ করিয়া ভ্রূণের আদি মূল ও কাণ্ড গঠনের জন্য যথাস্থানে প্রেরণ করিয়া থাকে। ভ্রূণের বৃদ্ধির জন্য সঞ্চিত এই খাদ্যের অবস্থানুযায়ী বীজ-পত্রের আকারের যথেষ্ট তারতম্য হয়।

আমাদের অঙ্গের ন্যায় উদ্ভিদ্‌-দেহের প্রত্যেক অঙ্গেরই নিজস্ব নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি কাজ আছে। সেই সকল কার্য্যের উপযোগী আকারেই এই সকল অঙ্গ গঠিত হইয়া থাকে। একই অঙ্গ আবার উদ্ভিদ্‌-বিশেষে বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হইতে পারে। সেজন্য এই অঙ্গের আকার সকল

উদ্ভিদে একরূপ নয়। বীজ-পত্রের বেলাতেও উদ্ভিদ্-ভেদে কাজের তারতম্য হয়, সুতরাং আকারেরও পার্থক্য হইয়া থাকে। উদ্ভিদ্-অঙ্গ-গঠনের বৈচিত্র্য সম্পর্কে অবশ্য বহু কারণ বিদ্যমান থাকে, তাহাদের সকলের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করা এক্ষেত্রে সম্ভবপর নয়। বীজ-পত্রের গঠন-বৈচিত্র্যের সম্পর্কেও তাহাদের স্বনির্দ্দিষ্ট কার্য্য প্রধান কারণ হইতে পারে; কিন্তু একমাত্র কারণ নয়। দুইটি বিভিন্ন উদ্ভিদের বীজ-পত্রের কাজ হয়ত একই রূপ, কিন্তু তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, উহাদের আকার ঠিক এক রকম নয়। পার্থক্য যত সামান্যই হউক না কেন, নিশ্চয়ই তাহার কারণ আছে। তাহাদের বিষয় বিস্তৃত আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তবে এরূপ ক্ষেত্রে জাতি এবং শ্রেণীর পূর্ব্ব-পরম্পরাগত বৈশিষ্ট্য অনেক সময় প্রধান কারণ রূপে ধরা হইয়া থাকে।

তালের আঁঠির বীজ-পত্র হইতে নলাকারের আবরণ বাহির হইয়াছে

উদ্ভিদের পক্ষে বীজ-পত্রের প্রয়োজন কি? অর্থাৎ, কি কি কাজে উহারা ব্যবহৃত হয় প্রথমতঃ তাহাই নির্ণয় করিতে হইবে। (১) বীজ-পত্র কোমল ভ্রূণমুকুলের রক্ষা-কার্য্যে ব্যবহৃত হয়; সেজন্য বীজ-বিশেষের ভ্রূণে এবং চারা উৎপন্ন হইবার সময়ে উহাদিগকে নানাভাবে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতেও দেখা যায়। (২) কোন কোন উদ্ভিদের বীজ-পত্রের ভিতর, ভ্রূণের বৃদ্ধির কালে প্রাথমিক ব্যবহারেব জন্য খাদ্য সঞ্চিত থাকে। সে সব ক্ষেত্রে উহারা স্থূলাকার ধারণ করে এবং এইরূপ বীজ-পত্রকে সঞ্চয়-ভাণ্ডার বলা হয়। (৩) যে সকল বীজে, বীজ-পত্রের বাহিরে আবরণের ভিতব খাদ্য সঞ্চিত থাকে, তাহাদের বীজ-পত্র, বীজমধ্যস্থ খাদ্যের শোষক অঙ্গরূপে ব্যবহৃত হয়। উহারা সঞ্চিত খাদ্য শোষণ করিয়া ভ্রূণের বৃদ্ধির সময় ভ্রূণমূল ও ভ্রূণমুকুলে প্রেরণ করিয়া থাকে। (৪ এই সকল বীজের মধ্যে কোন কোন বীজের ভ্রূণ বৃদ্ধি পাইয়া চারাতে পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, বীজ-পত্র সবুজ পাতাতে পরিণত হয়। তখন উহারা সাধারণ পাতার ন্যায় খাদ্য প্রস্তুতের কাজও করিয়া থাকে। (৫) একবীজদল উদ্ভিদের মধ্যে কোন কোন উদ্ভিদের ভ্রূণের বীজদল, শুধু যে খাদ্য শোষণের কাজ করে তাহা নহে, উহা হইতে উৎপন্ন নলাকারের আবরণ দ্বারা বৃদ্ধির সময় ভ্রূণকে আবৃত রাখিয়া নানারূপ অনিষ্টের হাত হইতে রক্ষাও করিয়া থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন তাল, খেজুর প্রভৃতির বেলা এই নল ভ্রূণকে বহন করিয়া ভূমির অভ্যন্তরে নিয়া যাইতে দেখা যায়। এইরূপ বিভিন্ন কাজের দরুণ বিভিন্ন বীজের বীজ-পত্র যে বিভিন্ন আকার ধারণ করে, সেই

আকার-গত বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ স্বরূপ কতকগুলি বীজের ও বীজ-পত্রের বিষয় অতঃপর আলোচনা করা হইবে।

আম, জাম, কাঁঠাল, শিম, ছোলা প্রভৃতির বীজ-পত্রে ভ্রূণের বৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট খাদ্য সঞ্চিত থাকার দরুণ, উহারা রীতিমত স্থূলাকার ধারণ করে। ভ্রূণের বৃদ্ধির সময় নূতন খাদ্য প্রস্তুতের জন্য উহাদের বীজ-পত্র, সাধারণ পাতার আকারে পরিবর্ত্তিত হওয়ার বিশেষ কোন প্রয়োজন হয় না। বীজ-পত্রের ভিতরকার খাদ্য সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়া যাওয়ার পূর্ব্বেই উহাদের সবুজ পাতা উৎপন্ন হয়। যদিই বা উহারা কখনও কিঞ্চিৎ সবুজবর্ণ ধারণ করে, লক্ষ্য করিয়া দেখিও আকারের বিশেষ কিছুই পরিবর্ত্তন হইবে না। ভ্রূণমূল ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া শাখাপ্রশাখা সহ ভূমির অভ্যন্তরে বিস্তৃত হয়। এইরূপে উহাদের ভ্রূণ যখন চারাতে পরিণত হইয়া খাদ্য সংগ্রহ ও প্রস্তুত সম্পর্কে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হয়, তখন এই সকল ভ্রূণের বীজ-পত্রও ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া পতনোন্মুখ হইয়া থাকে; অবশেষে চারা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া ঝরিয়া পড়ে। উহাদের সকলেরই বীজ-পত্রের প্রধান কার্য্য সঞ্চিত খাদ্য ধারণ করা। সেজন্যই উহারা সকলেই যে স্থূলাকার, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাদের পরস্পরের গঠনে যথেষ্ট পার্থক্য থাকে। আমের বীজ-পত্রদ্বয়ের মধ্যে একটি অন্যটিকে অংশতঃ আবৃত করিয়া রাখে এবং একটি অন্যটি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড় হয়। কাঁঠালের বীজ-পত্রের একটি অন্যটি হইতে বিশেষ পুষ্ট এবং আকারে বেশ বড় হয়। ছোট বীজ-পত্রের কিনারার অংশ, বড় বীজ-পত্রের পার্শ্ববর্ত্তী গর্ত্তের ভিতরে ঢুকান থাকে। জামের বীজ-পত্র দুইটি দীর্ঘাকারের মালার মত। শিম ও তেঁতুলের বীজ-পত্রদ্বয়ের আকার সম্পূর্ণ সমান। তাহা হইলেও উহাদের উভয়ের বীজ-পত্র তুলনা করিলে তাহাদের গঠন যে ঠিক একরূপ নয়, তাহা বেশ বুঝা যায়। উহাদের বীজদলের এই সকল পার্থক্য উহাদের প্রত্যেকের নিজস্ব জাতি এবং শ্রেণী-পরম্পরা-ক্রমে বিশেষত্ব।

আম, জাম ও কাঁঠালের কচি চারার বীজ-পত্র

পাতার তুলনায় বীজ-পত্রের গঠন খুবই সাধারণ রকমের। উহাতে সাধারণ পাতার ন্যায় শিরা-উপশিরার বিন্যাস খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। লাউ, কুমড়া, শশা, ধুন্দল, কুল প্রভৃতি উদ্ভিদের বীজ হইতে যখন চারার উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হইতে থাকে, তখন লক্ষ্য করিলে দেখা যায়

যে, উহাদের বীজদল চারাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায় ও সাধারণ পাতার মত সবুজ বর্ণ ধারণ করে। উহাদের ভিতর শিরা-উপশিরার বিন্যাস দেখা গেলেও সাধারণ পাতার তুলনায় তাহা কিছুই নহে। কিন্তু উহাদিগের প্রতি লক্ষ্য করিলে বীজ-পত্রও যে এক প্রকার পাতা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। উহাদের ভিতর হইতে ভ্রূণ যেমন সঞ্চিত খাদ্য ক্রমশঃ শোষণ করিতে থাকে, উহারাও তেমনি সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধিত হইয়া সবুজবর্ণ ধারণ করে। দিনের বেলা সূর্য্যালোকের ভিতর থাকিয়া, উহারা তখন চারার জন্য নূতন খাদ্য প্রস্তুতের কার্য্য চালাইতে থাকে। উহাদের ভিতরকার সঞ্চিত খাদ্য ভ্রূণের পূর্ণ বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট নয় বলিয়াই উহারা চারা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নূতন খাদ্য প্রস্তুতেরও ব্যবস্থা করিয়া লয় এবং অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ-কাল স্থায়ী হইয়া থাকে। অন্যান্য পাতার উৎপত্তি হইয়া চারা পূর্ণাঙ্গ ও স্বাবলম্বী হইলে পর উহারা ঝরিয়া পড়ে। লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবে যে, এই সকল বীজ হইতে চারা বাহির হওয়ার সময়, বীজ-পত্র আদিকাণ্ডের কোমল কুড়িকে আবৃত করিয়া রাখে। সুতরাং উহারা রক্ষকের কাজও করিয়া থাকে। এই সকল উদ্ভিদের কোমল ভ্রূণ-মুকুল চারা উৎপন্ন হইবার সময় প্রথমতঃ বৃদ্ধি পায় না; সুতরাং, বীজ-পত্রের নূতন খাদ্য প্রস্তুতের জন্য পাতার আকার ধারণ, এবং অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়ার ইহাও একটি কারণ। ভেরণ বীজে, বীজ-পত্রের বাহিরে, বীজের আবরণের ভিতরে ভ্রূণের খাদ্য সঞ্চিত থাকে। উহার বীজ-পত্রের প্রথম কাজ, এই খাদ্য শোষণ করিয়া ভ্রূণের পুষ্টি সাধন করা। তা ছাড়া অন্যান্য সকল বিষয়েই উহার বীজ-পত্র পূর্ব্বোক্ত বীজ-পত্রগুলিরই অনুরূপ।
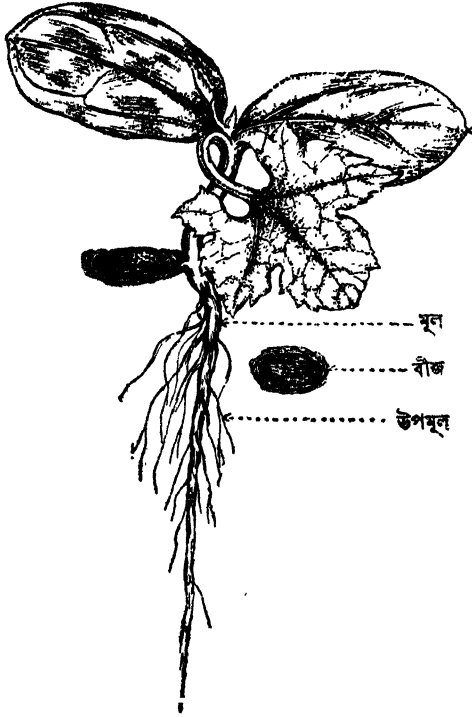
ধুন্দলের চারার বীজ-পত্র

সূর্য্যমুখী চারার বীজ-পত্রের উর্দ্ধগমন

দ্বিবীজ-পত্রী বীজের চারা উৎপন্ন হইবার সময়, কোন কোন বীজের চারাতে বীজ-পত্র চারার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভূমির উপরে উথিত হয়। সূর্য্যমুখী, শিম, তেঁতুল, ধুন্দল প্রভৃতির চারার বৃদ্ধি লক্ষ্য করিলেই তাহা দৃষ্টিগোচর হইবে। অন্য দিকে আবার আম, জাম, কাঁঠাল, ছোলা প্রভৃতির চারার বীজ-পত্র চারা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উর্দ্ধে উথিত না হইয়া মাটির ভিতরেই থাকিয়া যায়। এরূপ হওয়ার কারণ সকল বীজের সকল অংশ সব সময় সমানভাবে বর্দ্ধিত হয় না। কাহারও ভ্রূণে বীজ-পত্রের নীচের অংশের বৃদ্ধি প্রথমতঃ বেশি হয়, তাহাতেই ভ্রূণমুকুল সহ বীজ-পত্র ভূমির উপর উঠে। আবার কাহারও বা বীজ-পত্রের উপরের অংশ প্রথমতঃ তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায়, ফলে বীজ-পত্র মাটির ভিতরেই থাকিয়া যায় এবং উপরে উঠে খুব কমই। কিন্তু একেবারেই যে উঠিতে দেখা যায় না সে কথা বলা চলে না। কেননা, তোমাদের পরিচিত শেফালিকা বা শিউলীর বীজ হইতে চারা উৎপন্ন হইবার সময় বীজ-পত্রের উপরের অংশ ও ভ্রূণমুকুলের বৃদ্ধি, প্রথমতঃ বেশি হইলেও উহার বীজ-পত্রদ্বয় ভূমিতে আবদ্ধ থাকে না। উহাদের বোঁটা দীর্ঘ হইয়া ভূমির উপরে উথিত হয় ও সবুজবর্ণ ধারণ করে। উহাদের সংযোগস্থল অবশ্য ভূমিসংলগ্নই থাকিয়া যায়।

ভুট্টার ক্রমবর্দ্ধমান চারায় ভ্রূণমুকুল, বীজ-পত্র হইতে নল ছিন্ন করিয়া বাহির হইতেছে

তোমরা বহু একবীজ-পত্রী বীজের চারা দেখিয়াছ। কেননা তোমাদের পরিচিত ধান, গম, যব, ভুট্টা, সুপারী প্রভৃতি উহাদের উদাহরণ। উহাদের মধ্যে প্রায় সকলেরই চারা ফল হইতে উৎপন্ন হয়। উহাদের ফলের ভিতর বীজ এবং বীজের ভিতর ভ্রূণের সহিত বীজ-পত্র সংলগ্ন থাকে। উহারা তোমাদের নিকট যেরূপ পরিচিত উহাদের বীজ-পত্র তত পরিচিত নয়। তাহার কারণ উহাদের ভ্রূণ এবং বীজ-পত্র খুবই ছোট; সুতরাং সেরূপভাবে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পাবে না। এ সকল বীজের ভিতর ভ্রূণের খাদ্য উহাদের অতিক্ষুদ্র বীজ-পত্রের বাহিরে সঞ্চিত থাকে। ধান, গম, যব, ভুট্টার ভিতরকার সঞ্চিত শ্বেতসার (starch) খাদ্যের এক প্রান্তে, ভ্রূণ শায়িত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের অতীব সরু থালার আকারে গঠিত বীজ-পত্র ঐ খাদ্যের সঙ্গে সংলগ্ন থাকিয়া ভ্রূণের বৃদ্ধির সময় এই কঠিন খাদ্য দ্রব ও শোষণ করিয়া ভ্রূণমূল ও ভ্রূণমুকুলের পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে, উহাদের বীজ-পত্র হইতে উৎপন্ন পূর্ব্ববর্ণিত একটি নলাকারের আবরণ উহাদের কোমল ভ্রূণমুকুলকে সম্পূর্ণ আবৃত করিয়া রাখে। ঐরূপ আবরণে আবৃত থাকাতে উহাদের ভ্রূণমুকুলের কোমল ও সূচল অগ্রভাগ যখন মৃত্তিকা ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসে, তখন মৃত্তিকাকণার ঘর্ষণে ভ্রূণমুকুলের কোমল অগ্রভাগের কোন অনিষ্ট হয় না। এই কাণ্ডের

কুঁড়ি যখন সুদীর্ঘ হইয়া ভূমির উর্দ্ধে বাড়িতে থাকে, তখন উহাদের পাতা সেই আবরণ ভেদ করিয়া বাহিরে বিস্তৃত হয়। এই সকল বীজের বীজ-পত্র অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত দৃষ্টিগোচর না হইলেও, উহাদের বীজ-পত্র হইতে উৎপন্ন চারায় সেই আবরণ খোঁজ করিলে খালি চোখেও দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের বীজের ভিতরকার সঞ্চিত খাদ্য যে এক পার্শ্বে থাকে, তাহাও তোমরা চারা এবং সঞ্চিতখাদ্য-ভাণ্ডের অবস্থান লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবে। এই সকল বীজে সঞ্চিত কঠিন খাদ্য বীজ-পত্র হইতে নিঃসৃত রসে তরলাকার ধারণ করে। বীজ-পত্র সেই তরল খাদ্য শোষণ করিয়া ভ্রূণের মূলে ও মুকুলে প্রেরণ করে এবং এইরূপে চারার বৃদ্ধির পক্ষে সাহায্য করে।

তোমাদের পরিচিত তাল ও নারিকেল গাছ একবীজ-পত্রী শ্রেণীরই অন্তর্গত উদ্ভিদ্। উহাদের ভ্রূণের আকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণপত্রেরও আকার রীতিমত বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, সুতরাং খালি চোখেও দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের বীজের ভিতর যে ফোঁপর দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই উহাদের বীজ-পত্র। উহাদের বীজের ভিতর সঞ্চিত খাদ্যও যে কঠিন তাহা হয়ত তোমরা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছ। উহাদের সমশ্রেণীর অন্যান্য উদ্ভিদের বীজ-পত্রের ন্যায় উহাদের বীজ-পত্রও রস নিঃসরণ করিয়া প্রথমতঃ সেই কঠিন খাদ্য দ্রবীভূত করে, তৎপর শোষণ করিয়া যথাস্থানে প্রেরণ করে। উহাদের বীজ-পত্র হইতেও নলাকারের আবরণ উৎপন্ন হয়। উহাদের ভ্রূণমূল ও ভ্রূণমুকুল কালক্রমে সেই আবরণ ভেদ করিয়া বহির্গত হইয়া থাকে। তালের আঁঠি হইতে বহির্গত এই নলের কাজ আরও কিঞ্চিৎ অদ্ভুত রকমের। তোমরা লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবে যে, তালের চারা উৎপন্ন হইবার সময় তালের আঁঠির ভিতর হইতে প্রথমতঃ একটি সুদীর্ঘ নল বাহির হইয়া আসে। সেই নলের ভিতরে, ঠিক অগ্রভাগে তালের ভ্রূণ সুরক্ষিতভাবে বসান থাকে। উহাই সেই নল, যাহা তালের ফোঁপররূপী বীজ-পত্র হইতে উৎপন্ন ও বহির্গত হইয়াছে। এই বীজ-পত্র বা ফোঁপর সঞ্চিত খাদ্যে সংলগ্ন থাকিয়া খাদ্য শোষণ করে এবং ভ্রূণের বৃদ্ধির জন্য নলের দ্বারা ভ্রূণের ভিতর প্রেরণ করে। এই নল মাটির ভিতর প্রবেশ করিলে পর ভ্রূণ যখন সুপুষ্ট হয়, তখন উহার মূল ও কাণ্ড নল ভেদ করিয়া বাহির হয়। কাণ্ড ক্রমশঃ ভূমির উপরে আসে, মূল মৃত্তিকার ভিতর বিস্তৃত হয়। এই কারণেই তালের চারা ভূমি হইতে সহসা উৎপাটন করা যায় না। তোমাদের পরিচিত খেজুরগাছের ভ্রূণের বৃদ্ধি এবং চারার উৎপত্তিতে এই একরূপ ব্যবস্থাই দেখিতে পাওয়া যায়।

বীজ-পত্র সম্পর্কে যে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইল তাহা হইতেই বিভিন্ন বীজ-পত্রের বিশিষ্ট আকার, কার্য্য এবং শৈশবে ভ্রূণের বৃদ্ধি ও রক্ষাকল্পে উহাদের যে কত বেশি প্রয়োজন, তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ। এই বীজ-পত্রে আমরা উদ্ভিদের অব্যক্ত মাতৃস্নেহের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাই না কি?

মাগাগো *

শ্রীবিনয় দত্ত

"মাগাগো, মাগাগো!"

যারা একথাটা জানে, তা'রা বলতে পারে এর মধ্যে জড়িয়ে আছে কত ভয়ের আর্ত্তনাদ। শব্দ হওয়ার সাথে সাথে বনের মধ্যে যত তাঁবু খাটান আছে, তার একদিকে আগুন জ্বেলে এই শত্রুর সঙ্গে সবাই যুদ্ধ করবার জন্য প্রস্তুত হয়। কেবল এই ক'রেই শান্ত হয় না, বনের যারা অধিবাসী, যারা আগন্তুক, যারা গাইড্—তা'রা সবাই ভয়ে ভয়ে যে যার কাজ ফেলে গাছে ওঠে। আর ইন্দুর, ছুঁচো, টিকটিকি, কুকুর—সবাই পালাতে থাকে শব্দ শোনার সাথে সাথে।

যুদ্ধ-সাজে সাজ্জিত হ'য়ে ঐ আসছে সৈনিকদলের মত সারি বেঁধে শত্রু—ভীষণ শত্রু। পিঁপড়ে!—কালো কালো সারথীর বেশে লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী পিঁপড়ে।

একবার আফ্রিকায় আমি দেখেছিলাম এমনি সারি বেঁধে যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ সারথীর দল অর্থাৎ পিঁপড়ে। আমাদের আস্তানার একটু দূর দিয়ে চলেছিল তা'রা। তাদের একটা তাঁবু পেরিয়ে যেতে লেগেছিল ছত্রিশ ঘণ্টা। তাদের সারিটি চওড়ায় ছিল কুড়ি গজ, আর লম্বা কতটা ছিল তা অনুমান ক'রে নাও। তখন আমার চাকর-বাকর সবাই এক লক্ষ্যে চেয়ে আছে ভয় ও সন্ত্রাসের ঢেউ বুকে ক'রে—কোন্ দিকে যায় তা'রা। সেদিন রক্ষা পেয়েছিলাম এই জন্য—শত্রুর চলার পথে আমাদের তাঁবু ছিল না।

আর একটা গল্প জানি ডাঃ আলবার্ট সুইজার ফরাসী গিনিতে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে কেমন অবস্থায় পড়েছিলেন। একরাতে তাঁরা আরামে ব'সে ব'সে গল্প করছিলেন—বাইরে কিসের যেন শব্দ কানে ভেসে আসতে লাগল।

জানালা খুলে টর্চ্চের আলো ফেলে ডাক্তার দেখলেন যেন একটা কালো নদীর স্রোত। তাঁর স্ত্রী এসেও উঁকি মারলেন এবং চেঁচিয়ে বললেন—"মাগাগো, মাগাগো!"

ডাক্তার ও তাঁর স্ত্রী কোনমতে হাসপাতাল, ওষুধ-পত্র সব ফেলে দিয়ে সে-বার যে ভাবে বেঁচে ছিলেন, তা আজও বনের অধিবাসীদের স্মরণ আছে।

---

* বিদেশী গল্প অবলম্বনে

জল তাদের আটকে রাখতে পারে না, আগুন তাদের বাধা দিতে পারে না, নদী তাদের পথ আগ্‌লে ধরতে পারে না। কে একজন মিঃ বেট্‌স একবার নিজের চোখে দেখেছিলেন তাদের সারি বেঁধে আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে। প্রথম দল পুড়ে ছাই হ'ল, তারপর দ্বিতীয় দল, তারপর দলে দলে তাদের অনুসরণ করল। ধীরে ধীরে দেখা গেল আগুনের মধ্যে মৃতদেহ জড় হ'য়ে যেন পাহাড় হয়েছে! এবার তার ওপর দিয়ে তা'রা চলল অনির্দ্দিষ্ট স্থানে যুদ্ধ করতে।

জলের মধ্য দিয়েও তা'রা এমনি চলে। পরে দেখা যায় দলে দলে ডুবছে; ডুবতে ডুবতে মৃতদেহগুলো গ'ড়ে তোলে স্রোতের ওপর বাঁধ। এবার আর ভয় কি? তবু তাদের জয় অনিশ্চিত—ভাগ্যিস্ তা'রা অন্ধ। তা না হ'লে যে কি করত তা বলা যায় না।

আফ্রিকার বনের কোন কোন গণ্ডারকে এই শত্রুর কবলে পড়তে শোনা গেছে। কে একজন সৈনিকদলের মেজর দেখেছিলেন একটা গণ্ডারকে আক্রান্ত হ'তে। তিনি বন্দুক তুলে কি করবেন—কিছুই করতে পারলেন না! ভাগ্যিস্ গণ্ডারটার বুদ্ধি জাগল হঠাৎ মনে, তাই ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়ল নদীতে—তারপর প্রাণ নিয়ে বাঁচে।··· ···

"মাগাগো, মাগাগো!" —ব'লে 'বয়' এসে চেঁচিয়ে উঠল।

আমি দূরে বনের দিকে জমির ওপর চেয়ে দেখলাম —আসছে। হ্যাঁ, আমার তাঁবুর দিকেই তাদের গতি। তবে কি এবার আমরাই তাদের শিকার হ'ব?

তাঁবুর সেই দিকে সঙ্গে সঙ্গে কাঠ ছড়িয়ে দিয়ে তৈল ঢালা হ'ল, যেদিক থেকে সারি বেঁধে আসছিল তা'রা। তারপর দেওয়া হ'ল আগুন!···

'বয়' বলল—"সাহেব, এতে কি—চ্—ছু হবে না। আর যদি কোন পথ বাৎলে দিতে—"

—"এসে পড়েছে।"

—"এ—কি? আর দেরি নেই, সা—হে—ব—"

আমার মাথার মধ্যে এক বুদ্ধি গজিয়ে উঠল; বললাম—"একটা কাজ কর্, প্যারাফিন তাঁবুর এইদিকে ঢেলে দে। এই দিক দিয়ে আসছে—ঐখানে ঢাল—"

হুকুম দেওয়ার সাথে সাথে ঢালা হ'ল প্যারাফিন।

হ্যাঁ, তা হ'লে আমার 'প্ল্যান্' ফলেছে! এবার শত্রুদল প্যারাফিনের গন্ধ পেয়ে মোড় ফিরে চলেছে অন্য দিকে। ভাবলাম—'ভয় নেই, ভয় নেই, তা'রা অন্য পথ ধরেছে।'

সেই রাতে আফ্রিকার সেই বনে ভীষণ যুদ্ধ হ'ল—মহাযুদ্ধের এক অঙ্ক। মানুষ একদিকে, পিঁপড়ে আর একদিকে। সেদিন মানুষেরই হ'ল জয়।

বনকাপাসী রাঙা-মাসি

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

বনকাপাসী রাঙা-মাসি, কও না মেসোর কথা?
কও না মাসি কানে কানে মেসো গ্যাছেন কোথা?

মেসো গ্যাছেন কলকাতাতে রেলগাড়ীতে চড়ি',
বেঁধে নিছেন কোঁচার খুঁটে একটা কাণাকড়ি।
কাণাকড়ির সওদা পেতে ঘুর্‌তে হবে সাল্‌কে,
আজ তো যেন আছেই আর সারাটি দিন কাল্‌কে
কিন্‌তে হবে রকম রকম খেল্‌না পুতুল ঝুমঝুমি,
নিজের হাতে দিবেন কিনা খোকাখুকীর মুখ চুমি'

একটি ঝাঁকা সওদা হবে, আন্‌বে ব'য়ে মুটে।
গাঁটের কড়ি মেসোর তবু রইবে কোঁচার খুঁটে॥

বংশী-দীঘি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, এম. এ., বি. টি., সরস্বতী

বাঙ্গালীর ছেলের আজ শরীর দুর্ব্বল, মন উৎসাহহীন, আশা-আকাঙ্ক্ষা দিবাস্বপ্নে পর্য্যবসিত। তার স্বাভাবিক বুদ্ধির সতেজ বিকাশ আজ অকাল-পক্কতা ও বাঁধা-বুলির আড়ালে আত্ম-গোপন করেছে। কিন্তু একদিন ছিল যখন বাঙ্গালী যুবকের দেহে ছিল শক্তি, মনে ছিল উৎসাহ,—শারীরিক শৌর্য্য-বীর্য্য প্রকাশকে তার পুরুষত্বের প্রধান পরিচয় ব'লে সে মনে করৃত। আজকার এই ভীরু, দুর্ব্বল, ভেতো বাঙ্গালী একদিন অসীম সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে। যাঁরা বীরত্ব ও শারীরিক বলে বাংলার ইতিহাসের পাতায় অমর হ'য়ে আছেন, তাঁরা ছাড়াও অনেক পল্লীতে এমন বীর বাঙ্গালী ছিলেন, ইতিহাস-লক্ষ্মী যাঁদের ওপর কৃপা-কটাক্ষপাত করেন নি। স্থানীয় ইতিহাস অনুসন্ধান করলে এমন অনেক বীরের পরিচয় পাওয়া যায়, যাদের সাহস, বীরত্ব, কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও দেশপ্রেম —চাঁদ-কেদার, প্রতাপাদিত্য বা ঈশা খাঁর চেয়ে কম নয়। এম্‌নি এক বীর নমঃশূদ্র যুবকের কথা আজ তোমাদের বল্‌ব।

একশ' বছর আগেকার কথা। বৃটিশ-রাজত্ব তখনও কায়েম হয় নি। চোর-ডাকাতের বড্ড প্রাদুর্ভাব। গৃহস্থেরা চোর-ডাকাতের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে নানারকম উপায় অবলম্বন করৃত, আর সর্ব্বদা প্রস্তুতও থাকৃত। তবুও কত শত লোক যে ধন-প্রাণ হারিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই।

যশোর জেলার উত্তর দিক যেখানে নদে' জেলার পূর্ব্ব দিকের সঙ্গে মিশেছে সেখানে রতনপুর নামে একটা গ্রাম আছে। গ্রামটি বহু প্রাচীন। পূর্ব্ব-গৌরবের চিহ্ন এখনও কিছু কিছু বর্ত্তমান আছে সেখানে। গ্রামের শেষ-প্রান্তে প্রায় দশ বিঘা পরিমাণ জমি চারপাশের সমতল জায়গা থেকে প্রায় তিন হাত নীচু। সেই জায়গাটাকে স্থানীয় লোকেরা বংশী-দীঘি বলে। সেটেল্‌মেণ্টের বা সরকারী কাগজ-পত্রেও ওটাকে বংশী-দীঘি ব'লে লেখা হয়। একশ' বছর পূর্ব্বেকার একটা শোচনীয় ঘটনার সঙ্গে সেই দীঘির স্মৃতি বিজড়িত। সেই দীঘি এখন চাষের জমিতে পরিণত।

রতনপুর বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রামে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি বহু জাতির বাস। গ্রামের জমিদার কালীকান্ত রায় অতি সদাশয় ব্যক্তি। সকলের মুখেই তাঁর প্রশংসা। একদিন সকালবেলায় কালীকান্তবাবু বৈঠকখানায় ব'সে আছেন, এমন সময় তাঁর পেয়াদা বেহারী ঘরে ঢুকে বল্‌ল—"বাবু, কাল রাত্রে শুকচাঁদ আর তার স্ত্রী কলেরায় মারা গেছে। বিকেল থেকে শুকচাঁদের দাস্ত-বমি আরম্ভ হ'ল, আর তার স্ত্রীর সন্ধ্যের পর থেকে। কোব্‌রেজ মশায় যেয়ে কত ওযুধ-পত্র দিলেন, কিন্তু কোন ফলই হ'ল না।"

কালীকান্তবাবু যেন আকাশ থেকে পড়্‌লেন! চীৎকার ক'রে ব'লে উঠ্‌লেন—"সে কি! বলিস্ কিরে!" পরক্ষণেই অসাধারণ গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে কিছুক্ষণ নীরব থেকে রুক্ষকণ্ঠে বল্‌লেন—"আমায় খবর দিলি না কেন?"

বেহারী কাঁদ-কাঁদ হ'য়ে জোড়হাত ক'রে বল্‌ল—"আজ্ঞে, ওদের নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম আর কোব্‌রেজ মশায়ের অনুপান, গাছ-গাছড়া জোগাড় কর্‌তে এত ছুটাছুটি কর্‌তে হয়েছিল যে, খবর দিতে পারি নি। বাবু, অপরাধ মাপ কর্‌বেন।"

কালীকান্তবাবু ভাব্‌লেন, তিনি উপস্থিত থাক্‌লেই বা কি কর্‌তেন। কোব্‌রেজ মশাই ত ছিলেন। গ্রামের রমানাথ কবিভূষণ ত এই অঞ্চলের নামজাদা কোব্‌রেজ। তিনি যখন চিকিৎসা করেছেন, তখন পরমায়ু তাদের নিশ্চয়ই ছিল না।

অনেক কথা কালীকান্ত রায়ের মনে পড়্‌ল। শুকচাঁদ ছিল কালীকান্তের লেঠেল-সর্দ্দার। সেকালে প্রত্যেক জমিদারই প্রতিবেশী জমিদারের সঙ্গে বুঝাপড়া কর্‌বার, ডাকাতের হাত থেকে বাঁচ্‌বার ও নিজের জমিদারীর মধ্যে শাসন কায়েম রাখ্‌বার জন্যে কতকগুলো লেঠেল রাখ্‌তেন। তা'রা জমিদারের কাছ থেকে নিষ্কর জমাজমি ভোগ কর্‌ত, আর বিশেষ অনুষ্ঠান ও পর্ব্বদিনে পুরস্কার পেত। সে-বার নিয়োগীদের সঙ্গে বিবাদের সময় শুকচাঁদ কি সাহস আর বীরত্ব দেখিয়েই না লক্ষ্মীপুরের চরটা দখল কর্‌ল! একটা লোকের সাম্‌নে পঞ্চাশজন দাঁড়াতে পার্‌ল না! অতবড় বিশ্বস্ত ভৃত্য আর কালীকান্তবাবুর কেউ ছিল না।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে কালীকান্তবাবু বল্‌লেন—"ওর কে আছে আর?"

বেহারী বল্‌ল—"একটা ছ'-সাত বছরের ছেলে ছাড়া আর কেউ নেই। তারই বা কি দশা হবে—ছেলে-মানুষ!"

এই ব'লে, বেহারী বাইরে যেয়ে একটা হৃষ্টপুষ্ট ছেলের হাত ধ'রে ঘরের

মধ্যে ঢুকে বল্‌ল—"এইটেই বাবু, শুকচাঁদের ছেলে।" তারপর ছেলেটিকে বল্‌ল—"বাবুকে প্রণাম কর।"

ছেলেটি তৎক্ষণাৎ হাঁটু গেড়ে মাটিতে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়াল। কালীকান্তবাবু একবার ছেলেটির দিকে তাকালেন, পরে "চণ্ডে চণ্ডে" ব'লে কয়েকটা ডাক দিলেন। চণ্ডীচরণ ছুটে এসে প্রণাম ক'রে দাঁড়াল। কালীকান্তবাবু বল্‌লেন—"এইটি শুকচাঁদের ছেলে, তোদের সঙ্গে থাক্‌বে।"

"এইটেই বাবু, শুকচাদের ছেলে"

চণ্ডীচরণ বাইরের চাকরদের প্রধান। সে গরু-বাছুরের তত্ত্বাবধান করে আর বাইরের কাজকর্ম্ম করে। সে ছেলেটিকে কোলে ক'রে জিজ্ঞেস কর্‌ল—"তোর নাম কিরে?" ছেলেটি বল্‌ল—"বংশী।"... ...

তারপর প্রায় পনের বছর চ'লে গেছে। সেদিনকার শিশু বংশী আজ যুবক। সে এখন তার বাপের পদ পেয়েছে। এখন সে কালীকান্তবাবুর সর্দ্দার লেঠেল। লোকে বলে, সাহস, শারীরিক শক্তি আর কৌশলে সে তার বাপকেও ছাড়িয়ে গেছে। তার সমকক্ষ হ'য়ে লাঠি আর সড়কি ধর্‌তে সে অঞ্চলে আর কেউ নেই। সে তার স্বজাতি নমঃশূদ্র ছেলেদের নিয়ে একটা প্রকাণ্ড লেঠেলের দল করেছে। বিভিন্ন পর্ব্ব উপলক্ষে লাঠি, সড়কি, তলোয়ার প্রভৃতি নিয়ে সে চমৎকার খেলা দেখায়। গ্রামের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি সমস্ত জাতের লোকই বংশীকে ভালবাসে। শারীরিক শক্তি তার প্রচুর। জমিদারের সে প্রিয়পাত্র; তবুও তার ব্যবহারে কোন ঔদ্ধত্য নেই। সকলের কাছে সে নম্র—বিনয়ী।

সেকালে কোন বাড়ীতে ডাকাতি কর্‌বার পূর্ব্বে ডাকাতেরা গৃহস্থকে চিঠি দিত। তখন ডাকাতিও বীরত্বের অঙ্গীভূত ছিল। তাই নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ডাকাতেরা

আক্রমণ কর্‌ত। তখন থানার সংখ্যা ছিল কম—সেগুলোও দূরে দূরে অবস্থিত। সেজন্যও ডাকাতেরা ঐ রকম চিঠি দিতে সাহস কর্‌ত। আবার ওরকম চিঠি দিয়েও তা'রা আস্‌ত না। গৃহস্থ প্রতীক্ষা কর্‌তে কর্‌তে বিরক্ত হ'য়ে পাহারা দেওয়া ছেড়ে দিলে হঠাৎ একদিন তা'রা আক্রমণ কর্‌ত।

চৈত্রের প্রথম সপ্তাহে কালীকান্ত রায় এক বেনামী চিঠি পেলেন, আস্‌ছে শনিবারে তাঁর বাড়ীতে ডাকাত পড়্‌বে। তাঁর বাড়ীতে আর গ্রামের মধ্যে মহা হৈ-চৈ প'ড়ে গেল। বংশী আর তার দলের লোকজনের ছুটাছুটি ও ব্যস্ততা বেড়ে গেল। গাঁয়ের মধ্যে কোথায় তাদের বাধা দিতে হবে, বাড়ীর মধ্যে কোথায় কোন্ সুযোগে তাদের আটক কর্‌তে হবে, বংশী তার বন্দোবস্ত কর্‌তে লাগ্‌ল। রাতদিন জমিদার-বাড়ীর সাম্‌নে লাঠিখেলা চল্‌তে লাগ্‌ল। চারদিকে ভয় ও উৎকণ্ঠা। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দিনে ডাকাতদের কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না। তারপর কয়দিন ঐ অবস্থায় কেটে গেল। শেষে ঐ যাত্রায় আর ডাকাতেরা এল না ব'লেই সাব্যস্ত হ'ল।

কয়েকদিন পরে কালীকান্তবাবু খুব জরুরী একটা বৈষয়িক কাজে যশোরে যেতে বাধ্য হ'লেন। কিন্তু মন তাঁর নিশ্চিন্ত ছিল না। যাবার বেলায় বংশীকে বল্‌লেন— "তুমিই রইলে বাপ, দেখ—"

কালীকান্তবাবু না থাকায় বংশীর দায়িত্ব যেন বেড়ে গেল। সে-ই এখন জমিদার-বাড়ীর রক্ষাকর্ত্তা। সকল সময় তার মনে জাগ্‌তে লাগ্‌ল প্রভুর আদেশ।

অন্ধকার রাত্রি। টিপ্ টিপ্ ক'রে বৃষ্টি পড়্‌ছে। বংশী আর আট-দশজন লেঠেল কালীকান্তবাবুর বৈঠকখানা-ঘরে শুয়ে আছে। পূর্ব্বে বহু লেঠেল সমস্ত রাত জেগে পাহারা দিত, এখন আর কোন আশঙ্কা নেই জেনে মাত্র আট-দশজন থাকে। হঠাৎ সদর-দরজার কাছে ডাকাতদের হাঁক শোনা গেল। বংশীদের ঘুম গেল ভেঙ্গে। তা'রা পাল্টা হাঁক দিয়ে লাঠি, সড়কি, তলোয়ার নিয়ে বাইরে লাফিয়ে পড়্‌ল। কিন্তু ডাকাতদের সংখ্যা পঞ্চাশ-ষাট। হাতে তাদের বড় বড় জ্বলন্ত মশাল; মুখে কৃত্রিম গোঁফ-দাড়ী।

পূর্ব্বের সিদ্ধান্ত অনুসারে জমিদার-বাড়ীর তেতালার ছাদে একটা বড় জয়ঢাক রাখা হয়েছিল। ঐ জয়ঢাকে আওয়াজ কর্‌লেই গ্রামের সমস্ত লোক বুঝতে পার্‌বে যে, জমিদার-বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে। তা'রা তখন লাঠি-সড়কি নিয়ে ছুটে আস্‌বে। কিন্তু অতর্কিত আক্রমণে বংশী ও বংশীর দলের সবাই হতবুদ্ধি হ'য়ে সে-কথা ভুলে গেল।

বংশী আর বংশীর দল প্রাণপণে যুঝতে লাগ্‌ল। তাদের সাহস ও লাঠি-খেলার কৌশলে ডাকাতেরা স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। হঠাৎ বংশীর মনে হ'ল, যদি কোনক্রমে তা'রা পরাজিত হয়, তবে আর রক্ষা করা যাবে না। সুতরাং পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট একটি কৌশল অবলম্বন করা যাক্। বংশীরা হঠাৎ স'রে পড়্‌ল—তার কিছুক্ষণ পরেই সদর-দরজা গেল খুলে।

বাড়ীর একটা বিশেষত্ব এই যে, সদর-দরজার পরে পাঁচ হাত প্রশস্ত একটা গলির ভিতর দিয়ে গেলে, আর একটি সুদৃঢ় দরজা পার হ'য়ে বাড়ীর মধ্যে ঢোকা যায়। ঐ দরজাটা অপ্রশস্ত। সাধারণভাবে একজন মানুষের বেশী ঢুক্‌তে পারে না। সেকালের অনেক পুরাণো বাড়ী ডাকাতের ভয়ে এইরূপ কৌশল ক'রে করা হ'ত। বংশী এক প্রকাণ্ড খাঁড়া হাতে ক'রে সেই দরজায় দাঁড়িয়ে রইল। তার পাশেও তিন-চারজন ঐ রকম খাঁড়া হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে।

ডাকাতেরা মনে কর্‌ল যে, মাত্র কয়েকজন লোক আর আমাদের কত বাধা দেবে, তাই তা'রা পালিয়ে সদর-দরজাটা ভেঙ্গে ফেলার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে খুলে দিল। ওরা সব বাড়ীতে ঢুকে পড়্‌ল। গলি পার হ'য়ে ছোট দরজা দিয়ে যেই একটি ক'রে লোক বাড়ীতে ঢুক্‌তে যাচ্ছে, অমনি বংশীর খাঁড়া তার দেহ থেকে মুণ্ডটা পৃথক্ ক'রে দিচ্ছে! একে একে দশজন ডাকাত প্রাণ হারাল—রক্তে ঢেউ খেলে গেল!

দশজন পরপর খুন হ'ল দেখে ডাকাতেরা ভড়কে গেল। অথচ একজনের বেশী দরজা দিয়ে ঢুক্‌বার উপায় নেই! এর মধ্যে বংশীর ইঙ্গিতে একজন তেতালার জয়ঢাক বাজাতে সুরু কর্‌ল। গ্রামের লোকেরাও লাঠি-সড়কি নিয়ে ছুটে আস্‌তে লাগ্‌ল। অসুবিধা বুঝে ডাকাতেরা পালাতে সুরু কর্‌ল।

ডাকাতেরা পালিয়েছে জেনে বংশী মনে কর্‌ল, তাদের একজনকেও আটক করা না গেলে, তা'রা যে পরাজিত হ'য়ে পালিয়েছে, তার কোন প্রমাণ থাকে না এবং বংশীরও কোন কৃতিত্ব প্রকাশ পায় না। সে ডাকাতের সর্দ্দারকে ধর্‌বার জন্য মরিয়া হ'য়ে উঠ্‌ল। ঢাল, সড়কি, লাঠি প্রভৃতি নিয়ে সে ডাকাতদের পেছনে ছুট্‌ল। তার বন্ধুরা তা'কে বার বার নিষেধ ক'রে বল্‌ল—"একা বা সামান্য কয়েকজন যাওয়া বিপজ্জনক, আর এর বিশেষ প্রয়োজনই বা কি।" কিন্তু কোন কথাই সে শুন্‌ল না—পাগলের মৃত ছুটল ডাকাতদের পেছনে। কে তার সঙ্গে গেল, কে গেল না তার কোন খোঁজ সে রাখ্‌ল না। তার একমাত্র ইচ্ছা ও কাজ ডাকাতের সর্দ্দারকে বন্দী করা।

গ্রামের শেষে মাঠের ধারে একটা প্রকাণ্ড দীঘি ছিল। জমিদার কালীকান্ত রায়ের বাবা, আশেপাশের কয়েকটি গ্রামের প্রজাদের জলপানের জন্য সেই বড় দীঘিটি কাটিয়েছিলেন। ডাকাতেরা সেই দীঘির পাড়ে অন্ধকারে আত্মগোপন ক'রে বিশ্রামের জন্য ব'সে ছিল। বংশী টের পেয়ে তাদের আক্রমণ কর্‌ল। ডাকাতের দল পালাল। বংশী পিছনের এক ডাকাতকে আটক কর্‌ল। সে-ই ডাকাতদের সর্দ্দার। সর্দ্দার খুব লড়তে লাগ্‌ল; কিন্তু বংশীর সাথে পেরে উঠ্‌ছিল না। অন্যান্য ডাকাতেরা তাদের সর্দ্দার ধরা পড়েছে দেখে, ফিরে এসে বংশীকে আক্রমণ কর্‌ল। বংশী একা, আর ওদিকে প্রায় পঞ্চাশজন। তুমুল লড়াই চল্‌তে লাগ্‌ল। বংশীর দলের অন্যান্য লেঠেলরা ও গ্রামবাসীরা বংশীকে না দেখে চিন্তিত হ'য়ে পড়্‌ল। ডাকাতেরা যে পথে গিয়েছে, তা'রা সেই পথ ধ'রে দীঘির পাড়ে উপস্থিত হ'ল। তাদের দেখেই ডাকাতেরা সব পালাল। সকলে এসে দেখ্‌ল—পাড়ের ওপর বংশীর ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত দেহ প'ড়ে আছে, কিন্তু দেহে প্রাণ নেই। আর তারই পাশে একজন ম'রে প'ড়ে আছে, তা'কে ডাকাতদের সর্দ্দার ব'লে মনে হ'ল।

ঘটনাক্রমে কালীকান্তবাবু তার পরদিন সকালে বাড়ী ফির্‌লেন। মাতাপিতৃহীন পরম বিশ্বাসী ভৃত্যের অপূর্ব্ব প্রাণ-বিসর্জ্জনে বৃদ্ধ অভিভূত হ'য়ে পড়্‌লেন। মহাসমারোহে সহস্র সহস্র লোকের সম্মুখে সেই দীঘির পাড়ে বংশীর দেহ ভস্মীভূত করা হ'ল। সেই থেকে ওই দীঘির নাম হ'ল—বংশী-দীঘি। দীঘি ভরাট হ'য়ে শুকিয়ে গেলেও নীচু জায়গাটার নাম এখনও বংশী-দীঘি ব'লে পরিচিত আছে।

পশ্চিম-যাত্রীর ছিন্ন পত্র

ডক্টর শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার, বি. এ., এম. এস্-সি.,
বি. এল., পি-এইচ্. ডি., বি. ই. এস্.

[অধ্যাপক শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার ১৯৩৮ খৃঃ অব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর ইংলণ্ড যাত্রা করেন। সেখান থেকেই গত বছর বার্ষিক শিশুসাথীর লেখা পাঠিয়েছিলেন।. গত জুন মাসে তাঁর ভারতবর্ষে ফিরবার কথা ছিল—কিন্তু যথাসময়ে পৌঁছতে না পারায় শিশুসাথীর জন্যে কোন প্রবন্ধ লিখতে পারেন নি। ইংলণ্ড এবং জাহাজ থেকে লেখা তাঁর চিঠিগুলো একত্রে গেঁথে ছাপান হ'ল। চিঠিগুলো তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীভূপেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার এবং কন্যা কুমারী তপতী মজুমদারকে তিনি লিখেছিলেন।]

Lloyd Triestino : Motonave, Victoria

৪. ১০. ৩৮ ৺বিজয়া, পোর্ট সৈয়দ

প্রতিক্ষণে তোমাদের কথা মনে জাগছে। একান্ত একলা—আজ ৺বিজয়া। অন্যবার এই দিনে তোমাদের মধ্যে। তোমরা আজ আনন্দ করছ, আমি অনুভব করছি। মোটেই ভাল লাগে না। জাহাজের কেবিনে সব চাইতে খারাপ সিট জুটেছে আমার ভাগ্যে। খাওয়া অতি জঘন্য। ৺বিজয়ার আশীর্ব্বাদ, নমস্কার, প্রণাম ও কোলাকুলি জানবে ও জানাবে।

২০. ১০. ৩৮ 2, Boer Lane, Leeds 2.

লিডসে পৌঁছেছি। লণ্ডনে দু'দিন ছিলাম। লণ্ডন আমার ভাল লাগে নি। ট্রাম, বাস আর জনতার কোলাহল লেগেই আছে সব সময়ে। লণ্ডনে একটা হোটেলে (ভারতবাসীরা চালায়) ভাত-পোলাও থেকে আরম্ভ ক'রে পায়েস পর্য্যন্ত অনেক কিছু ভারতবর্ষের খাবার পাওয়া যায়। সেখানেই উঠেছিলাম। এখানে অত্যন্ত শীত পড়ছে। লিখতে হাত আড়ষ্ট হ'য়ে আসে। ঠিকানায় Leeds 2 লিখো। Calcuttaর পরে বা আগে যেমন কেউ P. O. লেখে না, Leedsএও তেমনি। একটা ডাকঘর নয় এখানে; অনেকগুলি আছে। এখানে রোদ সচরাচর দেখা যায় না। অল্প অল্প বৃষ্টি থেকে থেকেই হয়। এখানে অধ্যাপকের অধীনে পাশাপাশি ঘরে আমরা তিনজন কাজ করি। দুইজন আমার ছাত্র।

আমরা তিনজনে বেশ আছি। একজন আসছে জুলাই মাসে কাজ শেষ ক'রে দেশে ফিরবে। কোন অসুবিধা নেই। সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৬টা পর্য্যন্ত লেবরেটরিতে থাকি। ৬টায় বাড়ী ফিরে বড় কষ্ট হয়। মন ক্লান্তিতে নুয়ে পড়ে। সব সয়ে যাবে আস্তে আস্তে। বলাই *

* অধ্যাপক বলাইচাঁদ কুণ্ডু, পি-এইচ্. ডি.

আমায় একখানা চয়নিকা দিয়েছে। শিশুসাথী কি আসে? বরফ প'ড়ে রাস্তা, ছাদ প্রভৃতি সাদা হ'য়ে গিয়েছে। জুতো বরফে গেড়ে যায়; ছয়-সাত ইঞ্চি পুরু বরফ—পেঁজা তূলোর মত। একটুতেই পা ডুবে যায়। গাছের ওপর যেন সব Snow-white ফুল ফুটেছে। বেশ লাগে দেখতে, অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য; কিন্তু শীতে হাত-পা আড়ষ্ট।

১. ১১ ৩৮ লিডস্ ২

একটা বাড়ীতে আমি ও আমার দুই ছাত্র থাকি। ছাত্র দুটি আমার খুব যত্ন করে। তাদের জন্যে কোন কষ্ট পেতে হয় না। রাতে নিজে গরম ক'রে দুধ খাইয়ে তা'রা শুতে যায়। ব্রেক-ফাষ্ট, লাঞ্চ, ডিনার সব আমরা একসঙ্গেই শেষ করি, বেড়ান পর্য্যন্ত। সকালে সাড়ে আটটায় টোষ্ট, ডিম, রুটি, মাখন, pape ব'লে বাতাবী লেবুর মত লেবুর আধখানা, চা, কখনও কখনও ডিমের সঙ্গে মাছ বা মাংস দেয়। সন্ধ্যার পর সাড়ে ছয়টায় বাড়ী ফিরি। তিন-চার মিনিটের ব্যবধান কলেজ থেকে বাড়ী। সাতটায় ডিনার দেয়—মাছ ভাজা, না হয় ভেড়ার মাংস অথবা ram roast. কখনও কখনও তরকারির ঝোল (Soup vegetables), রুটি, মাখন, তরিতরকারি, একটা মিষ্টির থালা (sweet dish), পায়েস, না হয় এদের দেশের নানারকম (নাম জানি না) বিস্কুট, পনির এবং কফি দেয়। ৯ টার মধ্যেই শুয়ে পড়ি। সকাল সাড়ে ছটা বা সাতটায় উঠে দাড়ি কামাই। জামা কাপড় প'রে তৈরী হই। সপ্তাহে একদিন স্নান করি রাত দশটার পর। এখানকার ঠাণ্ডা এড়ানোর জন্যে ডিনারের পরই স্নান ক'রে তিন ঘণ্টা ঘরের মধ্যে (in doors) থাকা উচিত। তাই রাত দশটা এগারটায় সবাই স্নান ক'রেই বিছানায় শুয়ে পড়ে। সন্ধ্যার পর গ্যাস না জাললে ঘর গরম হয় না।

প্রতি সপ্তাহে খাওয়া, ব্রেকফাষ্ট এবং ডিনার ও থাকা বাবদ সাড়ে সাইত্রিশ শিলিং এবং গ্যাস বাবদ প্রায় দুই শিলিং দিতে হয়। ঘরের ভেতরে গরম এবং ঠাণ্ডা জলের কানেক্সান (connections) আছে। দোতালায় চারজন বোর্ডার (boarder) থাকি। একটা স্নানের ঘর ও একটা পায়খানা আলাদা করা। ঘরে খাবার দিয়ে যায়। দোতালায় আর দুটি বোর্ডারের সাথে আমাদের দেখাই হয় না। চিঠিতে বাংলা তারিখ না দেওয়াই ভাল। লণ্ডন থেকে সপ্তাহে পাঁচ বার ডাকবিমান (air-mail) ছাড়ে। কিন্তু কোন দিনই ঠিক নেই। ওদের requisite number of parts হ'লেই ছাড়ে। তাই এখানে ডাকঘরের বিজ্ঞপ্তি (postal notice)—তাড়াতাড়ি চিঠি ডাক-বাক্সে ফেলা। এখানে শীত পড়েছে, তার ওপর বৃষ্টি। নভেম্বরের শেষ থেকে নাকি বরফ পড়বে। ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত এই রকমই চলবে।

২৭. ১২. ৩৮ লিডস্ ২

এক ভদ্র পরিবারের সাথে আলাপ হ'ল আজ। চায়ের নেমন্তন্ন ছিল বিকেলে। যে পরিবারের সাথে আলাপ হ'ল তাদের কথা কিছু লিখি। ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলার দুটি ছেলে আর একটি মেয়ে। মেয়েটির বিয়ে হ'য়ে গেছে। বড় ছেলে আর তার স্ত্রী ভদ্রলোকের সাথেই

থাকে। বড় বৌ তার শাশুড়ীকে মা ব'লেই ডাকে এবং সেবাও করে বেশ। যতটুকু পরিচয় পেলাম তার থেকেই আন্দাজ করলাম। আমাদের দেশের ঘোমটা-পরা বধূর শাশুড়ী-সেবার কথা মনে পড়ল। ছোট ছেলে তার স্ত্রীকে নিয়ে আলাদা বাস করে। ছোট বৌ শাশুড়ীকে 'মিসেস' ব'লে ডাকে। স্বভাবও অন্য ধরণের। আমার অভ্যাস নেই দেখা এ ধরণের মেয়ে, তাই হয়ত তা'কে ভাল লাগল না; বিশেষ ক'রে বড় বৌয়ের পাশে। আমাদের দেশের সেবাপরায়ণ মেয়েদের শান্তসৌম্য মূর্ত্তি আমার মনে বার বার জেগে উঠল। আমার পাশের ঘরে একটি ছেলে ও তার বাবা থাকেন। বাইরে যতই কেতা-দুরস্ত এরা হন না কেন এদের ব্যবহারিক জীবন দেখে অবাক্ হলাম।

বাবা ঘরে ঢুকলেন। ছেলে ইজিচেয়ারে ব'সে সিগরেট টানছিল। বাবা এসে জামা-কাপড় ছাড়লেন, চা আনার হুকুম চালালেন; তারপর পাশের চেয়ারে ব'সে অন্য কাজে হাত দিলেন। দেখলাম বাইরে দাঁড়িয়ে। ভদ্রতা-বিরুদ্ধ হচ্ছিল না মোটেও, কারণ ও সময়ে বাইরে দাঁড়ান চলে এবং পর্দ্দাহীন ঘরের দিকে তাকালে ভদ্রতা হানি হয় না। ভাবলাম, এই যদি সভ্যতার লক্ষণ হয় তা হ'লে আমাদের দেশ হয়ত কখনও সভ্য হবে না। লিডসে অনেক ইণ্ডিয়ান আছে। বেশী লোকের সাথে মেশার সময় পাই না। বাঙালী বেশী। মাইনে দিতে হয় পঁচিশ পাউণ্ড প্রতি মাসে। মাসে প্রায় পনের পাউণ্ড নিজের খরচ। এটা ছিল মে থেকে মোটামুটি খরচ। আসছে সেসনে (session) পঁয়ত্রিশ পাউণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইনে, তা' ছাড়া পাঁচ পাউণ্ড ক'রে দিতে হবে ডিপ্লোমা ফির বাবদ। Cityতে গেলে তোমাদের ডাকটিকিট পাঠাব।

১১. ২. ৩৯ বিশ্ববিদ্যালয়

আমি এখানে একজন অধ্যাপকের মারফতে ব্যবস্থা ক'রে একজন heart-specialistকে দিয়ে আমার বুকটা পরীক্ষা করিয়েছি। তাঁর রিপোর্ট প্রফেসরকে পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু আমায় ব'লে দিলেন হার্ট বেশ ভালই আছে। এক ঘণ্টা ধ'রে পরীক্ষা করলেন। কারডিওগ্রাফ (cardio-graph), এক্স-রে (X'ray) প্রভৃতি সবই নিজে নিলেন। সুযোগ যখন পেলাম, বুকটা পরীক্ষা করিয়ে নিলাম। এক পয়সাও ফি নিলেন না অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও না। আর কি ভদ্র! এখানকার ভদ্রতা আর আমাদের দেশের ভদ্রতা আকাশ-পাতাল প্রভেদ। এদেশের ডাক্তারদের সাথে আমাদের দেশের ডাক্তারদের কোন তুলনাই হয় না। পাণ্ডিত্য, ভদ্রতা প্রভৃতি অনেক দিক দিয়েই এঁরা বড়। আমাদের দেশের ডাক্তাররা যেমন রোগী দেখার আগে অর্থের চিন্তাই বেশী করেন, এঁরা তেমন করেন না। এঁরা ডাক্তারি-শাস্ত্রের মর্ম্মগত ধর্ম্মের মর্য্যাদা রেখে চলেন। আর আমাদের দেশের ডাক্তারদের মত একটু দর চড়লেই অমনি দর্শনীর মাত্রা বাড়িয়ে ভারি করার চিন্তা এঁরা করেন না। গরীবদের প্রতি অবিচার এঁরা কোনদিনও করেন না। বড়লোকদেরও যেমন যত্ন নিয়ে চিকিৎসা করেন, গরীবদেরও তাই। আর আমাদের দেশের ডাক্তাররা গরীবদের কাছ থেকে কিছু পাবেন না আশা ক'রেই তাদের মৃত্যুর হাতে তুলে দিতেও

ইতস্ততঃ বোধ করেন না। এক কথায় আমাদের দেশের ডাক্তাররা বড়লোকের জন্যে। কিন্তু এদেশে তার সম্পূর্ণ উল্‌টো দেখলাম। সুন্দর এঁদের ব্যবস্থা। রোগীর পেছন পেছন এঁরা মৃত্যুর দ্বার পর্য্যন্ত ছুটে আসেন। আমাদের দেশের ডাক্তারকে হয়ত জানিয়ে রাখলাম অতটার সময় আসব বুক দেখাতে (দর্শনী দিয়ে অবশ্য), গিয়ে দেখলাম ডাক্তারবাবু বেরিয়ে গেছেন কোন বড়লোকের বাড়ীতে রোগী দেখতে। আর এখানে ঠিক তার বিপরীত। যখন কথা দেবেন, সে বড়লোকই হোক, আর পথের ভিখারীই হোক, ঠিক সময় ডাক্তারখানায় হাজির। তারপর দীর্ঘ সময় ধ'রে পরীক্ষা করলেন—ওষুধ দিলেন বা যা করার করলেন। সে সময় অন্য কেউ আসলে ডাক্তারের দেখা পাবে না। এঁদের নিয়মানুবর্ত্তিতা কি অনুকরণীয় নয়? এঁদের সহকারীগুলিও খুব ভদ্র, বেশ যত্ন করল আমায়।

লণ্ডনে নাকি সরস্বতী পূজো হয়। লিডসে কেউ করে না। ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে মুসলমান প্রায় অর্দ্ধেক, বাকি all-over-India হিন্দু। কাল রাত থেকে জোরে বাতাস বইতে সুরু করেছে। দু'দিন আগে বেশ mild আবহাওয়া ছিল। আজ বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে—শীতও লাগছে।

Grosvenor House
International Student Hotel.
45 Grosvenor Crescent.

২৭. ৮. ৩৯

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে বিটিশ সম্মিলনীতে যোগ দিতে এখানে এসেছি। ৭ই সেপ্টেম্বর লিডসে ফিরব। আসন্ন যুদ্ধের জন্যে Continental প্রতিনিধিরা (delegates) ২৪শে আগষ্ট প্রায় সকলেই ফিরে গেছে। রাশিয়ান প্রতিনিধি আসে নি। কাজেই একদিন পুরো অধিবেশন হওয়ার পর কংগ্রেস পুরো আর বসে নি। আজও অধিবেশন হয়েছে। বুধবার শেষ হবার কথা, কিন্তু কালই বোধ হয় শেষ হবে। আমরা ৩০শে ব্রেকফাষ্টের পর ডানডি যাব। আজ আমাদের গ্যাস-মুখোস (mask) দিয়েছে। আমাদের নীরবতার জন্যে যথেষ্ট সতর্কতামূলক ব্যবস্থা (precautionary measures) নেওয়া হয়েছে; সুতরাং কোন আশঙ্কা নেই। কোন দিক দিয়েই দেশে ফেরা যাবে না। এখানেই নিরাপদ। নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত, খাওয়া দাওয়ার কোন কষ্টই নেই। এখানে এখন normal জীবন। কেবল সিনেমা, থিয়েটার বন্ধ, আর সন্ধ্যার পর অন্ধকার (black-out)। সব সময়েই গ্যাস-মুখোস সঙ্গেই রাখতে হয়।

১০. ৬. ৪০ লিডস্ ২

এদেশ থেকে এই আমার শেষ পত্র। আমি কাল ব্রিডলিংটন থেকে ফিরেছি। এই শনিবার শেফিল্ড যাব। ২০শে বিকেলে আমাকে বোর্ণসাউথে পৌঁছতেই হবে। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা ধ'রে পরীক্ষা করেছে। ১লা জুন থিসিস জমা দিয়েছি। পি-এইচ্. ডি. উপাধির সার্টিফিকেট পেয়েছি। আর দিন পনেরর মধ্যেই তোমাদের মধ্যে, ভাবতেও আনন্দ লাগছে।

সাগর ডাকিছে মোরে

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

আলো ঝল্‌মল্‌ সুনীল আকাশ—
ছল্‌-ছল্‌ করে জল,
নিঝুম দুপুর কেউ জেগে নাই,
এইবার ছুটে' চল
রূপালী বালুর চড়ার ওপর
বেদেরা বেঁধেছে ডিঙা,
দোয়েল ডাকিছে দাঁড়েতে বসিয়া—
দোল দিয়ে যায় ফিঙা।
এই নৌকায় ভেসে যাব মোরা,
শুধু শুধু ভেসে যাওয়া—
সাদা পালখানি ফুলিয়া উঠিবে
লেগে দখিণের হাওয়া।
নীল আকাশেতে আলোর ঝরণা,
নীচে মোরা ভাই-বোন—
ভাসিয়া বেড়াব, এই ডিঙায়
সিন্ধু, যমুনা, শোণ।

সাগরের বুকে ভেসে যাব মোরা—
নীল জল দিবে দোলা,
তাহাতে ভাসিবে ছোট্ট ডিঙা
সাদা পালখানি তোলা
আরব সাগরে 'সিমুম' বহিবে
আগুন-ঝরানো হাওয়া,
রান্নু, থেকো তুমি পালের আড়ালে
যেখানে একটু ছাওয়া।
লোহিত সাগর ছেড়ে যাব মোরা—
'নীল' নদ দিব পাড়ি,
মানুষের গড়া কীর্ত্তি দেখিব—
পিরামিড সারি সারি।
ভাসিয়া চলিব সাগরের পথে
তুষার মরুর মাঝে—
'এস্কিমো'দের বরফের ঘরে
আশ্রয় নিব সাঁঝে।

গভীর নিশীথে 'মেরু'র মাঝারে
'মেরু-দীপালী'র খেলা—
রাণু আর আমি দেখিব বসিয়া
জেগে র'ব সারা বেলা।

'পীত' সাগরেতে নৌকা ভাসায়ে—
আমরা দেখিব 'ফুজি'
দক্ষিণ সাগরে বেড়াব আমরা—
প্রবালের দ্বীপ খুঁজি'

চলিবে মোদের ছোট্ট ডিঙা,
তুষারের স্রোতে ভেসে ;
'আমাজোন' নদী বহিয়া যাইব—
লাল মানুষের দেশে।

বাস্তব আর কল্পনা রচা
যাহা আছে, যাহা নাই—
ভেসে যাব সেথা এই ডিঙায়
মোরা দু'টি বোন-ভাই।

ছুটে' চল রাণু, লক্ষ্মী বোন্‌টি—
মিছে ব'সে থাকা ঘরে,
আলোর ধারায় পাগল করেছে,—
সাগর ডাকিছে মোরে।

মহারাষ্ট্রে আষাঢ় একাদশী কাহিনী

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

একদিন মধ্যাহ্নে এক মহারাষ্ট্রীয় মহিলা এসে বললেন—"আজ ঘুমের জ্বালায় থাকতে পারছিনে, তাই তোমার কাছে এসেছি।"

আমি বললাম—"কেন, তুমি কি দিনে ঘুমাও না ?"

মহিলা বললেন—"তা ঘুমোই, তবে আজ ঘুমোতে নেই।"

—"কেন ?"

—"কাল আষাঢ় একাদশী গেছে ; তুমি একাদশীর গল্প জান না বুঝি ?"

উত্তরে বললাম—"না"।

তখন মহিলাটি বললেন—"মন দিয়ে শোন, পুণ্য হবে।" এই ব'লে খুব ভক্তিভরে গল্পটি বলতে আরম্ভ করলেন :—

এক ছিলেন রাজা। তাঁর বিশাল রাজ্য। সে-রাজ্যের শোভা বাড়াত চমৎকার এক পুষ্পোদ্যান। সে উদ্যান রাজার বড় সাধের। দেশ-বিদেশ হ'তে বহু সুগন্ধ ও রংবেরং-এর ফুল এনে বাগানে লাগান হয়েছে। আট-দশজন মালী দিনরাত বাগানে কাজ করছে। রাজা রোজ নিয়মিতভাবে ভোর ও সন্ধ্যায় বাগানে পায়চারী করেন। নানা রংএর ফুলের শোভা, তার সুগন্ধ বাতাস রাজার মনে অফুরন্ত আনন্দ ও তেজ এনে দেয়।

রাজা একদিন ভোরে উঠে দেখেন এমন যে সাধের বাগান, তাও শ্রীহীন হ'য়ে গেছে। কোন্ চোর এসে সব ফুল চুরি ক'রে নিয়েছে। রাজা রেগে উঠলেন। চারদিকে পাহারা বসল চোর ধরতে, কিন্তু চোর ধরা পড়ে না। বাগানের সব সৌন্দর্য্য নষ্ট হ'য়ে গেল। ফুলের মিষ্টি সুবাস এসে এখন আর শরীর স্নিগ্ধ ক'রে দেয় না, ভ্রমরের মৃদু গুঞ্জন কানে মধু বর্ষণ করে না। দুঃখে রাজার চোখে জল এল। রাজা রেগে ঘোষণা করলেন—'আজ রাত্রে যদি চোর ধরা না পড়ে কোটাল, মালী ও পাহারাওয়ালাদের কাল ভোরে গর্দ্দান যাবে।' ভয়ে সবার মুখ চূণ হ'য়ে গেল। কোটাল, মালী সবাই হতবুদ্ধি ; তা'রা পরামর্শ ক'রে বলল—"আজ রাত্রে কিছুতেই চোখে ঘুম আসতে দেব না।" সবাই পাহারায় বসল, কিন্তু রাত্রি তৃতীয় প্রহর হ'তে না হ'তেই তা'রা ঘুমে ঢুলে পড়ল। কোটালের হঠাৎ চেতনা হ'ল। সে সবাইকে ডেকে বলল—"ভাই সব, এখন উঠে' পড়, ভোর হ'য়ে আসছে ; চোর ধরতে না পারলে গর্দ্দান যাবে।" সবাই ধড়ফড় ক'রে জেগে উঠল, কিন্তু ঘুম

কিছুতেই যায় না। তখন তা'রা করল কি,—বাগানের একপাশে কতকগুলো গাছ ছিল, সেগুলো টেনে নিয়ে আগুন ধরাল; তার ধূঁয়ায় তাদের ঘুম গেল টুটে। তা'রা তখন খুব সতর্কভাবে পাহারা দিতে লাগল।

এমন সময় তা'রা দেখতে পেল, আকাশ থেকে একটা পুষ্পরথ ধীরে ধীরে নেমে আসছে। তা'রা সকলে লুকিয়ে রইল। রথ ধীরে ধীরে বাগানে নামলে তার ভেতর থেকে অতি সুদর্শন এক যুবক নেমে ফুল তুলতে লাগলেন। এমন সুন্দর ভদ্রচোর দেখে ত তা'রা হতবুদ্ধি! কি করবে ভেবে পায় না। শেষে তা'রা হাতযোড় ক'রে বলল —"মহাশয়, আপনি যেই হোন, অনুগ্রহ ক'রে আমাদের রাজার কাছে চলুন, নইলে কাল আমাদের সবাইর ফাঁসী হবে।" যুবকটি বললেন —"তোমাদের রাজাকেই এখানে আসতে বল।" তা'রা নিরুপায় হ'য়ে ভয়ে ভয়ে রাজার কাছে গিয়ে বলল—"মহারাজ, চোর ধরা পড়েছে।" শুনে রাজা তাড়াতাড়ি বাগানে চললেন, কিন্তু গিয়ে পুষ্পরথ আর চোর দেখে ত একেবারে

অবাক্। অবশেষে রাজা বললেন—"মহাশয়, আপনি কে? আমার বাগান থেকে এভাবে ফুল চুরি করেন কেন?" যুবকটি বললেন—"মহারাজ, আমি গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠ; বিষ্ণুপূজার উদ্দেশ্যে আমি তোমার বাগান হ'তে ফুল তুলে নেই। কিন্তু তোমার রাজ্যে পাপ বেড়েছে ব'লে আমার রথ এখন আটকে পড়েছে। তা না হ'লে আমি কখন অদৃশ্য হ'য়ে যেতাম। তুমি এখন আমার রথকে যে ভাবেই হোক চালাও।"

রাজা মহাবিপদে পড়লেন। রথটাকে পূজা করলেন, আর গোদান করবেন, স্বর্ণদান করবেন ব'লে বহু মানত করলেন, কিন্তু বহু স্তব-স্তুতিতেও রথ নড়ল না। অবশেষে রাজা গন্ধর্ব্বের স্তুতি করতে লাগলেন। তখন গন্ধর্ব্ব বললেন—"রাজ্যে লোক পাঠিয়ে দেখ, কেহ

উপবাসী আছে কি না। আজ একাদশী দিন, যদি কেহ উপবাসী থাকে, তবে তার বহু পুণ্য হবে ; আর সেই পুণ্য যদি তুমি নিয়ে নাও, তবে আমার রথ চলবে।"

চারদিকে রাজার সেপাই ছুটল খবর নিতে, কোনও ঘরে কেউ উপবাসী আছে কি না। কিন্তু কাউকে উপবাসী না পেয়ে, তা'রা হতাশ হ'য়ে ফিরে আসছে, এমন সময় দেখতে পেল এক ব্রাহ্মণের ঘরের দরজা বন্ধ। খোঁজ নিয়ে জানল, শাশুড়ী ও বধূ দু'জনেই ঝগড়া ক'রে আজ উপবাসী আছে। তখন তা'রা পাল্কী ক'রে দু'জনকে রাজার কাছে নিয়ে চলল। রাজা তখন শাশুড়ী-বধূ দু'জনকে বহু স্বর্ণ দান করলেন ও তার বিনিময়ে একাদশী দিনের উপবাসের পুণ্য তাদের নিকট হ'তে কিনে নিলেন।

তৎক্ষণাৎ পুষ্পরথ নড়ে উঠল এবং ধীরে ধীরে আকাশে উঠতে লাগল ! তখন সেই গন্ধর্ব্ব বললেন—"মহারাজ, তোমার রাজ্য পাপে ভ'রে গেছে, তার প্রতিকার একাদশীর উপবাস। আর এই একাদশী দিন বেগুন খেতে নেই বা বেগুনগাছ জ্বালাতে নেই। তোমার রাজ্যে এই উপবাসের কথা ঘোষণা ক'রে দেও এবং তুমি নিজেও একাদশী করতে আরম্ভ কর। তা হ'লে রাজ্যে আর পাপ থাকবে না, তোমার পুণ্যের রাজ্য হবে।" এই ব'লে গন্ধর্ব্ব অদৃশ্য হ'লেন।

রাজা রাজ্যে ঢেঁড়া পিটায়ে দিলেন—"আজ হ'তে সব প্রজাকে আষাঢ় মাসে একাদশীর উপোস করতে হবে। এ একাদশীর নাম 'আষাঢ়ে একাদশী'। এদিন বেগুন খেতে নেই, শুধু ফল-মূল আর দুধ খেয়ে থাকবে ; পরের দিন স্নান ক'রে ব্রাহ্মণ-ভোজন অথবা গো-সেবা ক'রে নিজে পারণ করবে।"

রাজার আদেশমত রাজ্যে সবাই একাদশী করতে লাগল। রাজার সংসার পুণ্যে ভ'রে গেল। এদিকে স্বর্গরাজ্যে যমরাজ বেকার, তাঁর দূতেরা খালি হাতে ফিরে আসে। রাজার রাজ্যে মৃত্যু নেই, এমনই পুণ্যের রাজ্য। যমরাজ বিষ্ণুর দুয়ারে ধন্না দিয়ে পড়লেন। তখন যমকে আশ্বস্ত ক'রে বিষ্ণু এক অপ্সরীকে মর্ত্ত্যে পাঠালেন। অপ্সরীকে শিখিয়ে দেওয়া হ'ল সে যেন রাজার একাদশীর উপবাস ভেঙ্গে দেয়। বিষ্ণুর আদেশমত অপ্সরী সুন্দরী রমণীমূর্ত্তি ধারণ ক'রে মর্ত্ত্যে অবতরণ করল ও রাজার তুলসীমঞ্চের নিকট গিয়ে ব'সে রইল।

পরের দিন ছিল একাদশী। রাজা ভোরে উঠে' স্নান ক'রে তুলসীতলায় পূজো দিতে গিয়ে দেখেন, এক সুন্দরী কন্যা ব'সে আছে। দেখে রাজা ত অবাক্! রাজা সেই

কন্যাকে রাণী করতে চাইলেন। কন্যা এই সর্ত্তে রাজী হ'ল যে, সে যা চাইবে তাকে তা দিতে হবে। রাজা এতে স্বীকৃত হ'য়ে তাকে রাণী ক'রে আনলেন।

দিন যায়। পরের একাদশীতে নতুন রাণী জেদ ধরল, রাজাকে একাদশী-ব্রত ভঙ্গ করতে হবে। রাজা আর কি করেন, তাই স্বীকার করতে হ'ল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তে রাজার মনে অনুতাপ এল, রাজা বললেন—"তুমি অন্য কিছু চাও, আমি একাদশী ভাঙ্গতে পারব না।" তখন রাণী বলল—"তা হ'লে তোমার ছেলের মাথা কেটে দাও।" রাজা তাতেই রাজী হ'য়ে পুত্রকে জিজ্ঞেস করলেন—"একাদশী ভাঙ্গব, কি তোমার গলা কাটব।" ছেলে বলল—"আমার গলা কাট, তবু তুমি একাদশী ভেঙ্গ না।"
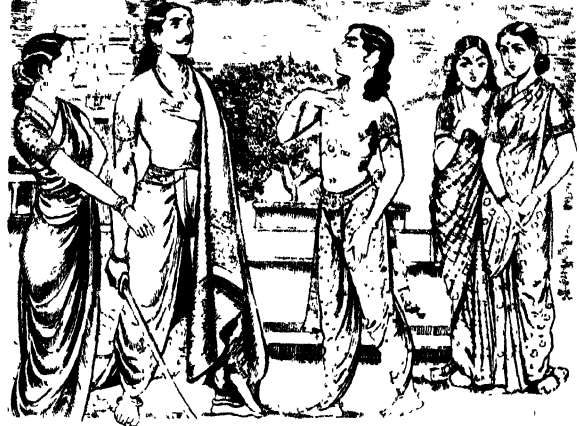
রাজার পাটরাণী ও পুত্রবধূ উভয়েই একবাক্যে বললেন—"রাজপুত্রের প্রাণ যায় তাও স্বীকার, কিন্তু মহারাজ যেন একাদশী-ব্রত ভঙ্গ না করেন।" রাজা মনের দুঃখ মনে চেপে নিজের প্রতিজ্ঞারক্ষা করতে তৈরী হ'লেন। তুলসীতলায় খড়্গ নিয়ে যেমনি ছেলের মাথা কাটতে গেলেন, অমনি আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হ'তে লাগল ও একটি রথ নেমে এল। দেবতারা রাজার নিষ্ঠা ও সাহস দেখে সন্তুষ্ট হ'লেন ও রাজা-রাণীকে সশরীরে স্বর্গে নিয়ে চললেন।

তখন অপ্সরী কেঁদে বিষ্ণুর পায়ে প'ড়ে বলল—"আমার কি গতি হবে? আমাকে মর্ত্ত্যে রেখে এখন সবাই স্বর্গে চলেছেন!" তখন বিষ্ণু বললেন—"ভয় পেয়ো না, তুমি মর্ত্ত্যে মোহিনী-মূর্ত্তি ধ'রে থাক। যারা একাদশীর পরের দিন পারণ ক'রে ঘুমোবে, তাদের শরীরে তুমি আশ্রয় ক'রো।"... ...

গল্প শেষ ক'রে মহিলাটি বললেন—"সেই মায়াবিনী অপ্সরা ঘাড়ে চাপবে ভয়েই আমি এ-বাড়ী ও-বাড়ী ঘুরে ঘুম তাড়াবার চেষ্টায় আছি।"

সহজ ম্যাজিক

যাদুসম্রাট্ পি. সি. সরকার
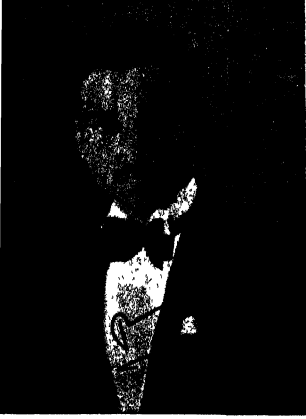
আজ 'শিশুসাথী'র পাঠকবর্গকে সহজ অথচ সুন্দর দুইটি খেলার কৌশল শিখাইব। খেলাগুলি দেখাইয়া তাঁহারা বন্ধুবান্ধবদিগকে অবাক্ করিয়া দিতে পারিবেন সন্দেহ নাই।

যাদুবিদ্যা বা ম্যাজিক করিতে দেখে নাই এমন বোধ হয় কেহই নাই। সকলেই যাদুকরের চমকপ্রদ মায়ার কৌশল দেখিয়া একবার অন্ততঃ মনে মনে চিন্তা করেন—"হায়রে, আমি যদি অমনি লোক ঠকাইতে পারিতাম!" কাহারও কাহারও এই আন্তরিক অভিলাষ ক্ষণস্থায়ী হয়, আবার কাহারও মনে ইহা তুষের আগুনের মত মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতে থাকে, শেষে একদিন উপযুক্ত ইন্ধন পাইয়া ভালরূপে জ্বলিয়া উঠে। আমি যাদুবিদ্যার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম খুবই অল্প বয়সে। কিন্তু আজও ম্যাজিক শিখিবার নাছোড়বান্দা খামখেয়ালী অভ্যাস ছাড়িতে পারি নাই। ইহার জন্য কত অনুযোগ শুনিয়াছি, এমন কি যথেষ্ট তাড়না পর্য্যন্ত সহ্য করিয়াছি। স্কুল-কলেজ ফাঁকি দিয়া পথের বেদিয়াদের পেছনে বহুবার ঘুরিয়াছি। বি. এ. পড়িবার কালে কতবার যে পরলোকগত যাদুকর গণপতির বাড়ীতে ধন্না দিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। পরিবর্ত্তে পাইয়াছি নির্ম্মল আনন্দ। আত্মপ্রসাদও লাভ করিয়াছি সত্য, কিন্তু লোককে আনন্দ দান করিয়া যে আনন্দ পাইয়াছি তাহার তুলনায় আত্মপ্রসাদও তুচ্ছ।

ম্যাজিক প্রধানতঃ দুই-তিন প্রকারে হয়। এক প্রকারের খেলা আছে যাহার জন্য কোন বিশেষ যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় না। নেহাৎ সাদাসিধা ভাবে কোনরূপ বিশেষ পোষাক না পরিয়া খালি হাতে নানারূপ খেলা দেখান হয়, ইহার নাম Impromptu Conjuring. ইহাতে কোনরূপ বাঁধাধরা সাজসরঞ্জাম, ষ্টেজ বা পোষাকের প্রয়োজন হয় না। চিত্রে দেখা যাইতেছে যে সিগারেটের প্যাকের নীচ হইতে একটি পয়সা উপরে উঠিতেছে, ঐ খেলাটি এই শ্রেণীর। দ্বিতীয় প্রণালীর ম্যাজিকে ছোট ছোট

ফাঁসীকাষ্ঠ অগ্রাহ্য করা (Pillory Illusion)র খেলা প্রদর্শনরত
যাদুসম্রাট পি. সি. সরকার

যাদুসম্রাট্ পি. সি. সরকার তাঁহার প্রসিদ্ধ দুধের খেলাটি
(Milk Miracle) দেখাইতেছেন

যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়। বসিবার ঘরে কয়েকজন লোকের সম্মুখে কিছু যন্ত্রপাতি বা ছোট ছোট জিনিসপত্র লইয়া এই শ্রেণীর খেলা দেখান হয়। ইহার নাম Conjuring. একটি চিত্রে আমার প্রসিদ্ধ দুধের খেলাটি (Milk Miracle) দেখান হইয়াছে; সেখানে একটি বোতল হইতে দুধ আস্তে আস্তে কমিয়া দর্শকদের পরীক্ষিত একটি চিনামাটির ডিস ও রুমাল ভেদ করিয়া নীচে গ্লাসে যাইতেছে। এই খেলাটি conjuring-এর শ্রেণীভুক্ত। তৃতীয় শ্রেণীর খেলার নাম Stage Magic. উহাতে রঙ্গমঞ্চের উপর বড় বড় যন্ত্রপাতি লইয়া খেলা দেখাইতে হয়। ব্লাক আর্ট, ইলিউসন (Black Art, Illusion) প্রভৃতি খেলা এই ষ্টেজ ম্যাজিকের পর্য্যায়ভুক্ত। প্রদত্ত চিত্রে আমি যে ফাঁসীকাষ্ঠকে ফাঁকি দেওয়ার খেলাটি দেখাইতেছি তাহা এই ষ্টেজ ম্যাজিকের পর্য্যায়ভুক্ত। এইবার আমি আমার পাঠকবর্গকে এই তিন শ্রেণীর খেলা শিখাইব।

প্রথম চিত্র

এগুলি অত্যন্ত সহজ—কিন্তু সহজ ম্যাজিক হইলেও প্রত্যেকটি খেলাই চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর। প্রথমতঃ Impromptu Conjuring-এর একটি খেলার কৌশল প্রকাশ করিব।

একটি খালি সিগারেটের বাক্স লও। উহার তলদেশে প্রদত্ত চিত্রের ন্যায় একটি পয়সা গুঁজিয়া দেও। এইবার উপর হইতে আঘাত করিলে সকলেই মনে করিবেন যে পয়সাটি মাটিতে পড়িয়া যাইবে, কিন্তু আসলে তাহা হইবে না। পক্ষান্তরে উহা আস্তে আস্তে উপর দিকে উঠিতে আরম্ভ করিবে এবং অবশেষে উপর দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়া যাইবে। দর্শকগণ ইহা দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন সন্দেহ নাই। তবে উপর হইতে আঘাত করিবার একটি বিশেষ প্রণালী আছে নতুবা হইবে না। প্রথম চিত্রে তীরচিহ্নদ্বারা (ক, খ) চিহ্নিত স্থানে একবার এদিকে পরের বার ওদিকে,

এইভাবে আস্তে আস্তে নীচের দিকে আঘাত করিতে হয়; অর্থাৎ একবার ক স্থানে আঘাত করিতে হয়, পরের বার খ স্থানে। আঘাত করিবার প্রণালী—যথা বাম হস্তে প্রদত্ত চিত্রের অনুরূপ ভাবে প্যাকেটটি ধরিতে হয় এবং দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা বন্ধ করিয়া শুধু তর্জ্জনী অঙ্গুলীদ্বারা আস্তে নীচের দিকে (eachside alternately) আঘাত দিতে হয়। খেলাটা নিজেরা বাড়ীতে করিয়া দেখ, অবাক্ হইয়া যাইবে।

এইবার শিখাইব Conjuring-এর একটি খেলা। কিন্তু এইটিকে Stage Magic হিসাবে দেখান যাইতে পারে। কাজেই এক হিসাবে ইহা Conjuring এবং অন্য হিসাবে একটি Stage Illusion.

এই খেলাটি দেখিতে অত্যন্ত লোমহর্ষণ। উপযুক্তরূপে দেখাইতে পারিলে দর্শকগণ ইহাতে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িবেন। একটি লোককে বড় খড়্গদ্বারা কাটা হইবে এবং তারপর তাহাকে পুনরায় বাঁচাইয়া দেওয়া হইবে। (চিত্র দেখিলে খেলা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মিবে।) অথচ এই খেলাটি যে-কেহ অনায়াসে দেখাইতে পারিবে। ইহার জন্য বিশেষ কোন হস্তকৌশলের, মন্ত্রের বা ঔষধের প্রয়োজন হয় না। সংক্ষেপে ইহাকে গলা-কাটার খেলা বলা যাইতে পারে।
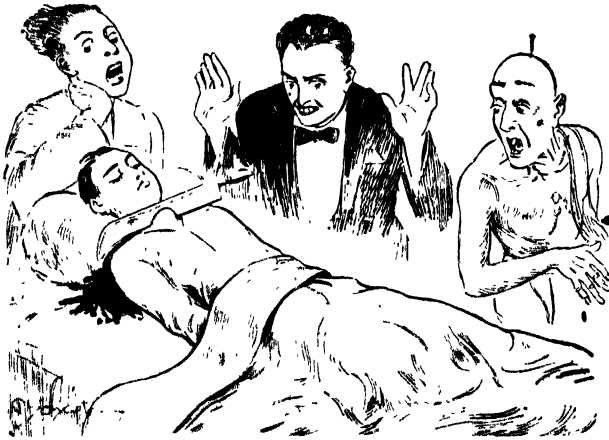
দ্বিতীয় চিত্র—গলা-কাটার খেলা

এইবার খেলাটির আসল কৌশল প্রকাশ করিব। দুইটি বড় দা রাখিতে হয়। একটিতে কোন প্রকার কৌশলকরা নাই; সেইটি সকলকে দেখাইতে হয়। অপর দা'টিতেই সর্ব্বপ্রকার কৌশল নিহিত আছে—সেটির সাহায্যেই এই খেলা দেখাইতে হয়। তৃতীয় চিত্রে দেখান হইয়াছে কিরূপে বড় রামদা'টির মধ্যস্থলে গলার মাপে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি (semi-circle) করিয়া অনেকটা অংশ কাটিয়া ফেলা হইয়াছে। যাদুকর প্রথমতঃ ভাল রামদা'টি সকলকে দেখাইয়া থাকেন, তারপর কৌশলে সেইটির পরিবর্ত্তে অপরটি লইয়া

(কাপড় ঢাকা অবস্থায় শায়িত) সহকারীর গলদেশে বসাইয়া দেন। এই রামদা'টি বসাইবার প্রণালী তৃতীয় চিত্র হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। ইহার পর ঘন লাল রং ঐস্থানে ঢালিয়া দিতে হয় এবং কাপড় সরাইয়া লইতে হয়। দর্শকগণ তখন এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া চিৎকার করিয়া উঠিবে।

ভারতীয় যাতুকরগণ বিশেষতঃ পথের বেদিয়ারা প্রায়ই এই খেলা দেখাইয়া থাকে। আমি কলিকাতা সেন্ট্রাল এভিনিউতে ও গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের নিকট বহুবার এই খেলা দেখাইতে দেখিয়াছি। দর্শকগণ প্রত্যেকবারই এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ড বা
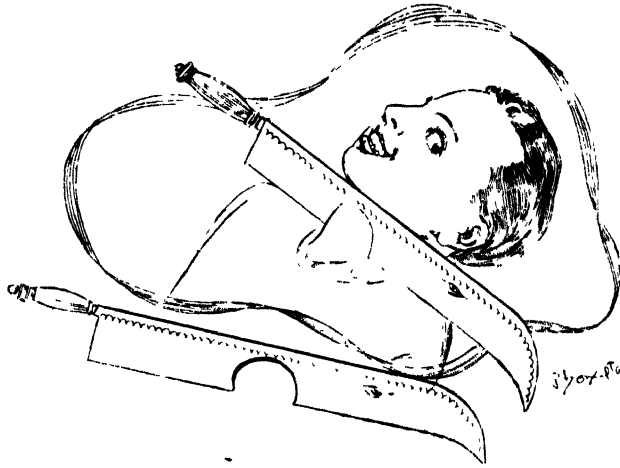
তৃতীয় চিত্র

গলা-কাটার খেলা দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন। আমার মনে হয় ইহা আমরাও রঙ্গমঞ্চে বিশেষ সাফল্যের সহিত দেখাইতে পারিব। প্রকৃতপক্ষে আমি অদ্যাপি এই খেলাটি যদিও দেখাই নাই, কিন্তু এই কৌশল অবলম্বন করিয়া শীঘ্রই খেলা দেখাইব। 'শিশুসাথী'র পাঠকবর্গ আমার এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আবার আমার খেলাই ধরিতে আসিবে। কিন্তু আমি জানি তাহারা তাহা করিতে পারিবে না। খেলাটিকে কৌশলে একটু ঘুরাইয়া দেখাইব, যাহাতে সকলে সহজে বুঝিতে না পারে। ইহা একটি উঁচুদরের খেলা।

শিশু-সাথী

শ্রীনরেন্দ্র দেব

যাদের চোখে চাঁদের আলো,
অধর মধুর হাস্যে ভরা,
কমল-কলির অমল আভা
কোমল কচি আস্যে ধরা ;
মনটি সদা সরল সাদা
তরলমতি চিত্ত অতি,
সবার কোলে আপন ব'লে
অবাধ যাদের নিত্য গতি :
যাদের ভাষা আশার বাণী
শোনায় কানে অবোধ গানে,
বাক্যে ঝরে সুধার ধারা
সর্ব্বহারাও প্রবোধ মানে ;

যাদের সাথী স্বয়ং ধাতা,
দেবতা রাজে যাদের মাঝে,
যাদের কলকণ্ঠে সদা
মহোৎসবের ডঙ্কা বাজে ;
বাসতে শেখো তাদের ভালো—
হাসতে শেখো তাদের কাছে,
জীবন-বীণার আনন্দ সুর
তাদের বুকেই মজুদ আছে ;
সুপ্ত তাদের মনের কোণে
ভবিষ্যতের স্বপ্ন ভরা,
মায়ের প্রাণের সার্থকতাই
তাদের স্নেহে মানুষ করা !
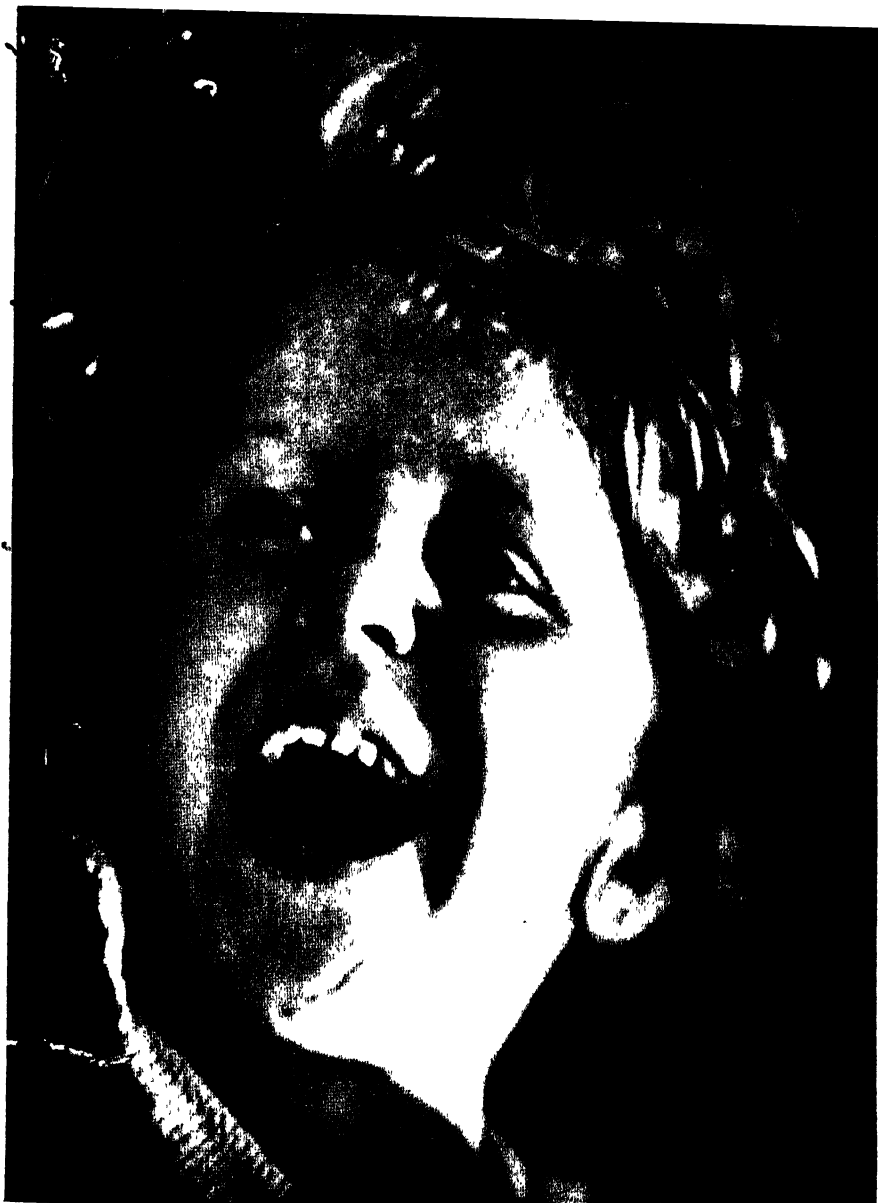
ঋষির কৃপায়

শ্রীকিরণচন্দ্র বিশ্বাস

অনেক—অনেক দিন আগের কথা।—

অবন্তীনগরে অতি পরাক্রমশালী এক রাজা ছিলেন; তাঁহার নাম সোমেশ্বর। রাজার ধন-সম্পদ, সেপাই-শান্ত্রী বা অন্য কিছুরই অভাব ছিল না। তথাপি তিনি ছিলেন পরম অসুখী; কারণ ধন-সম্পদ বা হীরা-জহরৎ থাকিলেই মানুষের মনে শান্তি থাকিতে পারে না। এমন একটা কিছু অভাব তাঁহার ছিল যেজন্য অজস্র মণি-মাণিক্য বা হীরা-জহরৎ থাকা সত্ত্বেও তিনি নিখিল সংসার শূন্য দেখিতেন। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান এবং ইহাই ছিল তাহার দুঃখের মূল কারণ।

রাজা একদিন দরবারে বসিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন, এমন সময় দ্বারপাল আসিয়া জানাইল যে, স্বয়ং রাজগুরু প্রাসাদ-দ্বারে উপস্থিত।

রাজা সিংহাসন ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইলেন এবং গুরুদেবকে স্বহস্তে পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। গুরুদেব আসন গ্রহণ করিলে রাজা করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রাজ্যের ও রাজপরিবারের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করার পর, গুরুদেব অপরাপর নানা বিষয় আলোচনা করিলেন। কথাবার্ত্তায় রাজার উদাসীন ভাব লক্ষ্য করিয়া গুরুদেব কহিলেন—"রাজন্! আপনার মনোদুঃখের কারণ আমি বুঝিতে পারিতেছি। আমার মতে আপনার পুনরায় দার গ্রহণ করা উচিত। আপনি পরলোকগত হইলে এই বিশাল

রাজ্য ছারখার হইয়া যাইবে। প্রজাকুলের বিপত্তির অবধি থাকিবে না। তা' ছাড়া শাস্ত্রের নির্দ্দেশমত পুত্রলাভের জন্য দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করা যাইতে পারে।"

রাজা সব কথা শুনিয়া, "যে আজ্ঞা গুরুদেব!" বলিয়া, বিবাহে সম্মতি দিলেন।

... ...

বিবাহের পর অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে। এখন রাজা প্রায় সর্ব্বদাই অন্দর-মহলে থাকেন; রাজকার্য্যে তাঁহার আর মন নাই। ছোটরাণীর প্ররোচনায় তিনি বড়রাণীর উপর অন্যায় আচরণ করিতেও কুণ্ঠিত হন না। বড়রাণী আর কি করেন—সবই নীরবে সহ্য করেন, আর চোখের জলে ভাসেন।

রাজার এইরূপ বিসদৃশ আচরণে প্রজাসাধারণ হইতে আরম্ভ করিয়া রাজ্যের প্রধান প্রধান রাজপুরুষ, মন্ত্রী, সেনাপতি প্রভৃতি সকলেই বিশেষ বিরক্ত হইয়া পড়িলেন। মন্ত্রিগণ নানারূপ চেষ্টা করিয়াও রাজাকে রাজকার্য্যে মনোযোগী করিতে পারিলেন না।

সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইলে মন্ত্রিগণ কূটবুদ্ধির আশ্রয় লইলেন। রাজা ও রাণীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইবার জন্য নানারূপ ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল এবং তাহাতে সুফলও ফলিল। একটা মিথ্যা অপবাদে উত্তেজিত হইয়া রাজা অন্তঃসত্ত্বা ছোটরাণীকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। ... ...

বসন্তকাল। বনের বৃক্ষলতা নব পল্লবে পল্লবিত। বৃক্ষ-ডালে বসিয়া কোকিলেরা মনের সুখে গান গাহিতেছে। ভ্রমরেরা পুষ্পকুঞ্জে গুন্-গুন্ সুরে গান ধরিয়াছে। মলয় পবন প্রস্ফুটিত-ফুল-গন্ধ বহন করিয়া দিক্-দিগন্ত আমোদিত করিতেছে।

এহেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যেই নির্ব্বাসিতা ছোটরাণী বিরস-বদনে বসিয়া আছেন। তিনি নতমুখে বসিয়া আপন অদৃষ্টের কথা চিন্তা করিতেছেন এবং সময় সময় আকাশ-পানেও তাকাইতেছেন। এইভাবে চিন্তা করিতে করিতে এক সময় তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইল। তিনি লতাগুল্মের উপর ঢলিয়া পড়িলেন।

অনেকক্ষণ পরে তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। তিনি যেন তন্দ্রাজড়িত চোখে চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন এবং সবিস্ময়ে দেখিলেন,—একটি ছোট্ট কুঁড়েঘরে জীর্ণ বিছানায় তিনি শায়িতা, আর তাঁহার শয্যার পার্শ্বে এক পলিতকেশ ঋষি। ঋষিঠাকুর তাঁহাকে বীজন করিতেছেন।

ঋষির সেবাযত্নে রাণী একটু সুস্থ হইলে, ঋষি বলিলেন—"মা, তোমার কোনও

ভয় বা বিস্ময়ের কারণ নাই। বৈকালবেলা বনের মধ্যে তোমাকে অচেতন অবস্থায় দেখিতে পাইয়া আমার আশ্রমে আনয়ন করিয়াছি। পরে সমস্ত বন ঘুরিয়া দেখিলাম, কিন্তু তোমার আত্মীয়-স্বজন বা অপর কাহারও দেখা পাইলাম না। যদি তুমি বল, তাহা হইলে আমি এখনই শিষ্যের দ্বারা তোমাকে তোমার গন্তব্যস্থানে পাঠাইয়া দিব।"

ঋষির সস্নেহ সম্ভাষণে রাণীর শোকসাগর উথলিয়া উঠিল। নিজকে সংযত করিয়া তিনি গদ্‌গদকণ্ঠে কহিলেন—"বাবা, আমার আর যাওয়ার স্থান নাই। আমি স্বামী-পরিত্যক্তা, কোন্ পাপে যে আমি······" বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, তখন আর কিছুই বলিতে পারিলেন না।

মুনিঠাকুর সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—"তাহা হইলে তুমি অন্যান্য শিষ্যাদের সঙ্গে আমার আশ্রমেই থাক। ভগবানের কৃপায় তোমার সকল দুঃখের অবসান হইবে।"

... ...

রাণীর পরিচয় ও অবস্থা জানিয়া, ঋষি তাঁহাকে কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন এবং ধর্ম্ম-বিষয়ে উপদেশ দিতেন। রাণীও ঋষিকে খুব ভক্তি করিতেন। ঋষির উপদেশে রাণী সকল ব্যথা ভুলিয়া যাইতেন। তিনি অন্যান্য শিষ্যাদের সঙ্গে থাকিয়া পুষ্প চয়ন করিতেন, তপোবনাশ্রিত পশু-পক্ষিগণকে স্বহস্তে খাবার দিতেন; আর মনে মনে পতি-দেবতার পূজা করিতেন। কিছুদিন পর, রাণী এক পুত্র-সন্তান প্রসব করিলেন।

মুনিঠাকুর নবজাত শিশুকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"রাণীমা, তোমার সাধনা পূর্ণ হইয়াছে। তোমার এই পুত্র ভবিষ্যতে প্রতাপশালী রাজা হইবে।"

রাণী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন—"বাবা, আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।"···

শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় নবকুমার বড় হইতে লাগিল। কৃষ্ণপক্ষে তাহার জন্ম হইয়াছিল; এজন্য মুনিঠাকুর আদর করিয়া তাহার নাম রাখিলেন—কৃষ্ণকুমার।

কৃষ্ণকুমার চঞ্চল হইলেও ঋষির আজ্ঞাবহ। ঋষিঠাকুরের চেষ্টায় কৃষ্ণকুমার অল্পদিনের মধ্যেই সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিল এবং ঋষির একজন প্রিয় শিষ্যরূপে পরিগণিত হইল। এখন সে দিনের প্রায় সকল সময় তপোবনের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়ায়, পশু-পক্ষিগণের সঙ্গে খেলা করে, কখন কখন মুনিঠাকুরের কাছে বসিয়া ধর্ম্মকথা শুনে।

... ...

অবন্তীরাজ সোমেশ্বর বহু সৈন্য-সামন্ত লইয়া মৃগয়ায় বাহির হইয়াছেন। ঘটনাক্রমে

তিনি সেই বনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমস্তদিন বনে বনে ঘুরিয়া সকলে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু একটি মৃগেরও সাক্ষাৎ মিলিল না। পরে নিরাশ হইয়া তাঁহারা একস্থানে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

এমন সময় দূরে ঝরণার ধারে একটি মৃগ রাজার দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া চুপি চুপি মৃগের অনুসরণ করিলেন। রাজা মৃগের নিকটবর্ত্তী হইলে মৃগটির দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়ে এবং সে তৎক্ষণাৎ উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে থাকে।

রাজা মৃগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিলেন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একটি বাঘ সম্মুখে পড়িয়া তাঁহার গতিরোধ করিল। তখন শরক্ষেপেরও অবসর নাই। তাই হতবুদ্ধি রাজা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে দুই-দুইবার একটা গাছে উঠিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু অনভ্যাস-বশতঃ উঠিতে পারিলেন না। তৃতীয়বার তিনি অনেকটা উঠিয়াছিলেন বটে, কিন্তু হঠাৎ পা পিছলাইয়া নীচে পড়িয়া গেলেন; ফলে হাত-পায়ে আঘাত পাইয়া চেতনাশূন্য হইয়া পড়িলেন।

কতক্ষণ পরে চেতনা ফিরিয়া আসিতেই রাজা শুনিতে পাইলেন, কে যেন মধুর স্বরে তাঁহাকে "মহারাজ!" বলিয়া সম্বোধন করিল। তিনি যে কোথায় কিভাবে পড়িয়া আছেন তাহা তাঁহার স্মরণ নাই। ডাক শুনিয়া তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং গাছে হেলান দিয়া দেখিলেন—ধরার বুকে সন্ধ্যা নামিয়াছে। আকাশে চাদ উঠিয়াছে। অদূরে দাঁড়াইয়া

আছে এক সৌম্য তাপসকুমার। আর সেই রক্ত-লোলুপ ব্যাঘ্রটি একটা পোষা কুকুরের মত মাথা নীচু কারয়া আস্তে আস্তে চলিয়া যাইতেছে। তাপসকুমারের প্রভাবেই যে হিংস্র ব্যাঘ্র স্বধর্ম্ম ভুলিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া রাজা বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

এই তাপসকুমার আর কেহ নহে—সেই ছোটরাণীর পুত্র কৃষ্ণকুমার।

এই সব দেখিয়া শুনিয়া রাজা কৃষ্ণকুমারকে লক্ষ্য করিয়া, ভক্তি-গদ্‌গদকণ্ঠে কহিলেন—"আপনাকে কোনও ঋষিকুমার বলিয়াই মনে হইতেছে। আপনিই আমার রক্ষাকর্ত্তা—প্রাণদাতা। এই অধমকে যদি অতদূর কৃপাই করিলেন তবে দয়া করিয়া আপনার পরিচয়-দানে আমাকে ধন্য করুন।"

কৃষ্ণকুমার বলিল—"মহারাজ! আপনি ভুল বলিতেছেন। আমার বিশেষ কোন গুণ নাই এবং ঋষিকুমারও আমি নই—তবে ঋষির আশ্রমে পালিত।"

রাজা তন্ময় হইয়া কৃষ্ণকুমারের কথাগুলি শুনিলেন এবং তাহার শরীরে রাজলক্ষণ সমূহ দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। আপন মনে নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে তিনি কহিলেন—"আপনি আশ্রমে পালিত হইলেও কোন রাজকুলে আপনার জন্ম বলিয়া আমার মনে হইতেছে।"

কৃষ্ণকুমার বলিল—"রাজন্! আপনি যথার্থ অনুমান করিয়াছেন। মায়ের মুখে শুনিয়াছি আমি রাজপুত্র। বিখ্যাত অবন্তীরাজ আমার পিতা। তবে ভাগ্যবিপর্য্যয়ে আমরা আশ্রমবাসী।"

রাজার ভাবান্তর হইল। তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—"এই অরণ্য মধ্যে তোমরা কে কে আছ এবং কোথায় থাক?"

—"আমার মা আর আমি মুনির আশ্রমে থাকি।"

কৃষ্ণকুমারের কথা শুনিয়া রাজা সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া গেলেন; তাঁহার চোখ দিয়া অশ্রুবিন্দু ঝরিতে লাগিল। তিনি আর হৃদয়ের ভাব গোপন রাখিতে পারিলেন না; অগ্রসর হইয়া কুমারকে আলিঙ্গন করিয়া আবেগভরে কহিলেন—"বৎস! আমিই হতভাগ্য অবন্তীরাজ। তুমিই আমার শেষকালের একমাত্র সম্বল—হারাধন।"

কৃষ্ণকুমার অবাক্। রাজাও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নির্ব্বাক্‌ভাবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, পরে কৃষ্ণকুমারের সঙ্গে আস্তে আস্তে আশ্রমের দিকে অগ্রসর হইলেন।

... ...

রাণী রাজাকে দেখিয়াই তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া অবিরলধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। রাজারও দুই গণ্ড অশ্রুসিক্ত হইল। ক্ষণকাল নিস্তব্ধতায় কাটিয়া গেল। পরে রাণী নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় মুনিঠাকুর আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন।

মুনিঠাকুরের আগমনে রাজা ও রাণী উভয়ে লজ্জানুভব করিতে লাগিলেন। মুনিঠাকুর রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হে পুরুষবর! রাণীমার আচরণে বুঝিতেছি, আপনিই অবন্তী-রাজ সোমেশ্বর। দৈবক্রমে আপনাদের বিচ্ছেদ ঘটিলেও আমি তপঃপ্রভাবে জানিতে পারিয়াছি, রাণীমার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক। রাণীমা বুঝিয়াছেন —পতি পরমদেবতা। আমার তপোবনে থাকা-কালীন ইনি একমাত্র আপনাকেই মনে মনে আরাধনা করিয়াছেন।"

ঋষির কৃপায় রাজা-রাণীর সব দুঃখের অবসান হইল। রাজা, স্ত্রী-পুত্রসহ মহাসমারোহে রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। প্রজাগণ তাহাদের ভাবী রাজাকে পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইল। রাজা পুত্রের মঙ্গলের জন্য যাগ-যজ্ঞ, পূজা-অর্চ্চনা, গো-দান, ভূমি-দান প্রভৃতি নানাবিধ অনুষ্ঠান করিলেন। রাজকুমারের কৃষ্ণকুমার নাম ঘুচিয়া গেল; রাজা আদর করিয়া তাহার নাম রাখিলেন—হারানিধি।

বর্ম্মামুলুকের প্যাগোডা-কাহিনী *

শ্রীচারুলাল মুখোপাধ্যায়, এম. এ., বি. এল., বি. টি.

বর্ম্মামুলুকের আজব কথা তোমরা অনেক শুনেছ। আজ সে-দেশের প্যাগোডার কথা তোমাদের বলব।

প্যাগোডা যে কি জিনিস, যে দেখে নি তার পক্ষে কল্পনা করাও মুস্কিল। যারা জাহাজে বর্ম্মা যায় তা'রা দূর থেকেই দেখতে পায়, এক একটি বিরাট প্যাগোডার সোনালী গম্বুজ সূর্য্যের আলোতে ঝক্‌ঝক্ করছে! সেগুলো সোনার তৈরী বা সোনার পাতে মোড়া; তাই দিনের

* এ, ম্যাই, রেডিও কোম্পানির সৌজন্যে

আলোতে তাকালে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। আবার রাত্রিকালে চাঁদের আলোতে মনে হয় যেন রূপকথার পরীরাজ্যে এসেছি। এই প্যাগোডাগুলো বুদ্ধদেবের মন্দির। শতাব্দীর পর শতাব্দী, বর্ম্মা রাজারা তাঁদের কত পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করেছেন এই প্যাগোডা তৈরীর জন্যে। তাই আজ সমস্ত বর্ম্মাদেশের যেদিকে তাকাও দেখতে পাবে এই সব সোনালী প্যাগোডা—বিশাল বিরাট দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে। আর লাল, নীল, সবুজ, রামধনুর সব রঙের লঙ্গী-পরা বর্ম্মা ও বর্ম্মিনীরা ফুলের মালা নিয়ে যায় ভগবান বুদ্ধদেবকে পূজা করতে সে-সব প্যাগোডায়।

বর্ম্মার সেই প্যাগোডা সৃষ্টির মূলে রয়েছে আমাদের এই ভারতবর্ষের প্রভাব। তাই আমরা দেখতে পাই যে, যীশুখৃষ্টের জন্মের পূর্ব্বে তৈরী পেগুর সোয়ে প্যাগোডা ও রেঙ্গুনের সোয়েড্যাগন প্যাগোডা হিন্দু-মন্দিরের আদর্শ নিয়েই তৈরী হয়েছিল। তখনকার দিনে ভারতবর্ষের

প্যাগোডায় বুদ্ধমূর্ত্তি

হিন্দুর আদর্শ বর্ম্মা, বালী, সুমাত্রা প্রভৃতি জায়গার (বৃহত্তর ভারতের) শিল্পীরা নিতেন, তাই এবিষয়ে আশ্চর্য্যের কোন কারণ নেই।

১০৪৪ খৃষ্টাব্দে অনহরটার রাজত্বকালে প্যাগোডা তৈরীর যুগ আরম্ভ হয়। তারপর প্রায় আড়াইশ' বছরের মধ্যে প্যাগোডার পর প্যাগোডা নির্ম্মিত হ'তে লাগল, যেন ক্ষিপ্র যাদুকরের হাতে। বর্ম্মাকে দেশ-দেশান্তর হ'তে মনে হ'ল যেন এক সোনালী মায়ার রাজ্য। কেন রাজা অনহরটা এই প্যাগোডা তৈরী আরম্ভ করালেন তার গল্প বলছি, শোন।

এক সময় রাজা তাঁর পালিত ভাই (foster-brother) ছক্কাটির সঙ্গে দ্বৈত-যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে ভাইটির মৃত্যু হওয়ায় অনহরটার বড় অনুতাপ হ'ল। তিনি দিন-রাত ভাবতে লাগলেন কি ক'রে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা যায়। এই সময়ে একদিন ভূতদের রাজা অনহরটাকে স্বপ্ন দেখিয়ে বললেন—"ভগবান বুদ্ধদেবের নামে প্যাগোডা নির্ম্মাণ কর, তোমার প্রজাদের ধার্ম্মিক কর, তাদের উপকার কর—তোমার পাপ দূরে যাবে। তুমি মনে শান্তি পাবে।"

কোন্ কোন্ জায়গায় এসব মন্দির হবে রাজা ভাবতে লাগলেন। ক্রমে তাঁর মাথায় এক বুদ্ধি এল; তিনি মন্ত্রীকে বললেন—"নিয়ে এস এক শ্বেতহস্তী। এনে ছেড়ে দাও তাকে, যেখানে ইচ্ছা সেখানে সে চ'লে যাক। তোমরা কিন্তু ওর পেছন পেছন যাবে। যেখানে হাতী বিশ্রাম করবে, আমি সেখানেই তুলব এক প্যাগোডা।"

হাতী হেলেদুলে চলছে। সে যেখানেই ক্লান্ত হ'য়ে বিশ্রাম করে রাজার শিল্পীরা এসে সেখানেই বিরাট মন্দির তুলতে স্রুরু করেন। বৎসরের পর বৎসর কত লোকজন খাটল, কত টাকা চ'লে গেল এ কাজে, কোন খেয়াল নেই। গ্রামের পর গ্রাম থেকে লোকেরা এসে রাজার কাজে সাহায্য করতে লাগল। যেখানেই হস্তী প্রভু বসলেন—সেখানেই হ'ল একটি প্যাগোডা। সেই প্যাগোডা কি ছোটখাট ব্যাপার, এক একটি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলের তিনগুণ!

অনহ্রটার তৈরী প্যাগোডার মধ্যে প্যাগানদেশের সোয়েজিগন সব চেয়ে বিখ্যাত। এই মন্দিরে তিনি অ্যাটনের রাজা মনুয়াকে সপরিবারে বন্দী ক'রে রেখেছিলেন। তাঁরা মন্দিরের ভৃত্যের কাজ ক'রে বন্দী-দশা কাটিয়ে দিলেন।

বর্ম্মাদেশের এই সব প্যাগোডা সৃষ্টির মূলে যে কত নিষ্ঠুরতা জড়িত আছে, তার দু'একটি বলব।

অনহ্রটা যখন মান্দালেতে টংবিরন প্যাগোডা নির্ম্মাণ করান তখন তাঁর পারিষদ সোয়েপিণ্ডি ও সোয়েপিণ্ডেকে বললেন—"এই প্যাগোডার জন্য দু'খানা ইট নিয়ে এস।" তা'রা রাজী হয় নি। কেননা, তাদের পিতা ছিলেন মুসলমান। অনহ্রটার হুকুমে তাদের হত্যা হ'ল।

এরপর যিনি রাজা হ'লেন তাঁর নাম ছিল ছলু। একবার পাশাখেলায় তিনি তাঁর পারিষদ ইয়ামন খাঁর কাছে হেরে যান। দু'জনে লাগল ঝগড়া। চটে' গিয়ে ছলু বললেন—"সাহস থাকে ত বিদ্রোহ কর।"

ইয়ামন খাঁ সাহস দেখালেন। সত্য সত্যই রাজার বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ করলেন। রাজা ছলু যুদ্ধযাত্রা ক'রে যখন মগোয়ে জেলার মধ্য দিয়ে যান, সেখানে তাঁর ছাউনির কাছে তৈরী করলেন সোয়েনা ব্যাঙ্ক প্যাগোডা।

তারপর রাজা হ'লেন চ্যানজিত্তা। তাঁর রাজত্বকালে ভারতবর্ষের বৌদ্ধ ভিক্ষু আর শ্রমণেরা পালিয়ে গিয়ে বর্ম্মাদেশে আশ্রয় নিচ্ছিলেন, কারণ তখন হিন্দুধর্ম্ম আবার জেগে উঠেছিল। বৌদ্ধেরা আর নিশ্চিন্তে ধর্ম্মকর্ম্ম করতে পারেন না। চ্যানজিত্তা ভারতবর্ষের বৌদ্ধদের সাদরে প্যাগানদেশে আশ্রয় দিলেন। চ্যানজিত্তা তাঁদের মুখে ভারতবর্ষের বৌদ্ধদের গৌরবময় কাহিনী ও বৌদ্ধ কারু-শিল্পের কথা শুনতেন। চ্যানজিত্তা তাঁদের কাছে উড়িষ্যার অনন্ত গুহা মন্দিরের অপূর্ব্ব শিল্পকলার বিবরণ শুনে অত্যন্ত মুগ্ধ হ'লেন। রাজার মনে হ'ল, ঐরূপ একটি মন্দির বর্ম্মাদেশে তৈরী করা চাই-ই।

তখন থেকে চ্যানজিত্তা দিনরাত্রি এই এক কথাই স্বপ্ন দেখতেন যে, কি ক'রে প্যাগান-

ব্রহ্মদেশের প্যাগোডা
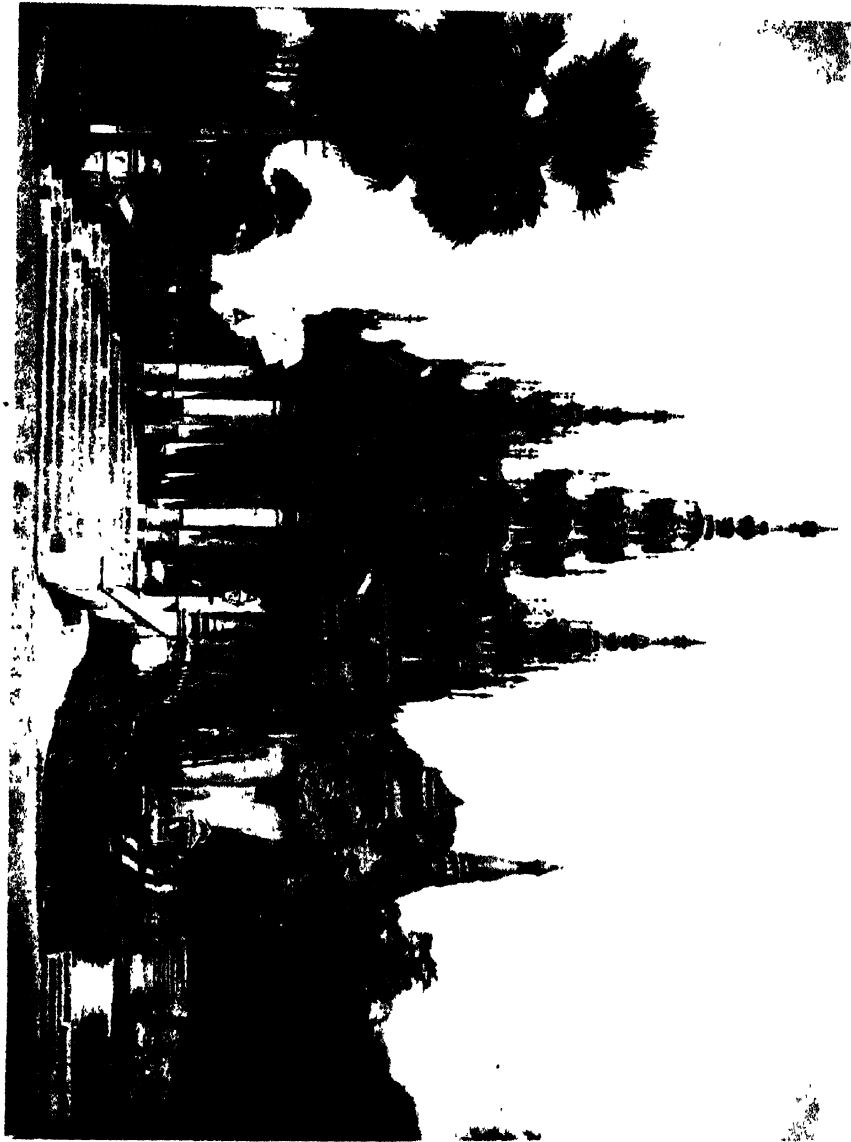
দেশকে বৌদ্ধধর্ম্মের তীর্থ ক'রে তোলা যায় এবং কি ক'রে সেখানে উঠতে পারে এমন এক মন্দির—যার খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে, সব বৌদ্ধদের বর্ম্মায় নিয়ে আসবে।

তাই আমরা দেখতে পাই—প্যাগানদেশে নির্ম্মিত হ'ল আনন্দ-মন্দির। তার কারুকার্য্য অপূর্ব্ব; এমন শিল্পকলা বড় একটা দেখা যায় না। যে দেখে সে-ই বলে, 'আনন্দ-মন্দির কি সুন্দর!' রাজা যা ভেবেছিলেন তাই হ'ল। দেশ-বিদেশে প্যাগানের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। সবাই চ্যানজিত্তাব প্রশংসা করে। শিল্পীর আর রাজার সুনাম লোকের মুখে ধরে না। দলে দলে লোকজন বর্ম্মায় আসতে লাগল আনন্দ-মন্দির দেখতে। সত্যই রাজার স্বপ্ন সত্য হ'ল। বর্ম্মার প্যাগানদেশ আজ সমস্ত বৌদ্ধদের তীর্থক্ষেত্র।

আনন্দে রাজা চ্যানজিত্তা পাগল হ'য়ে গেলেন। রাজা কেবল ভাবেন, 'তাই তো, এ কি ক'রে থাকবে? আজ আমার এত নাম—এত খ্যাতি, এ যদি কখনও চ'লে যায়! যদি আর কেউ এ শিল্পীকে দিয়ে এর মতই আর একটি মন্দির সৃষ্টি করে!' রাজার হর্ষে বিষাদ হ'ল। ক্রমে তাঁর মাথা খারাপ হ'ল। তাই তিনি শিল্পীকে হত্যা করলেন, যাতে সে বেঁচে থেকে অন্য কোথাও আর এমন মন্দির নির্ম্মাণ করতে না পারে। একটি শিশুকে বধ ক'রে, তার মৃতদেহ মন্দিরের ভিত্তিতে পুতে দেওয়া হ'ল—উদ্দেশ্য এর আত্মা চারদিকে ঘুরে ঘুরে মন্দিরকে রক্ষা করবে।

এখনও যদি তোমরা কেউ আনন্দ-মন্দির দেখতে যাও, সেখানকার লোকেরা স্পষ্ট দেখিয়ে দেবে,—'এই এখানে এই মন্দিরের শিল্পী মৃত্যু-যন্ত্রণায় মাটিতে লুটিয়েছিল।'

সে যাই হোক, আনন্দ-মন্দির দেখে একথা মনে হয় যে, চ্যানজিত্তার রাজ্য ইরাবতী নদীর মোহনা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল এবং বদ্বীপের তেলাইংদের ওপরেও তাঁর প্রভুত্ব ছিল।

চ্যানজিত্তা আরও ছোটখাট প্রায় চল্লিশটি প্যাগোডা তৈরী করেছিলেন।

তারপর যিনি রাজা হ'লেন তাঁর নাম আলংছিতু। তিনি ১১১২—৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। সেই রাজার-খেয়াল ছিল দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ান। আর যেখানেই তিনি যেতেন সেখানেই নির্ম্মিত হ'ত এক একটি প্যাগোডা। ঐ রাজার কীর্ত্তিসমূহ এখনও দেখা যায়—মিনবু, থাযেটমিও, মগক্, সোয়েবো, মন্থুয়া ও মান্দালে জেলায়। প্রবাদ আছে যে, এরূপ প্যাগোডা নির্ম্মাণ করতে করতে আলংছিতু পৃথিবীর শেষপ্রান্তে গিয়ে পৌছেছিলেন।

১১৪৪ খৃষ্টাব্দে আলংছিতু হাটপিন্নু প্যাগোডা নির্ম্মাণ করেন। সেই প্যাগোডা এত বিরাট যে, সেইটিকে সকল মন্দিরের রাজা আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

ক্রমে আলংছিতুর দিন ফুরিয়ে এল। তিনি তাঁর শেষ প্যাগোডা সোয়েগু নির্ম্মাণ করতে সুরু করলেন। তার সঙ্গে সঙ্গেই রাজা অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন।

দিন যায়। প্যাগোডার কাজ চলেছে। এদিকে রাজপুত্র নারাথু অস্থির হ'য়ে পড়েছেন। কারণ তাঁর রাজা হওয়ার পথের কাঁটা—তাঁর বৃদ্ধ পিতা। তারপর ঘটল এক নৃশংস

ঘটনা—এই প্যাগোডা সৃষ্টির ইতিহাসে। আর সহ্য করতে না পেরে আশী বছরের বৃদ্ধ রাজাকে রোগশয্যা থেকে টেনে নিয়ে এলেন তাঁর ছেলে নারাথু। তারপর গলা টিপে পিতৃহত্যা ক'রে তিনি সিংহাসনে বসলেন! এতেও তাঁর ভয় গেল না, একেবারে নিশ্চিন্ত হ'লেন না; তাই ভাই মিনসিঙ্কেও হত্যা করলেন।

নারাথু রাজা হ'লেন। কিন্তু এত পাপ যাবে কোথায়? তিনি দিনরাত অনুতাপে পুড়ে যেতে লাগলেন। কি করলে পিতৃহত্যা ও ভ্রাতৃহত্যার পাপ থেকে মুক্তি পাবেন—এই হ'ল তাঁর একমাত্র চিন্তা। তাই ভগবান বুদ্ধদেবের নামে দামায়ণ প্যাগোডা নির্ম্মাণ করলেন, যদি এতে পাপের কিছু প্রায়শ্চিত্ত হয় এই ভেবে। এই প্যাগোডাটির ইটের কাজ খুব সূক্ষ্ম ব'লে সবাই প্রশংসা করে। কিন্তু প্রকৃতির পরিশোধ বাকী ছিল। দামায়ণ প্যাগোডা নির্ম্মাণে তাঁর পাপ কাটে নি। তাই ইতিহাস বলে নারাথুর মৃত্যু হ'ল গুপ্ত-ঘাতকের হাতে। ঘাতকদের পাঠিয়েছিল রাজার শত্রুরা, ব্রাহ্মণ সাজিয়ে রাজাকে আশীর্ব্বাদ করতে। নারাথু গেলেন আশীর্ব্বাদ নিতে—অম্নি ব্রাহ্মণবেশী ঘাতকেরা রাজাকে হত্যা করল।

তারপর রাজা হ'লেন নরপতি সিথু (১১৭৩—১২১০)। সেই সময় সিংহল থেকে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব বিশেষ ক'রে ব্রহ্মদেশে পৌঁছেছিল। আবার বিশাল প্যাগোডা-শ্রেণী উঠল বর্ম্মার বুকে। সেই সব প্যাগোডার মধ্যে প্যাগানের পদপালিন ও সুলেমানী প্যাগোডা বিশেষ বিখ্যাত।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্যাগোডা সৃষ্টির কাজে ভাটা পড়েছিল। সেই সময় টিলোমিনলো রাজার তৈরী মহাবোধি ও সিত্তানা মন্দির ছাড়া আর কোনও উল্লেখযোগ্য মন্দিরের কথা জানা যায় না।

১২৭০ খৃষ্টাব্দে রাজা নারথিপতে মিংলাগেদী প্যাগোডা তৈরী করেন। এমন মন্দির অনেকেই তুলেছেন; কিন্তু কি জানি কেন ঐ মন্দির তৈরীর কাজ সুরু হ'তেই বর্ম্মার আকাশে বাতাসে একটা জনরব শোনা গেল—"অমঙ্গল অমঙ্গল! মিংলাগেদী প্যাগোডাও শেষ হবে বর্ম্মার প্যাগান্ রাজ্যও যাবে।"

হ'লও তাই। ১২৭৩ খৃষ্টাব্দে তাতার সমাট্ কুবলাই খাঁ রাজা নারথিপতের কাছে কর চেয়ে দুত পাঠালেন। তোমরা জান দুত অবধ্য। কিন্তু প্যাগান রাজ্যে এসে তাতার দূতেরা পায়ের জুতো খোলে নি ব'লে রাজা তাদের বধ করলেন। যুদ্ধ বাধল বর্ম্মায় আর তাতারে। ১২৭৭ খৃষ্টাব্দে তাতার তীরন্দাজেরা প্যাগান-রাজের হস্তী-সৈন্যকে পরাজিত করল। তারপর হ'ল হাতাহাতি দ্বৈত যুদ্ধ। সেই যুদ্ধেও তাতারেরা জয়ী হ'ল, বর্ম্মারা পালিয়ে বাঁচল।

ভয়ে ত্রস্ত রাজা নারথিপতে শত শত প্যাগোডা ভূমিসাৎ ক'রে আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত করলেন। রাজধানী প্যাগান থেকে নেওয়া হ'ল বেসীনে, তারপর ডালায়। এক সময় যখন রাজা প্যাগানে যাচ্ছিলেন প্রোমের রাজা বিষপ্রয়োগে হতভাগ্য নরপতিকে হত্যা করলেন। এইরূপে

জনরব সত্য হ'ল। প্যাগান রাজ্য শেষ হ'ল। বর্ম্মাদেশ চীন ও শ্যামের করদ হ'ল এবং নানাভাবে বিভক্ত হ'য়ে শান রাজগণের আধিপত্য স্বীকার করল।

বর্ম্মার ইতিহাসে প্যাগানের আর চিহ্ন রইল না। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, দুই শতাব্দী ধ'রে ব্রহ্মদেশকে একসঙ্গে মিলিত ক'রে রেখেছিল প্যাগান-রাজারা। তাঁরা পবিত্র বৌদ্ধ-ধর্ম্মের দীপশিখায় বর্ম্মাকে রেখেছিলেন আলোকিত ক'রে। আর অসংখ্য প্যাগোডা নির্ম্মাণ ক'রে বর্ম্মাদেশকে তাঁরা এমন এক অপূর্ব্ব মায়ারাজ্যে পরিণত করেছিলেন যে, আজও প্যাগান বর্ম্মার প্যাগোডা দর্শন—জগতের পরিব্রাজক ও শিল্পীদের জাগ্রতে চিন্তা, নিদ্রায় স্বপ্ন।

কাঠের তরবারি

শ্রীকালিদাস রায়, বি. এ., কবিশেখর

নরসিং রাও, রাজা ঠিক নয় দলপতি বলা যায়;
জমি-জমা তার ছিল বহু আর সখ ছিল মৃগয়ায়।
ভুবন চোহান তাহার অধীনে ছিল এক জমাদার,
জমাদারি ক'রে পালিত ভুবন প্রকাণ্ড সংসার।
মূর্খ ভুবন হরিনামে তার ঝরিত নয়নজল,
হৃদয়ে ভক্তি কটিতে তাহার তরবারি সম্বল;
পেটের দায়ে সে করে জমাদারি বৈরাগী তার প্রাণ,
অবসর পেলে শুনে ভাগবত গায় সে ভজন-গান।
প্রভুর সঙ্গে মৃগয়ায় গিয়া একদিন জমাদার,
প্রভুর আদেশ এড়াতে না পারি আঘাতিয়া তরবার-

গর্ভিণী এক হরিণীরে বধ করিয়া ফেলিল হায় ;
প্রসূত শাবক শোণিতের স্রোতে লুটায়ে পড়িল পায়।
যেই তরবার চিরসাথী তার—জীবিকার সম্বল,
যমুনার জলে তারে ছুড়ে ফেলে মুছিল সে আঁখিজল।
ভাবিতে লাগিল হারাইয়া তারে—রুজী জুটে যার জোরে,
দশটি ক্ষুধিত মুখে তুই মুঠা যোগাবে কেমন ক'রে।
অনেক ভাবিয়া বানাইল এক কাষ্ঠের তরবারি,
খাপে পূরে তাই চাকরি করিতে ফিরিল প্রভুর বাড়ী।
কাঠের সে অসি কোমরে ঢুলায়ে কেটে গেল মাস চার,
খাপ হ'তে তারে বা'র করিবারে হ'লো নাকো দরকার।

গেল মাস চার শিকারে আবার গেল নৃসিংহ রায়,
সাথে যেতে হ'লো ভুবন চোহানে, এড়ানো হইল দায়।
সারা জঙ্গল হ'লো তোলপাড় প'ড়ে গেল তায় সাড়া,
বন্যশূকর একটি ভীষণ ভুবনে করিল তাড়া।
হাতীর উপর হইতে করিল নরসিং চীৎকার,—
"তলোয়ার দিয়ে শূকরে ভুবন কর কর সংহার।"
তলোয়ার-বাঁটে হাত দিল না সে, কাঠের পুতুল যেন
রইল দাঁড়ায়ে কেহ বুঝিল না, হেন মতি তার কেন ?
পালাল শূকর দন্তে চিরিয়া ভুবনের উরুদেশ,
ভূমিতে লুটাল ভুবনের দেহ, মনে হ'লো সব শেষ।

মরিয়া বাঁচিল ভুবন, তু'মাস রহিয়া শয্যাগত,
অনেক যত্ন পরিচর্য্যায় সারিয়া আসিল ক্ষত।
প্রভু কহিলেন, "খুব বেঁচে গেলে বাঁচিয়ে দিলেন হরি,
এতদিন তোমা বলি নি ভুবন, আজ জিজ্ঞাসা করি—
কি তোমার হ'লো, কোমরে তোমার ঢুলছিল তলোয়ার,
বন্যশূকরে বধিবারে কেন করিলে না ব্যবহার ?"

কহিল ভুবন হাত জোড় করি, "কাষ্ঠের তরবারি,—
তা দিয়ে শূকরে কেমনে হুজুর, বলুন রুখিতে পারি ?"
প্রভু কহিলেন—"সে কি হে ভুবন, কোথা গেল তব আসি ?"
ভুবন কহিল—"মুক্ত সে পাপী যমুনার জলে পশি'।"
সব কথা খুলে বলিয়া ভুবন ফুঁপিয়ে উঠিল কাঁদি—
"করুণা কি পাব ? ক্ষমিবেন প্রভু ? আমি বড় অপরাধী।"
প্রভু কহিলেন—"ধন্য ভুবন, সাধক পুরুষ তুমি,
তোমারে বক্ষে ধরিয়া ভক্ত, পূত এ জন্মভূমি।
মূর্খ ভুবন, সাধনমার্গে আগায়েছ তুমি তবু,
যোগ্যতা নেই এই পামরের হইতে তোমার প্রভু।
দাস্য হইতে মুক্তি লভিলে, নও আর পরাধীন,
মাসে মাসে তুমি পাবে মাসোয়ারা বেঁচে রবে যতদিন।
শপথ করিয়া আজি হ'তে আমি মৃগয়া দিলাম ছাড়ি,
সকল অস্ত্রে জয় করিয়াছে ও কাঠের তরবারি।

আর উহা নয় তোমার ওধন মোর হ'লো আজ থেকে,
রাধাবিনোদের চরণের তলে দিব আমি উহা রেখে।
আজি হ'তে তব সংসারভার আমি নিজে লইলাম,
যতদিন বাঁচো তাঁর কৃপা যাচো, কর তুমি হরিনাম।"

কালা-বোবা

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, বি. এ.

সাধারণের একটা ধারণা আছে যে, বাক্‌যন্ত্রের কোন দোষের জন্য বোবা শিশু কথা বল্‌তে পারে না। কিন্তু বোবা শিশু সাধারণ শিশুর মত হাসে, কাঁদে, নানা রকমের শব্দ করে। তার বাক্‌যন্ত্রের যদি কোন দোষ থাক্‌ত তা' হ'লে কি সে কোনও শব্দ কর্‌তে পার্‌ত! কেউ কেউ বলেন যে, বোবাদের আল্‌জিভ নেই ব'লে তা'রা কথা বল্‌তে পারে না;—এই সব ধারণাই ভুল।

আমরা জন্মের পর থেকেই কথা বলি না, কথা শিখ্‌তে হয়। শিশু কথা বল্‌তে শিখে প্রথমে তার মা, বাবা. ভাই-বোনদের কথা শুনে। শিশু অনুকরণপ্রিয়। তাই সে কথা শুনে কথা অনুকরণ কর্‌তে যায় এবং ফলে "বা—বা—বা", "মা—মা—মা" প্রভৃতি কথা শিখে। প্রথমে সে আধ-আধ কথা বলে, তারপর যতই সে বড় হ'তে থাকে, ততই তার কথা স্পষ্ট হ'তে থাকে।

বোবাদের মধ্যে কেউ কেউ জন্ম-কালা, আবার কেউ কেউ জন্ম হওয়ার পরে বসন্ত, মেনিন্‌জাইটিস্‌, টাইফয়েড্‌ প্রভৃতি কঠিন রোগে ভুগে কালা হয়। কালা হয় ব'লে সে কোনও কথা শুন্‌তে পায় না এবং তাই সে কোনও কথা বল্‌তেও পারে না অর্থাৎ বোবা হয়। এখন তোমরা বুঝ্‌তে পার্‌লে, কালা হ'লে বোবা হয় কেন?

সাধারণ লোকের মধ্যে একটা ধারণা আছে যে, বোবারা বুদ্ধিহীন; কিন্তু তা' ভুল। তোমাদের মধ্যে যেরূপ কেউ বেশী বুদ্ধিমান্‌ (intelligent), কেউ সাধারণ বুদ্ধিমান্‌ (average), আবার কেউ বোকা (below par)—বুদ্ধি-শুদ্ধি বিশেষ তার নেই বল্‌লে হয়। বোবাদের মধ্যেও সেরূপ আছে। তোমাদের ও বোবাদের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায় সেটা তার স্বাভাবিক বুদ্ধিহীনতার জন্যে নয়, তার কারণ বোবারা কথা বল্‌তে পারে না ব'লে তাদের স্বভাবজাত গুণগুলো তোমাদের মত ভাষায় প্রকাশ কর্‌তে পারে না। ঠিক্‌ একটা ধারাল ছুরিকে ব্যবহার না কর্‌লে যেমন মর্‌চে প'ড়ে ভোঁতা হ'য়ে যায়, তেমনি বোবাদের বুদ্ধিবৃত্তিও ব্যবহার হয় না ব'লে মর্‌চে প'ড়ে যায়—উন্মেষ হয় না।

আগেই বলেছি যে, বোবারা কানে শুন্‌তে পায় না। তাই কান দিয়ে জ্ঞান লাভ তাদের ভাগ্যে ঘটে' উঠে না। এই অভাবটা পূরণের জন্য তাদের নির্ভর করতে হয় তাদের এক জোড়া চোখ ও হাতের আঙ্গুলগুলোর ওপর। তাই তাদের চোখ দুটো ও আঙ্গুলগুলোকে অনেক যত্ন ক'রে অনুভূতি শিক্ষা দিয়ে কার্য্যকরী ক'রে তুল্‌তে হয়।

শিশুরা জ্ঞান-লাভের জন্যে প্রথমেই চোখ দুটোকে ব্যবহার করে। তাই বোবাদের চোখ দুটোকে প্রথমেই কার্য্যকরী করতে হয়। বোবা শিশুর সাম্‌নে নানান রংএর উলে ভরা দুটো বাক্স রেখে শিক্ষক একটা বাক্স থেকে এক রংএর উল দেখান, তা' দেখে ছেলেটি অপর বাক্স থেকে সেই রংএর উল বের ক'রে দেখাবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাকে একসঙ্গে দু'-তিন রংএর উল দেখালে সে অনায়াসে অন্য বাক্স থেকে অনুরূপ রংএর উলগুলো তুলে দেখাবে। তখন বুঝ্‌তে হবে যে, তার চোখ দুটো কথা শেখাবার জন্যে উপযোগী হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতি-শক্তি তীক্ষ্ণ হয়েছে।

এবার আঙ্গুলগুলো কি ক'রে কার্য্যকরী কর্‌তে হয় তা' বল্‌ছি মন দিয়ে শোন। তোমরা বেহালা দেখেছ নিশ্চয়ই। বেহালা যখন বাজে তখন তারগুলো একসুরে বাজে কি? না। এই যে সুরের পার্থক্য তোমরা কিরূপে বুঝ্‌তে পার বল দেখি? তোমরা নিশ্চয়ই বল্‌বে, "কান দিয়ে।" কিন্তু হতভাগ্য বোবারা ত কানে শুন্‌তে পায় না! তাই তাদের আঙ্গুলগুলো দিয়ে কানের কাজ সেরে নিতে হয়। শিক্ষক বেহালা বাজাতে থাকেন এবং বোবা শিশুটিকে বেহালার ওপর আঙ্গুলের ডগা দিয়ে স্পর্শ ক'রে কম্পন বা স্পন্দন অনুভব কর্‌তে বলেন। উঁচু সুরের কম্পন, নীচু সুরের কম্পনের মত নয়। সব সুরের কম্পনই বিভিন্ন। এই বিভিন্নতা যেমন কান দিয়ে তোমরা শুন্‌তে পার, তেমন স্পর্শের সাহায্যেও অনুভব করা যায়। এইভাবে বোবা শিশু সুরের তারতম্য উপলব্ধি করে। তার চোখ দুটো বেঁধে দিয়েও তাকে পরীক্ষা করা হয় যে, কম্পনের তারতম্য-জ্ঞান তার হয়েছে কিনা! এইরূপে তার আঙ্গুলগুলোর ডগাতে অনুভূতি-শক্তি তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠে।

এই তীক্ষ্ণ অনুভূতি-শক্তি অন্ধ-কালা-বোবাদের পরম বন্ধু। এ সম্বন্ধে একটা ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি, শোন। আমেরিকায় ডাঃ হেলেন্ কেলার নামে এক অতুলনীয় রূপসী মহিলা অন্ধ, কালা ও বোবা হয়েছিলেন। তিনি তাঁর শিক্ষয়িত্রী মিস্ সালিভ্যানের হাত স্পর্শ ক'রে বা এক হাতের আঙ্গুল দিয়ে সালিভ্যানের গলা ও অপর

হাতের আঙ্গুল দিয়ে ঠোঁট স্পর্শ ক'রে ভাষা শেখেন। এইরূপে তিনি ল্যাটিন্, ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মান ও ইংরেজী ভাষাতে অগাধ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। তাঁর অনুভূতি-শক্তি এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, তিনি সঙ্গীতজ্ঞের ঠোঁট স্পর্শ ক'রে আনন্দ উপভোগ কর্তেন, পরিচিত ব্যক্তির হাত স্পর্শ ক'রে তাঁর নাম ও গুণ বল্তে পার্তেন, পাথরের মূর্ত্তিকে স্পর্শ ক'রে শিল্পীর মনোগত ভাব বুঝ্তে পার্তেন! এত কষ্ট স্বীকার ক'রেও তিনি অধ্যবসায়-বলে কত উন্নতি করেছিলেন বল ত!

ডাঃ হেলেন্ কেলার ও তাঁর শিক্ষয়িত্রী

সাধারণ শিশু কথা বল্বার আগে কথা বুঝ্তে আরম্ভ করে। সে হয়ত কথাগুলো পরিষ্কার ক'রে বল্তে পারে না; কিন্তু "আমার কাছে এস" বল্লে, সে এগিয়ে আসে। তাই বোবা শিশুকে কথা বল্তে শেখাবার পূর্ব্বে অপরের কথা বুঝ্তে শেখান হয়।

তাই কথা বলার সময় যে ঠোঁট, জিভ প্রভৃতি কথা বল্বার যন্ত্রগুলোর বিভিন্ন গতি হয় তা' দেখে সে অপরের কথা বুঝ্তে পারে। একে ওষ্ঠ পাঠ বলে।

শিক্ষক সাম্‌নে একটি বড় আয়না এমনভাবে রাখেন যেন বোবা শিশুটি তাঁর কথা বলার সময় কথা বল্বার যন্ত্রগুলো ভাল ক'রে লক্ষ্য কর্তে পারে। তারপর শিক্ষক ছেলেটির একটি আঙ্গুলের ডগা নিয়ে তাঁর বুকের মাঝামাঝি জায়গায় রেখে স্বর দিতে থাকেন এবং শিশুটিকে অনুরূপ শব্দ দিতে বলেন। বোবাদের প্রথমে অ না

শিখিয়ে আ শেখান হয়। শিশুরা যখন কাঁদে, তখন প্রথমেই আ শব্দ বেরিয়ে আসে। তাই, তাদের কাছে অ অপেক্ষা আ আরও সহজ ও স্বাভাবিক। তারপর অন্যান্য স্বরবর্ণগুলো শেখান হয়। স্বরবর্ণগুলো ভাল ক'রে শিখ্‌তে পার্‌লে কথা ভাল হয়। তাই স্বরবর্ণগুলো ভাল ক'রে শেখার পরে ব্যঞ্জনবর্ণগুলো শেখান হয়। প্রথমে প ত, ট, ক এই বর্ণগুলোর মূল উচ্চারণ প্, ত্, ট্, ক্ শেখান হয়। তারপর ঐগুলোর সঙ্গে স্বরবর্ণগুলো যোগ ক'রে যে যে শব্দ হয়, তাদের সংযোগে পা, পাতা, আতা, টাকা, কাকা প্রভৃতি কথা পাওয়া যায়। বোবা শিশুদের শিখিয়ে সেগুলোর দ্বারা কি বুঝায় তা' বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এইরূপে তা'রা কথিত ভাষার সব উচ্চারণ শিখে। তারপর ছোট ছোট পদগুলো দিয়ে ছোট ছোট বাক্য এবং ছোট ছোট বাক্য দিয়ে ছোট ছোট গল্প প্রভৃতি শেখান হয়। বোবাদের কথা তোমাদের কথার মত শ্রুতিমধুর হয় না, কারণ কথার মধ্যে যে সঙ্গীত তোমরা শুনতে পাও তা' কান না থাক্‌লে হয় না।
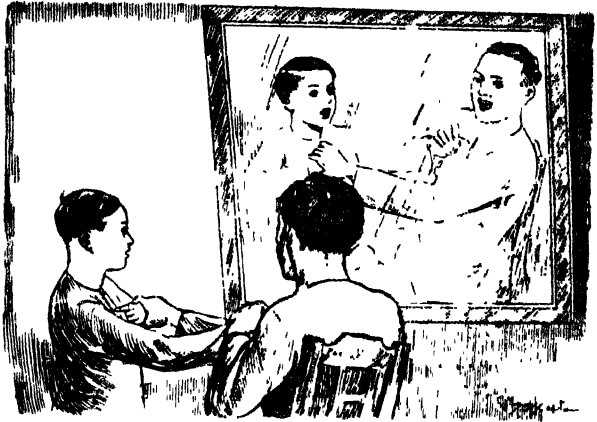
আ বলা শেখান হচ্ছে

মা বা আম বলা শেখান হচ্ছে

পূর্ব্বে বোবাদের শিক্ষা দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে বোবাদের কথা বল্‌তে শিক্ষা দেওয়া যায়। পাশ্চাত্ত্য দেশে বোবাদের শিক্ষা

দেওয়ার জন্য যেরূপ সুব্যবস্থা আছে তার তুলনায় আমাদের দেশের বোবাদের শিক্ষার ব্যবস্থা কিছুই নেই বল্‌লে হয়—যদিও আয়তনে ভারতবর্ষ গ্রেট বৃটেনের ২১ গুণ, আমেরিকার অর্দ্ধেক ! নীচে ভারতবর্ষের সঙ্গে অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য দেশের তুলনা কর্‌লাম—

	মোট লোকসংখ্যা	মূক-বধিরের সংখ্যা	মূক-বধির স্কুলের সংখ্যা
ভারতবর্ষ	৩৫ কোটি	২০০,০০০	২৫
আমেরিকা	১১ কোটি	৯০,০০০	২০৯
গ্রেট বৃটেন	৫ কোটি	৪০,০০০	৬৫

বাংলাদেশে কালা-বোবাদের সংখ্যা ৩৫,০০০। তার মধ্যে বোবা বালক-বালিকার সংখ্যা ১১,০০০, বোবা ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা মাত্র ৩০০ এবং স্কুলের সংখ্যা ১০।

আমাদের বাংলাদেশে যে সকল মহাপুরুষ এই হতভাগ্য বোবাদের উন্নতির জন্য সমস্ত স্বার্থ-সুখ-সম্ভোগ বিসর্জ্জন দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে স্বর্গীয় যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত, স্বর্গীয় শ্রীনাথ সিংহ এবং শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন মজুমদার অগ্রণী। কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান সুযোগ্য অধ্যক্ষ রায় সাহেব অটলচাঁদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সুপরিচালনায় বিদ্যালয়ের যথেষ্ট উন্নতি হচ্ছে। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে, কালা-বোবাদের উন্নতিকল্পে "নিখিল ভারতীয় মূক-বধির শিক্ষক সম্মেলন" নামে একটি সমিতি গঠিত হয়েছে। তাঁদের সাহায্যে বাংলাদেশের স্থানে স্থানে কালা-বোবাদের জন্য স্কুল স্থাপিত হচ্ছে এবং পরেও হবে।

মহামানব

শ্রীদীপক গুপ্ত

অনাবিল শিশুমন সোজাসুজি বোঝে,
জগতে জটিল কিছু তা'রা নাহি খোঁজে।
করে সোজা ব্যবহার, সোজা কথা বলে,
বসে ও দাঁড়ায় সোজা, সোজা পথে চলে।
শিশু হেন সোজা মন হ'লে সবাকার,
থাকিত না পৃথিবীতে এত ব্যথা-ভার।

শিবের সুন্দর ছবি বহুবর্ণে এঁকে,
শিল্পী এক গৃহ-কোণে দিয়েছেন রেখে।
শিশু পুত্র দেখি কহে—"বাবা, দেবলোকে
আর কি দেবতা কোন দেখিল না চোখে?
পরিধানে পশুচর্ম্ম, ভস্ম সারা গায়,
শিরেতে জটার ঘটা দেখে হাসি পায়।
বিষ খেয়ে কণ্ঠ নীল, হাতেতে ত্রিশূল,
ধুতুরা গুঁজেছে কানে, নাহি অন্য ফুল!
সাপ গায়, গাঁজা খায়, শ্মশানেতে থাকে,
'মহাদেব' কেন বলে এই দেবতাকে?"

হানি' এত প্রশ্ন-বাণ শিশু শুধু হাসে;
তনয়ে জনক কহে সুমধুর ভাষে—
"ত্রিভুবনে যাহা কিছু ভোগ-বিলাসের,
কিছুরই অভাব নাই, খোকা, মহেশের।
ত্যাগ ক'রে সব, ভোগ-বাসনায় জিনি'
দেবলোকে মহাদেব হয়েছেন ইনি।"

শুনে শিশু খুশী হ'য়ে জনকে জানায়,
সে-ও জিনি' সব সুখ-ভোগ-বাসনায়,
ত্যাগ ক'রে লালসা ও বিলাসের সব,
মানবের মাঝে হবে সে 'মহামানব।'

চিত্র-শিল্পী সুখী হ'য়ে পুত্রে নিল বুকে,
বিশ্ব-শিল্পী সুখী হ'ল নিজ সৃষ্টি-সুখে।

গল্পের যাদুকর

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ গুপ্ত

দাস-ব্যবসায়ীর একটি দল। ব্যবসায়ী দাস-পণ্য লইয়া চলিয়াছে সুদূর এফেসাসের বাজারে। দলে পুরুষ, নারী, ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে সবই আছে। প্রত্যেকের পিঠে ভারী বোঝা, কিন্তু ঐ কদাকার বেঁটে লোকটির বোঝাটা যেন সত্যই ভারী হইয়াছে। গুরুভারে পৃষ্ঠ তার বাঁকিয়া গিয়াছে। কপালের শিরা-উপশিরাগুলি ফুলিয়া উঠিয়া কুশ্রী চেহারাকে আরও কদর্য্য করিয়া তুলিয়াছে। লোকটির করুণ অনুরোধে দয়াপরবশ হইয়া সঙ্গিগণ তাহার বোঝার পরিবর্ত্তে তাহাদের যে কোন একটি লইতে বলিল। সে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত বোঁচ্‌কাগুলি পরীক্ষা করিয়া পছন্দমতটি পৃষ্ঠে তুলিয়া লইল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, উহার এই নব-নির্ব্বাচিত বোঝাটি পূর্ব্বেকারটি অপেক্ষা বহুগুণ ভারী। সঙ্গিগণ সাথীটির এই বোকামি দেখিয়া হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিল না।

গুরুভারে পৃষ্ঠ বাঁকিয়া গিয়াছে

ঝুড়িটি যাত্রীদের আহার্য্যে ভরা। কিছুদূর চলার পর যাত্রিগণ আহারের জন্য থামিল। বেঁটে লোকটির ঝুড়ি হইতে আহার্য্য পরিবেষণ করা হইল। আহার সমাপন করিয়া যখন তাহারা পুনরায় যাত্রা করিল তখন দেখা গেল, কদাকার লোকটির বোঝার গুরুত্ব অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছে। বেলাশেষে পুনরায় সকলকে আহার্য্য দেওয়ার পর মুক্তপৃষ্ঠ খর্ব্বকায় লোকটির শুধু ঝুড়ি ভিন্ন আর কোন ভারই রহিল না। সঙ্গিগণ এইবার বুঝিল এই কদাকার লোকটির বুদ্ধি তাহাদের সকলের বুদ্ধির চেয়ে অনেক বেশী।

এই কুব্জ কদাকার লোকটি আর কেহই নহে—ছোট গল্পের স্রষ্টা, গল্পের যাদুকর ঈশপ। ঈশপের শৃগাল ও আঙ্গুর ফলের গল্প কে না জানে? তাঁহার অসাধারণ গল্প বলিবার ক্ষমতা ও গল্প সমূহ তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। পৃথিবীর যে কোন দেশের সাহিত্যে তাঁহার প্রভাব

অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ঈশপ ৬০০ খৃঃ-পূঃ অব্দে আধুনিক তুরস্কের নিকট এক দাসবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। আজ তোমাদিগকে এই গল্প-যাদুকরের জীবনের কয়েকটি কাহিনী শোনাব।

এফেসাসের বাজার। বণিক তাহার দাসপণ্য সাজাইয়া বসিয়াছে। শীঘ্রই তাহার সমস্ত দাসই বিক্রয় হইয়া গেল—পড়িয়া রহিল শুধু আমাদের পূর্ব্বপরিচিত ঈশপ ও তাঁহার উভয় পার্শ্বের দুইজন সুদর্শন গ্রীক্; একজন সঙ্গীতজ্ঞ ও অপরজন বাগ্মী। ঈশপের বিনিময়ে একটি কাণাকড়িও যে মিলিবে এ বিষয়ে বণিকের যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। ঈশপের দৈহিক শক্তিরও একান্ত অভাব।

এই সময় প্রসিদ্ধ দার্শনিক জান্থাস্ সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি গ্রীক্দ্বয়ের সুন্দর চেহারায় আকৃষ্ট হইলেন। ক্রয় করিবার ইচ্ছায় তিনি উহাদিগকে কে কি কাজ করিতে পারে জিজ্ঞাসা করিলেন। বাগ্মী সুবিন্যস্ত বচনে উত্তর করিল, "যে কোনও কাজ।" সঙ্গীতবিদ অত্যন্ত মোলায়েম কণ্ঠে বলিল, "সমস্ত কাজই করিতে পারি।" ঈশপ তাঁহার নজরে পড়িল না; ঈশপের না আছে রূপ, না আছে গুণ। ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণের ইচ্ছায় ঈশপ সেই সময় উচ্চরবে হাসিয়া উঠিলেন। জান্থাস তখন দেখিলেন যে, সেখানে আরও একটি পণ্য আছে। এইবার জান্থাস ঈশপকে হাসিবার কারণ ও কি কাজ করিতে পারে জিজ্ঞাসা করিলেন। ঈশপ দৃঢ় অথচ অত্যন্ত সরস কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "আমার দক্ষিণ দিকের সুচতুর সঙ্গী যদি যে কোনও কাজ করিতে পারেন, এবং ততোধিক চতুর বামপার্শ্বের অন্য সঙ্গীটি যদি সমস্ত কাজই করিতে পারেন তবে আমার করিবার মত কাজ আর কিছুই অবশিষ্ট নাই; সুতরাং আমি কিছুই করিতে পারি না।" ঈশপের কথা বলিবার অপূর্ব্ব ভঙ্গী ও উপস্থিতবুদ্ধি জান্থাসকে মুগ্ধ করিল। তিনি ঈশপের হাসিবার কারণ বুঝিলেন। উহাকে পাইবার আশা তাঁহার প্রবল হইল। জান্থাস তখন ঈশপের মূল্য জানিতে চাহিলেন। তখন বণিক বলিল ক্রেতা যদি গ্রীক্দ্বয়ের একজনকে ক্রয় করেন তবে ঈশপকে তিনি 'ফাও' হিসাবেই পাইবেন।

জান্থাস একজন গ্রীক্ ও তৎসঙ্গে 'ফাউ'-স্বরূপ ঈশপকে লইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে জান্থাস গৃহে পৌছিয়া প্রমাদ গণিলেন। তাঁহার সুন্দরী পত্নী কদাকার একটি ক্রীতদাস দেখিয়া একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। স্বামীর সঙ্গে তাঁহার বাদানুবাদ চরমে উঠিল এবং অবশেষে পত্নী ক্রোধে কাঁদিয়া ফেলিলেন। এবার জান্থাসের সমস্ত রাগ ঈশপের উপর গিয়া পড়িল। তিনি তাঁহাকে গালি দিয়া কহিলেন—"মূর্খ, ক্ষণপূর্ব্বে তোমার কণ্ঠ হইতে যে সরল সুমধুর বাক্য ধ্বনিত হইতেছিল তাহা বন্ধ হইল কি করিয়া? নিজের প্রভুপত্নীর মনস্তুষ্টির জন্য কি তাহার একটিও আর অবশিষ্ট নাই?" ইহার উত্তরে ঈশপ আগাইয়া আসিয়া বলিলেন—"ভগবান, আমাদিগকে আগুন, জল ও মন্দ স্ত্রীলোকের হাত হইতে রক্ষা কর।"

এইরূপে ঈশপ জান্থাসের পরিবারে আশ্রয় পাইলেন। পরিবারের অন্য লোকও ঈশপের অসাধারণত্ব উপলব্ধি করিয়া তাঁহার সঙ্গে প্রভু ও ভৃত্যের সম্বন্ধ ভুলিয়া গিয়া বন্ধুত্বের মধুর বন্ধনে

আবদ্ধ হইল। এই ক্ষণজন্মা পুরুষের আচরণ ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এই পরিবারকে বহুবার বহুরকম বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধ আরও নিবিড় করিয়া তুলিল।

একবার কোন সামান্য কারণ উপলক্ষ্যে জান্থাস ও তাঁহার স্ত্রীর মধ্যে মতবিরোধ হয়। পত্নী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আপন ধন-সম্পত্তি সহ পতিগৃহ ত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া যান। জান্থাসও অভিমানে তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার নাম করেন নাই। এদিকে সুগৃহিণীর অভাবে গৃহে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা দেখা দিল এবং গৃহের শান্তি লোপ পাইল। জান্থাস ও ঈশপ উভয়েই গৃহলক্ষ্মীর অভাব অনুভব করিলেন। প্রভু ও ভৃত্য কি পরামর্শ করিলেন তাঁহারাই জানেন। পরদিন দেখা গেল বাড়ীতে উৎসব লাগিয়া গিয়াছে এবং লোকের মুখে মুখে এই কথাই ফিরিতেছে যে, জান্থাস সুন্দরী ক্রীতদাসী ডোরিকাকে বিবাহ করিতেছেন। সন্ধ্যায় বাড়ীঘর উজ্জ্বল আলোকে ঝলমল করিয়া উঠিল, নিমন্ত্রিত লোকে বাড়ী ভরিয়া গেল। জান্থাসপত্নী আর সহ্য করিতে পারিলেন না; স্বামিগৃহে ফিরিয়া আসিয়া আপনার কৃতকর্ম্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। গৃহে আসিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন উৎসবের সমারোহ ও বিবাহের আয়োজন শুধুমাত্র তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য এবং এই সমস্তের মূলে আছেন ঈশপ। গৃহলক্ষ্মীর আগমনে গৃহে আবার আনন্দের জোয়ার বহিয়া গেল। গৃহ সত্যই উৎসব-সমারোহে পূর্ণ হইল। এই ঘটনার পর ঈশপ প্রভুপত্নীর আরও স্নেহভাজন হইলেন।

প্রভু ও ভৃত্য পরামর্শ করিলেন

আর একবার জান্থাস কয়েকজন দুষ্ট লোকের কবলে পড়িয়া অত্যধিক মদ্যপান করেন। নেশার ঝোঁকে তিনি বলিয়া বসেন যে, সমুদ্রের সমস্ত জল তিনি নিঃশেষে পান করিতে পারেন। সঙ্গিগণ তাঁহার কথা অবিশ্বাস করিলে তিনি বলিলেন যে, একটি নির্দ্দিষ্ট দিনে সমুদ্রের সমস্ত জল যদি তিনি পান করিতে অপারগ হন তবে তাঁহার সমস্ত ধন-সম্পত্তি সঙ্গীদিগকে দিয়া দিবেন। তিনি কেবলমাত্র বাজী ধরিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, বাজীর সর্ত্তাদি একখানা কাগজে লিখিয়া তাহাতে নামসই করিলেন এবং জামিন-স্বরূপ আপনার অঙ্গুরীয় উহাদিগকে অর্পণ করিলেন। নেশা কাটিয়া গেলে তিনি আপনার ভুল বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু তখন আর সংশোধনের উপায়

নাই। নির্দ্দিষ্ট দিন আগাইয়া আসিল, উপায়ান্তর না দেখিয়া শেষ পর্য্যন্ত তিনি ঈশপের স্মরণ লইলেন। ঈশপ এইজন্য প্রভুকে যথেষ্ট ভৎর্সনা করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিপদ হইতে মুক্ত হইবার পথও দেখাইয়া দিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে দেখা গেল কাতারে কাতারে লোক সমুদ্রতীরে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে। জান্থাস একটি বড় পাত্রে সমুদ্রের জল লইয়া উপস্থিত জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আপনারা জানেন আমি কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি এবং সেই প্রতিজ্ঞা পালনে অসমর্থ হইলে আমাকে কি ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। আমার প্রতিজ্ঞা পালনার্থ আমি এই জল পান করিতেছি। কিন্তু মনে রাখিবেন সমুদ্রে যে সমস্ত নদী আসিয়া মিলিয়াছে সর্ত্তানুযায়ী আমি সেই সমস্ত জল পান করিতে বাধ্য নই। সুতরাং আমার প্রতিযোগিগণ নদীর সমস্ত মুখ বন্ধ করিয়া দিন যাহাতে নদীর জল সমুদ্রে আসিয়া পড়িতে না পারে।"

সমবেত জনতা তাঁহার কথার মর্ম্মার্থ বুঝিয়া তাঁহাকে জয়মাল্য দান করিল। এইরূপে ঈশপের ক্ষুরধার বুদ্ধির প্রভাবে তাঁহার প্রভুর ধনপ্রাণ রক্ষা পাইল।

এই ঘটনার পর ঈশপের খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িল। প্রথমে তাঁহার গল্পের শ্রোতা তাঁহার প্রভু-পরিবারের শিশু ও কিশোর-কিশোরীরাই ছিল; ক্রমে বয়ঃবৃদ্ধেরাও ভীড় জমাইতে আরম্ভ করিল এবং শেষে এমন সময় উপস্থিত হইল যে, তাঁহার গল্প শুনিবার জন্য দেশ-বিদেশের জ্ঞানী ও বিজ্ঞজন তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। এমনই মোহিনী-শক্তি ছিল এই গল্প-যাদুকরের!

ঐ সময় ক্রীতদাসেরা অর্থের বিনিময়ে নিজেদের স্বাধীনতা ক্রয় করিতে পারিত। ঈশপেরও দাসত্ব হইতে মুক্ত হইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিল এবং সুযোগও জুটিয়া গেল। প্রভু জান্থাস একটি দৈবঘটনার তাৎপর্য্য নিরূপণ করিতে অসমর্থ হওয়ায় ঈশপ স্বেচ্ছায় রাজদরবারে গমন করেন এবং কৌশলে আপনার দাসত্ব-শৃঙ্খল মোচন করেন। তাঁহার দৌত্যে দুইটি যুধ্যমান জাতির মধ্যে সৌহৃদ্য স্থাপিত হইল।

সেই সময়ে ভ্রমণের নেশা তাঁহাকে পাইয়া বসিল। যেখানে কোন প্রতিভাবান ব্যক্তির কথা শোনা যাইত ঈশপ তখনই তাহার নিকট ছুটিতেন। এই পরিব্রাজক-বৃত্তি তাঁহার শেষ পর্য্যন্ত ভাল লাগে নাই। শান্ত স্নেহপূর্ণ গৃহকোণ তাঁহাকে আকর্ষণ করিল—কিন্তু তাঁহার মত কুরূপকে কে বিবাহ করিবে? শেষ পর্য্যন্ত ব্যাবিলনের রাজার অনুমতি লইয়া তিনি একটি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিলেন এবং মায়ের স্নেহে লালন পালন করিতে লাগিলেন। আশা ছিল পুত্রকে নিজের মতই গড়িয়া তুলিবেন। তাঁহার আশা পূর্ণ হইল না, ছেলে বিগড়াইয়া গেল।

কোন এক জটিল ব্যাপারে জড়িত হইয়া বিনাদোষে সেই সময়ে তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। ঘাতক তাঁহাকে নির্দ্দোষ জানিয়া ছাড়িয়া দেয়। কিছুদিন পর ঐ ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে। রাজা যখন দেখিলেন যে, ঈশপ দোষী নন, তখন তাঁহার প্রতি অবিচারের জন্য রাজার

দুঃখের আর অবধি রহিল না। কিন্তু যখন জানিতে পারিলেন যে, ঈশপ বাঁচিয়া আছেন তখন তাঁহার আনন্দেরও অবধি রহিল না।

ওই সময় সত্যই তাঁহার জীবন-দীপ নিবিয়া আসিয়াছিল। ডেলফোর জ্ঞানী লোকের সম্বন্ধে তিনি অনেক কিছু শুনিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের দর্শনের আশায় সেখানে উপস্থিত হন; কিন্তু তাঁহাদের আচরণে তিনি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হন। মনের ক্রোধ একটি গল্পের আকারে প্রকাশ পাইল—তাঁহাদিগকে তিনি এক মুষ্টি ছাইয়ের সঙ্গে তুলনা করিলেন। তথাকথিত জ্ঞানিগণ

শিলাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল

ইহাতে যার-পর-নাই অপমানিত জ্ঞান করিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে একজন দেবতার মন্দিরের একটি স্বর্ণপাত্র ঈশপের বোঁচ্‌কার ভিতর রাখিয়া দিল। কোতোয়াল উহার সন্ধান পাইয়া রাজার নিকট পাত্র সহ ঈশপকে উপস্থিত করিল। ঈশপ নিজের নির্দ্দোষিতার বহু নিদর্শন দেখাইলেন। কিন্তু সব বৃথা গেল। বিচারে তাঁহাকে পর্ব্বতপৃষ্ঠ হইতে ফেলিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত হইল।

* * * *

যে কণ্ঠ শত শত মূক-বধিরকে বাণী দিয়াছে—আশার প্রেরণা দিয়াছে, কঠিন শিলাঘাতে তাহা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল! কিন্তু তাহা শেষ হয় নাই—জগতের প্রতি গৃহে তাহা আজিও ধ্বনিত হইতেছে।

শিশুসাথী ভগবান
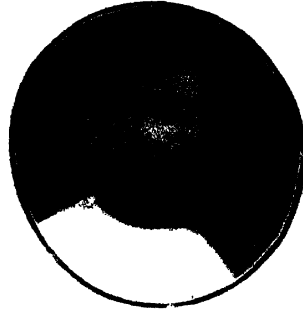
শ্রীবিষ্ণুপদ রায়, এম. এ., বি. এল., বি. টি., বিদ্যাভূষণ

যে শিশুরা আজ জগৎ জুড়িয়া করে হাসি-খেলা-গান,
তাহাদের সাথী হইতে ব্যাকুল আপনি যে ভগবান।
ভুবনের পতি ভালবাসে সদা শিশুর সরল হিয়া ;
ভগবানে জয় করে শিশুচয় অমল হৃদয় দিয়া।

গোয়ালার ঘরে জন্ম লইয়া তাই ত জগন্নাথ—
খেলিতেন নিতি নব নব খেলা রাখাল শিশুর সাথ ;
বাসিতেন ভালো চরাইতে ধেনু শিশুসহ বনে বনে,
বাঁচাতেন শত বিপদ হইতে সঙ্গী রাখালগণে।
সাথীরা খাইয়া আধখানা ফল, আধখানা দিলে মুখে,
সুধাধিক তাহা সুমধুর মানি খাইতেন তিনি সুখে।
খেলায় হারিয়া আপনার কাঁধে বহিয়া সঙ্গিগণে,
হরষ-সাগরে মগ্ন হইয়া হাসিতেন মনে মনে।

আবার যেদিন যিশুরূপে আসি দূর ইহুদির দেশে,
নগরে নগরে বেড়ালেন তিনি ধর্ম্মগুরুর বেশে ;

একদা যেদিন তাঁহারে ঘিরিয়া দাঁড়াল হাজার জন—
শুনিতে লাগিল মধুময় কথা কুতূহলভরা মন,
এল বহু শিশু দেখিবারে যিশু। তবু না দেখিতে পায়,
বড়রা রয়েছে ঘিরিয়া তাঁহারে, সবে ম্লান-মুখে চায়!
শিশুরা মাথায় ছোট যে বেজায় গোড়ালির 'পরে তাই
ভর করি উঁচু হইয়া দেখিছে, তবু দরশন নাই।
হেরি ঠেলাঠেলি, কলকণ্ঠের শুনিয়া সে গোলমাল,
বড়রা রুষিয়া তাদেরে দুষিয়া বলিছে, "এ শিশুপাল
কোথা হ'তে এল? দূর ক'রে দাও। এ কি খেলিবার ঠাঁই?
এদের জ্বালায় সাধু-জন-বাণী শোনার আশাও নাই!"
যত ছিল বুড়া করে তাড়াহুড়া, ছেলে ও মেয়ের দল
দরশ-নিরাশ হইয়া কাতর চাহে চোখ ছল-ছল।
দেখি কন যিশু, "নির্ম্মল শিশু, কেন আসিবে না কাছে?
ওদের লাগিয়া স্বর্গ-দুয়ার সদাই যে খোলা আছে।"
বলিয়া এ-বাণী লন সবে টানি দু'বাহু বাড়ায়ে দিয়ে,
শিশুসাথে কথা কন হেসে হেসে কোলের কাছেতে নিয়ে।

ওই কচি মুখ, ওই তাজা মন, হিয়া সরলতাময়—
আমরাই যে রে শুধু ভালবাসি তাহা নয়, তাহা নয়।
তোদের মধুর মূরতি হেরিয়া আপনারে ভুলে যান,
আজিও শিশুর সঙ্গে ফিরেন শিশুসাথী ভগবান।

ওলিম্পিক প্রতিযোগিতার কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনা

শ্রীপঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়, বি. এ., বি. টি

১৯২০ খৃঃ অব্দের ওলিম্পিক প্রতিযোগিতা এণ্ট্ওয়ার্প (Antwerp) সহরে আরম্ভ হয়েছে। দূরে শ্বেতবর্ণের ওলিম্পিক পতাকা 'পত্-পত্' ক'রে উড়ছে। তার বুকে আঁকা পাঁচটি রঙিন বৃত্ত পরস্পর গা ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে পাঁচটি মহাদেশের বন্ধুত্ব ঘোষণা করছে। একটা উঁচু থামের ওপর 'ওলিম্পিক হোমাগ্নি' নিজের শিখায় চারদিক আলোকিত ক'রে পৃথিবীতে 'দেবতার শান্তি' প্রচার করছে; যেন সকলকে ডেকে বলছে—"ঝগড়া থামাও, যুদ্ধ বন্ধ কর, ভাই-বোনেরা সব একত্র হয়েছে।" ক্রীড়া-প্রাঙ্গণে খেলোয়াড়েরা নিজেদের কৃতিত্ব দেখাচ্ছে—যেদিকে তাকান যায় দেখা যাচ্ছে কেবল দর্শকের সারি।

এমন সময় দেখা গেল যে, ৮০০ মিটার দৌড় আরম্ভ হয়েছে। প্রতিযোগিতা করছেন পৃথিবী-বিখ্যাত আটজন দৌড়দার। যিনি প্রথম হবেন, তিনি হবেন মধ্যমণি; তাঁর দু'ধারে দাঁড়াবে দ্বিতীয় ও তৃতীয়। তাঁর মাথার ওপরে উড়বে তাঁর জাতীয়-পতাকা, বাজান হবে তাঁর জাতীয়-সঙ্গীত। প্রত্যেকেই নিজের গলিপথ ধ'রে অসম্ভব দ্রুতগতিতে সাম্নে ছুটছেন, যেন 'শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও, উদ্দাম উধাও।' এমন সময় দেখা গেল যে, একটা গর্ত্তে পা প'ড়ে যাওয়ায় টাল সামলাতে না পেরে আফ্রিকার দৌড়দার রাড্ (Rudd) তাঁর পেছনের দৌড়দারকে একটু ধাক্কা দিলেন; এটার জন্যে তিনি দোষী নন্। যে সীমানা সর্ব্বাগ্রে পার হ'তে পারলেই জগৎ-জোড়া নাম, তার দিকে খেয়াল না ক'রেও রাড্ খেলোয়াড়োচিত ভদ্রতা ভুললেন না। তিনি মুখ ঘুরিয়ে বললেন—"স্যরি, ক্ষমা প্রার্থনা করছি।" তিনি এতক্ষণ ছিলেন প্রথম, কিন্তু মুখ ঘোরানোর ফলে যাত্রাপথ একটু বেঁকে যাওয়ায় মধ্যমণি হবার সৌভাগ্য হারালেন বটে, কিন্তু লাভ করলেন তার চেয়েও বেশি—খেলাধূলার ইতিহাসে তাঁর নাম সোনার অক্ষরে লেখা রইল।

১৯৩২ খৃঃ অব্দে আমেরিকার লস্-এঞ্জেলস সহর ওলিম্পিক খেলোয়াড় ও ক্রীড়া-দর্শনেচ্ছুদের অভ্যর্থনা করবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করেছিল। কর্ত্তৃপক্ষ ওই উপলক্ষ্যে এমন বন্দোবস্ত করেছিলেন যা' ওলিম্পিকের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় এনেছে। প্রধান ক্রীড়া-প্রাঙ্গণে এক লক্ষের ওপর লোক বসবার জায়গা করলেন্। একটা

অতি মনোরম প্রকাণ্ড জায়গা বেছে নিয়ে তার চারদিক ঘিরে ফেললেন। তার মধ্যে বাগান, মাঠ, খেলবার জায়গা, সাঁতার কাটবার পাকা পুকুর (bath) এসব ত রইলই, উপরন্তু চারজন ক'রে খেলোয়াড়ের জন্য এক-একটি ছোট কাঠের বাড়ী তৈরী করলেন—প্রত্যেক বাড়ীতে রইল ছুটো ঘর এবং প্রত্যেক ঘরে পাতা হ'ল ছুটি বিছানা। এ ছাড়া কথা কইবার সুবিধার জন্যে দোভাষী, আহারের সুবিধার জন্য ভিন্ন ভিন্ন পাকশালা ইত্যাদি কিছুই বাদ পড়ল না।

যা' হোক, খেলা আরম্ভ হ'ল। দূরে দেখতে পাওয়া গেল যে, আমেরিকান, জাপানী, ইংরাজ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়েরা pole vault করছেন। Cross bar ধীরে ধীরে উঁচুতে উঠতে লাগল—১৩ ফুটের মাথায় গিয়ে ওটা কিছুক্ষণের জন্যে থামল। জাপানী ক্রীড়ক নিশিদা তাঁর নিজের দেশে ১৩ ফুট পার হ'লেও ওখানে ছু'বার অকৃতকার্য্য হ'লেন। তিনবারের বার নিশিদা bar ডিঙ্গালেন। তখন সমবেত জনমণ্ডলী তাঁকে অভিনন্দন জানাল! এই সঙ্কট পার হবার পর নিশিদার মনের ধাঁধা ঘুচে গেল, তিনি পর পর ডিঙ্গাতে লাগলেন। একেবারে '১৪ ফুটের মাথায় এসে তিনি দেখলেন যে, তিনি ও আর একজন মাত্র বাকী আছেন—অপর সকলে বিদায় গ্রহণ করেছেন। সেখানেও তিনি ছু'বার দম নিলেন, কিন্তু তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী অনায়াসে পার হ'য়ে নূতন ওলিম্পিক মাপকাঠি স্থাপন করলেন। হতাশ হওয়া দূরের কথা, সেই অবস্থাতেও নিশিদা খেলোয়াড়ের সৌজন্য ভুললেন না। তিনি দৌড়ে এসে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে ওই কৃতকার্য্যতার জন্য অভিনন্দন জানালেন এবং পরক্ষণেই দৌড়ে গিয়ে ঐ উচ্চতা পার হ'লেন। শেষ অবধি তিনিই নূতন মাপকাঠি-স্থাপনের গৌরব লাভ করলেন।

১০০ মিটার (১ মিটার = প্রায় ৪০ ইঞ্চি) দৌড় প্রায় শেষ হ'য়ে এল। আমেরিকার ছু'জন বিখ্যাত ক্রীড়ক টোলান ও মেটকাফ প্রথম স্থান অধিকারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। টোলান কয়েক ইঞ্চি এগিয়ে আছেন। দৌড় আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে ফটো-ক্যামেরা প্রতি মিনিটে ১০০টি করিয়া ছবি তুলছে; বৈদ্যুতিক ঘড়ির কাঁটা 'থর্-থর্' ক'রে এগুচ্ছে—প্রথম ব্যক্তি সীমানা পার হ'লেই আপনি থেমে যাবে। সময়-রক্ষকেরা তাঁদের নিজেদের ঘড়ি চালিয়ে দিয়েছেন এবং বিচারকেরা শেষ সীমার ওপর চোখ রেখে দৌড় শেষ হবার প্রতীক্ষা করছেন। দৌড় প্রায় শেষ হয়-হয়, এমন সময় দেখা গেল যে, মেটকাফ হঠাৎ অমানুষিক বেগে টোলানের কয়েক ইঞ্চি সামনে এসে

ফিতায় বুক ঠেকালেন। সকলেই মনে করল যে, মেটকাফ প্রথম হয়েছেন, কিন্তু ফল বেরুলে দেখা গেল, টোলানই বাজি জিতেছেন। নূতন নিয়ম অনুসারে যে দৌড়দারের সম্পূর্ণ ধড় সর্ব্বাগ্রে কল্পিত শেষসীমা পার হবে সে-ই জিতবে এবং এই নিয়মানুযায়ী টোলানই প্রথম হয়েছেন। ফটোতেও দেখা গেল যে, যদিও দৌড় সর্ব্বাগ্রে শেষ করার জন্য মেটকাফই নূতন সময় স্থাপন করার গৌরব লাভ করেছেন, তথাপি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণকায় টোলানের ধড় বৃহৎকায় মেটকাফের ধড়ের আগে কল্পিত শেষসীমা পার হয়েছে। এই বিচার-ব্যবস্থার প্রতিবাদ করবার কথা কারও মনে এল না, পরন্তু উভয়েই সন্তুষ্টচিত্তে নিজ নিজ জায়গায় ফিরে গেলেন।

প্রাণের ঠাকুর

শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়

ভারি গরীব লোক কুম্ভন। সামান্য একটু জমি চাষ ক'রে যা কিছু পান তাই দিয়েই সংসার চালান অতি কষ্টে। গরীব হ'লেও খুব সাচ্চা লোক ব'লে তাঁকে ভালবাসে না এমন লোক সারা বৃন্দাবনে বড় কেউ নেই।

মহাসাধু বিঠল তাঁর গুরু। গুরুদেব বৃন্দাবনে এসেছেন। তাঁর পদধূলি নিয়ে শিষ্যেরা বললেন—"গুরুদেব, কুম্ভনের সংসার ত আর চলে না; আপনি দয়া করলেই ওর অভাব কিছু ঘোচে।"

গুরু বললেন—"টাকা-কড়ি আয় করবার কোন ব্যবস্থা ত দেবার বিদ্যে আমার নেই। কি করতে পারি বল ত?"

—"আজ্ঞে, গুজরাট দেশে আপনার বহু ধনী শিষ্য আছেন। কুম্ভনকে সঙ্গে নিয়ে গেলে তাঁরা ত তাঁকে সাহায্য করতে পারেন।"

—"হ্যাঁ, সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি ওকে, খুব সম্ভব ওর অভাবও ঘুচবে এতে।"

দিন স্থির হ'ল। বিঠল যাবেন দ্বারকায়। একদিনের পথ দূরে একটি আশ্রমে গিয়ে থাকবেন তিনি। কুম্ভন্ বাড়ী থেকে দুই-এক দিন পরে বেরিয়ে সেই আশ্রমে গিয়ে

নির্দ্দিষ্ট দিনে গুরুর সঙ্গে দেখা করবেন। তারপর তু'জনে একত্রে দ্বারকার দিকে যাত্রা করবেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে গুরু চেয়ে আছেন পথের দিকে। কুম্ভনের দেখা নেই। ক্রমে সন্ধ্যাও পেরিয়ে গেল; রাত্রিও শেষ হ'ল। তার পরদিনও শেষ হ'তে চলল। কোথায় কুম্ভন্? কি হ'ল তাঁর?

রাত্রির নির্জ্জনতা ও নিস্তব্ধতায় গুরু বসেছেন ধ্যানে। পূব আকাশের সোনালি তীর পৃথিবীর বুক ছুঁয়েছে। বিঠলের মনে হঠাৎ এই কথাটি জাগল যে, কুম্ভন্ অর্থের লোভে তাঁর সঙ্গে যাবেন না। সত্যিই কুম্ভন্ তখন ভাবছিলেন,—'ছি ছি! ধর্ম্মের নাম ক'রে ঘরে নিয়ে আসব টাকা! ঘরে আমার ঠাকুর আছেন, তাঁর সেবা না ক'রে ধনীদের কাছে যাব কিছু পাওয়ার আশায়? তা হয় না।'

গুরু আশ্রম ছেড়ে যাত্রা করলেন দ্বারকার পথে।

এদিকে রাজা মানসিংহ এসেছেন বৃন্দাবনধামে। সঙ্গে লোক-লস্কর, হাতী-ঘোড়া, জিনিস-পত্র যে কত তার সীমা-সংখ্যা নেই। খুব সোরগোল প'ড়ে গেছে। দলে দলে লোক যাচ্ছে রাজা মানসিংহকে দেখতে। নগরের বহু লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য ব্যাকুল। যে-সে লোক ত নন, ভারতের বাদশাহ আকবরের সেনাপতি। দর্শন দিয়ে এবং গণ্যমান্য লোকদের সঙ্গে কথা ক'য়ে তিনি তুই-এক দিনের মধ্যেই সকলের কাছে সুনাম অর্জ্জন করেছেন। কোন কোন সাধুলোকের কাছে তিনি এই ভক্ত কুম্ভনের কথা শুনেছেন। তাঁর ভারি ইচ্ছা হ'ল যে, কুম্ভন্ তাঁর সঙ্গে দেখা করেন।

দিন যায়। কুম্ভন্ আর তাঁর কাছে গেলেন না। রাজা মানসিংহই একদিন লোকজন সঙ্গে নিয়ে কুম্ভনের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন।

ছোট্ট চালা-ঘর। সামনে খানিকটা সবুজ ঘাসে ঢাকা জমি। মানসিংহ ঘাসের ওপরেই বসলেন। লোকজন রইল সব দাঁড়িয়ে। বাড়ীতে লোকজন আছে ব'লে মনে হ'ল না।

খানিকক্ষণ যায়। হঠাৎ মানসিংহ শুনতে পেলেন, ঘরের ভেতর থেকে কে যেন ডেকে বলছে—"মা, আর্সীটা নিয়ে আয় ত।"

ঘরের পেছন থেকে একটি মেয়ে উত্তর দিল—"আর্সী ত নেই, বাছুরে খেয়ে গেছে।"

শুনে ত মানসিংহ থ' হ'য়ে গেলেন। বাছুরে আর্‌সী খায়। কেমন সে আর্‌সী, আর কেমনই সেই বাছুর!

একটু পরে মেয়েটি ঘরের দরজা খুলে বেরুতেই রাজা মানসিংহ তাঁকে ডেকে কাছে এনে জিজ্ঞেস করলেন—"হ্যাঁ মা, তুমিই না বললে, আর্‌সী বাছুরে খেয়ে গেছে?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"আর্‌সী বাছুরে খায় কেমন ক'রে?"

—"আজ্ঞে, আমরা আর্‌সী পাব কোথায়? আমরা ভারি গরীব। একটা মাটির হাঁড়িতে জল থাকে, তাইতেই আমরা মুখ দেখি। বাবাও সেই জলের দিকে চেয়েই তিলক কাটেন। আজকে জল এনে রেখেছিলাম, বাছুরে সেই জলটুকু খেয়ে গেছে।"

বড্ডই দুঃখ বোধ করলেন মানসিংহ। আহা! এরা এত গরীব যে জলে মুখ দেখে, একটা আর্‌সী কেনবার দুটো পয়সাও জোটে না।

একজন লোককে ইসারায় কাছে ডেকে এনে তিনি বললেন—"আমার সোনার ফ্রেমে বাঁধা আর্‌সীখানা নিয়ে এস ত।"

আর্‌সীখানা মেয়েটির হাতে দিয়ে তিনি বললেন—"মা, এই আর্‌সী নাও, বাছুরে আর তোমাদের আর্‌সী খেতে পারবে না।"

মেয়েটি আর্‌সী নিয়ে দিল কুম্ভনের হাতে। কুম্ভন্ আর্‌সী হাতে ক'রেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মানসিংহকে নমস্কার ক'রে বললেন—"মহারাজ, আমার ঘরে সোনার ফ্রেমে বাঁধানো আর্‌সী! এ আমি নিতে পারব না।"

মানসিংহ ভাবলেন, এরকম ভাঙা চালা-ঘরে এত দামী জিনিস মানায় না ব'লেই কুম্ভন্ নিতে চাইছেন না। যাতে ওঁর বাড়ী-ঘর বেশ ভাল হয় আর সংসারে যাতে অভাব না থাকে, তার জন্য প্রচুর সোনা ওঁকে দেওয়া যাক; বললেন—"আপনাকে আমি প্রচুর সোনা দিচ্ছি, আপনার সমস্ত অভাবই দূর হবে।"

কুম্ভনের দুই চোখ দিয়ে এবার ঝর্‌ঝর্ ক'রে জল পড়তে লাগল; বললেন—"মহারাজ, আপনি কি বলতে চান, সোনা নিয়ে আমার ঠাকুরকে দূর ক'রে দেব? আমার অন্তরে যে শুধু তাঁরই স্থান আছে, সে স্থানটুকু যদি সোনা দিয়ে পূর্ণ ক'রে রাখি, তবে আমার ঠাকুরের স্থান হবে কোথায়? আমার মনে ত আর কারও স্থান নেই।"

রাজা মানসিংহ বুঝলেন যে, জগতের সব চেয়ে দুষ্প্রাপ্য ঐশ্বর্য্যের অধিকারী

হয়েছেন যিনি, তাঁর কাছে মণি, মুক্তা, সোনা—সবই তুচ্ছ। ভগবানকে সত্যিই ভালবাসতে পারলে কি আর মানুষকে সোনা লোভ দেখাতে পারে? অতি নম্রভাবে রাজা মানসিংহ তাঁকে বললেন—"বলুন আমি কি ক'রে আপনার সেবা করতে পারি?"

কুম্ভন্ অমনি উত্তর দিলেন—"মহারাজ, আপনার মত ধনী লোক আমার মত দরিদ্রের ঘরে না এলেই সব চেয়ে ভাল সেবা করতে পারেন।"

মানসিংহ ভাবলেন—সত্যিই ত। ধনীরাই গরীবের অন্তরে লোভ জন্মায়, হিংসার সৃষ্টি করে। মানুষ মহৎ হয়, সত্যিকার বড় হয় এই লোভ জয় ক'রে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ থেকে। কুম্ভন্ও তাই এত মহৎ।

কুম্ভনের কাছে নতশির হ'য়ে রাজা মানসিংহ নিঃশব্দে চ'লে গেলেন।

ছেলেমেয়েদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকা
শিশু সাথী
বাংলার নামজাদা সাহিত্যিক ও শিল্পীদের
সমবেত চেষ্টায় দিন দিনই
শিশুদের প্রিয় সাথী হইতেছে!
সগৌরবে উনবিংশ বর্ষ চলিতেছে
বৈশাখ মাস হইতে শিশুসাথীর বৎসর আরম্ভ;
যে কোন সময়ে গ্রাহক হইলে প্রথম সংখ্যা
হইতে পত্রিকা লইতে হয়।
—শিশুসাথী—
ডিরেক্টর বাহাদুর কর্ত্তৃক বঙ্গের বিদ্যালয় সমূহের
লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত।
প্রতি সংখ্যা ৵১০ :: বার্ষিক মূল্য ১৸০
আশুতোষ লাইব্রেরী
৫নং কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা
৩৷৮নং জন্‌সন্ রোড
ঢাকা

ছোটদের উপহারের ভাল ভাল বই

*　　*　　*

কচি শিশুদের জন্য লেখা রসাল ছড়ার বই। পুরু কাগজে বড় বড় অক্ষরে রঙিন কালিতে ছাপা। পাতায় পাতায় সুচিত্রিত ছবি—দেখিলেই কচি মুখে হাসির ফোয়ারা ছুটিবে; গৃহ আনন্দময় হইবে। উপহার দেওয়া হইবে সার্থক। চোখ-জুড়ান মলাটে বাঁধাই।

মূল্য ।৵০ আনা

*　　*　　*

শ্রীপঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

খেলার সাথী

বিনা খরচে বা নামমাত্র খরচে ছেলেমেয়েরা কত রকম খেলা শিক্ষা করিতে পারে তাহাই দেখান হইয়াছে এই বইখানিতে। প্রায় দেড়শ' রকম খেলার কথা—সরল ভাষায় লেখা। পুরু কাগজে ছাপা—রঙিন মলাটে বাঁধাই, সচিত্র নূতন সংস্করণ।

মূল্য ১।০ আনা

মনোরম গল্প—লেখকের নিপুণ লেখনী স্পর্শে প্রত্যেকটিই সরস ও সতেজ। ছাপা বেশ্ ঝর্‌ঝরে—সুন্দর সুন্দর ছবিতে ভরপূর। মূল্য ||০ আনা
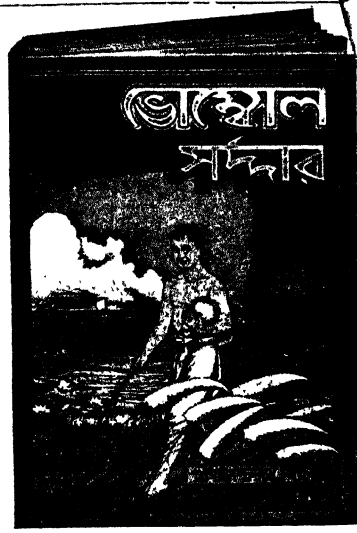
ডানপিটে ভোম্বোলের চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার পল্লীচিত্র গ্রন্থকারের লেখনীতে ও শিল্পীর তুলিতে নিখুঁত ভাবে চিত্রিত। মূল্য ||৴০ আনা

শ্রীভীমাপদ ঘোষ

প্রনীত

এশিয়ার ছেলেমেয়ে

এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা, লেখাপড়া, চাল-চলন প্রভৃতির কথা—বর্ণনকৌশলে গল্পের মতই সরস। পুরু কাগজে নিখুঁত ছাপা, সুন্দর সুন্দর ছবি।

মূল্য ||০ আনা

'দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা' নামক সংস্কৃত গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত গল্পের বই। ভাষা প্রাঞ্জল—সরস ও সতেজ। পুরু রঙিন কাগজে রঙিন কালিতে ছাপা—বড় সাইজের বই!

মূল্য ১।০ আনা

সারা বইখানিতে ছোট-বড় মোট ৮০ খানা সুচিত্রিত একবর্ণ ছবি এবং ৮ খানা পাতাজোড়া রঙিন ছবি আছে। মনোরম প্রচ্ছদে শোভিত মজবুত বাঁধাই !!

বিজ্ঞানের কৃপায় নিত্য-প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দ্রব্য কেমন সুন্দরভাবে তৈরী হয় তাহাই গল্পের মত সরস ভাষায় লেখা। বহু সুন্দর সুন্দর চিত্রে ভরা।

মূল্য দশ আনা

গ্রন্থকারের ভাষা-মাধুর্য্যে প্রত্যেকটি রূপকথা পাঠক-পাঠিকার মনে বিমল আনন্দের সৃষ্টি করিবে। দক্ষ শিল্পীর আঁকা বহু চিত্রে বহিখানি আলো-করা।

মূল্য আট আনা

শ্রীমনোরম গুহঠাকুরতা
প্রণীত

বিজ্ঞানের গল্প

বিজ্ঞানের জন্ম-রহস্য হইতে আরম্ভ করিয়া এই যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইনের 'আপেক্ষিক তত্ত্ব' পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের অনেক কথা নিছক গল্পের ছাঁচে লেখা। পুরু কাগজে ছাপা; সুন্দর সুন্দর হাফটোন ছবিতে শোভিত।

মূল্য বার আনা

কয়েকটি হাসির গল্প ও কবিতায় পূর্ণ। সুন্দর সুন্দর ছবিতে শোভিত—পুরু কাগজে ঝক্‌ঝকে ছাপা। ছোটদের আদরের জিনিস। মূল্য ||০ আনা
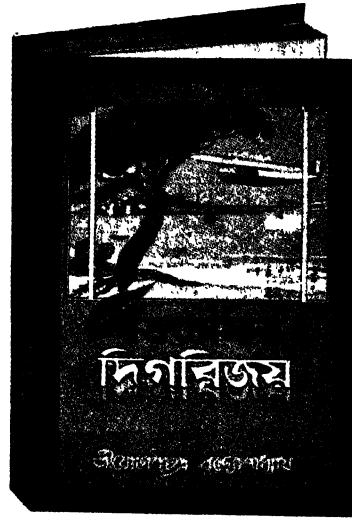
সামান্য ছারপোকার ভ্রমণ-কাহিনী! এই অভিনব ভ্রমণ-বৃত্তান্তে পৃথিবীর নানা দেশের বৈচিত্র্য-পূর্ণ কাহিনী—অসংখ্য সুন্দর ছবিতে পূর্ণ। মূল্য ১৲ টাকা
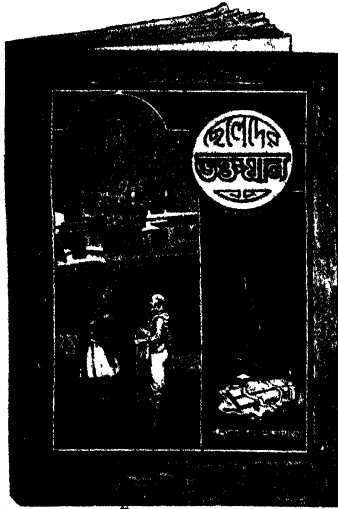
শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়
প্রণীত

ছেলেদের ভক্তমাল

'ভক্তমাল' নামক গ্রন্থ হইতে কয়েকটি গল্প ছোটদের জন্য ভক্তিরস-সিক্ত মধুর ভাষায় লেখা; পড়িয়া ছোটরা খুশী হইবে, তা' ছাড়া তাহাদের মনে ধর্ম্মভাবেরও বিকাশ হইবে। সুন্দর ছবিও আছে অনেক।

মূল্য আট আনা
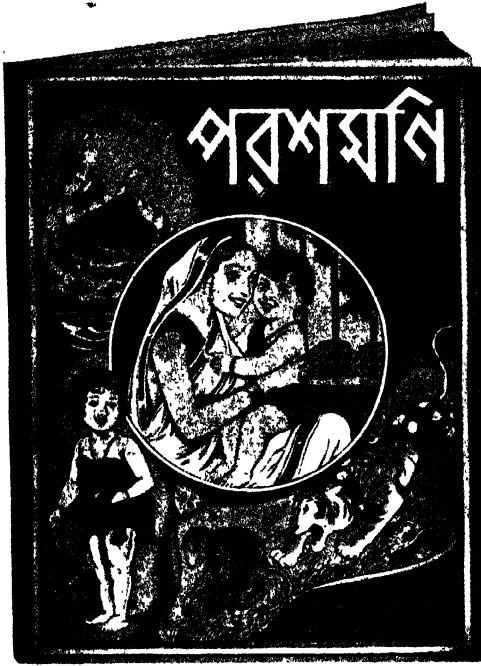
বরদাকান্ত মজুমদার
প্রণীত

বালক শ্রীকৃষ্ণ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ ও বৃন্দাবন-লীলা ভক্তি-রস-সিক্ত মধুর ভাষায় বর্ণিত; ছোটদের প্রাণে ভক্তি-বিস্ময়ের সঞ্চার করিবে। বড় বড় অক্ষরে পুরু কাগজে ছাপা সচিত্র নূতন সংস্করণ বাহির হইল। বহু পূর্ণপৃষ্ঠা ছবিতে ভরা—মলাটের সৌন্দর্য্যে চোখ জুড়ায়।

মূল্য বার আনা

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য প্রণীত

বাংলার মনীষী

শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ-প্রমুখ বাংলার বারজন মনীষীর জীবন-কথা ছোটদের জন্য গ্রন্থকারের নিজস্ব সরল ভাষায় লেখা। প্রত্যেকটি জীবনীর সহিত সুন্দর ও সুমুদ্রিত ফটো দেওয়া হইয়াছে। পুরু কাগজে ছাপা—রঙিন প্রচ্ছদ-মণ্ডিত।

মূল্য বার আনা

শ্রীমনোরম গুহ-ঠাকুরতা প্রণীত

স্বামী বিবেকানন্দ

যাঁহার অনন্যসাধারণ গুণগরিমায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে জগৎ-সভায় হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্য বিঘোষিত হইয়াছে, সেই পুরুষ-সিংহের বিচিত্র জীবন-কথা ছোটদের জন্য সরল ভাষায় লেখা। পরিবর্দ্ধিত নূতন সংস্করণ—দুই শতাধিক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

মূল্য চৌদ্দ আনা

বাগদী ডাকাত

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য প্রণীত

বাষ্পীয় যান, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, সবাক চিত্র, উড়ো জাহাজ, রেডিও, বেলুন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা গল্পের ছাঁচে লেখা। ছবি ও মলাটের সৌন্দর্য্য অতুলনীয়

মূল্য ।৵০ আনা

বন্দে আলী মিয়া প্রণীত

চোর জামাই

আগাগোড়া হাসির কবিতায় ও সুন্দর সুন্দর ছবিতে বইখানি ভরপূর। বড় বড় অক্ষরে পুরু কাগজে রঙিন কালিতে ছাপা। রঙিন মলাটে বাঁধাই। মূল্য ।৵০ আনা

ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত

মেনির কুটুম

ঘরের মেনির সঙ্গে বন্য জানোয়ারদের কি সম্বন্ধ আছে তাহাই সরস কবিতায় লেখা। বিভিন্ন জানোয়ারের অসংখ্য সুন্দর ছবিতে ভরপূর। মূল্য ।৵০ আনা

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত প্রণীত

রা জ কু মা র

সচিত্র শিশু-উপন্যাস। মায়ের স্নেহনীড় হইতে বিচ্ছিন্ন মানব-শিশু রাজ-ঐশ্বর্য্যের মধ্যে পরম যত্নে প্রতিপালিত হইলেও সুখী হইতে পারে না—তাহাই অতি নিপুণভাবে চিত্রিত হইয়াছে। ভাষা শিশুদের উপযোগী সরস।

পুরু কাগজে নিখুঁত ছাপা—রঙিন মলাটে বাঁধাই।

মূল্য ।৵০ আনা

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য প্রণীত

গহন বনের বিশাল বুকে পশু ও পাখীর আস্তানা। তাদের কাহারও সমাজে বাদুড়ের ঠাঁই নাই—এই বিষয় অবলম্বনে ছোটদের জন্য লিখিত রসাল গল্প। মাঝে মাঝে ছড়াও আছে। বড় বড় অক্ষরে ছাপা ; ছবি ও মলাটের সৌন্দর্য্যে চোখ জুড়ায়। মূল্য ।৵০ আনা

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য প্রণীত

রত্নপুরী

পাঁচটি গল্প ও একটি নাটিকায় বইখানি সম্পূর্ণ। ভাষার লালিত্যে ও সরলতায় ইহা ছোটদের হৃদয়গ্রাহী। বহু সুন্দর সুন্দর ছবি—পুরু এন্টিক কাগজে ছাপা।

মূল্য ৷৷০ আনা

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

মণি-কুণ্ডল

আগাগোড়া সরস পৌরাণিক গল্পে ভরপুর—ভাষার নৈপুণ্যে সকলেরই সমান আদরের। পুরু এন্টিক কাগজে নিখুঁত ছাপা। ছবি ও মলাটের সৌন্দর্য্যে চোখ জুড়ায়।

মূল্য ৷৷০ আনা

শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

রাজতরঙ্গিণীর গল্প

মহাকবি কহ্লণ-বিরচিত 'রাজতরঙ্গিণী' গ্রন্থে বর্ণিত কোন কোন রাজার জীবনের বিশিষ্ট ঘটনা অবলম্বনে ছোটদের উপযোগী ভাষায় বইখানি লিখিত। পুরু কাগজে নিখুঁত ছাপা। ছবিও আছে অনেক। মূল্য ৷৷০ আনা

শ্রীবৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

মজার দেশ

অষ্ট্রেলিয়ার জন্তু-জানোয়ার, পশু-পক্ষী প্রভৃতির রহস্যময় কাহিনী গল্পের মত সরস ভাষায় লেখা—সচিত্র।

—আট আনা—

শ্রীললিতমোহন নন্দী প্রণীত

রামধনু

রুশিয়ার ঋষি টলষ্টয়ের গল্পের নীতি অবলম্বনে লিখিত। বাঙ্গালী জীবনের সাতটি সরস ও সচিত্র গল্প।

—বার আনা—

শ্রীমনোরম গুহ-ঠাকুরতা প্রণীত

জাপানী রূপকথা

জাপান দেশীয় আটটি সুন্দর রূপকথা—নিপুণ কথাশিল্পী বাঙালী শিশুদের জন্য সম্পূর্ণ এদেশী ছাঁচে মাধুর্য্যপূর্ণ ভাষায় লিখিয়াছেন। অসংখ্য ছবিতে ও অনিন্দ্য সুন্দর রঙিন প্রচ্ছদে বইখানি সকল শ্রেণীর পাঠকের বিশেষ আদরণীয়।

—বার আনা—

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত

হীরা-জহরত

হাসির গল্প ও মনোরম কবিতায় রচিত উপহারের উৎকৃষ্ট বই। অসংখ্য ছবি ও প্রচ্ছদপটের সৌন্দর্য্যে হৃদয়গ্রাহী।

—বার আনা—

হেমেন্দ্রলাল রায় প্রণীত

গল্পের ঝরণা

সরস ভাষায় লেখা গল্পগুলি ছেলেদের মন সজীব ও সতেজ করিবে। যেমন সুন্দর ছবি, তেমনি মনোরম প্রচ্ছদ।

—এক টাকা—

শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

রূপ-সনাতন

স্বনামখ্যাত বৈষ্ণব ভক্তদ্বয়ের ঘটনাবহুল জীবনের কাহিনী—মধুর ভাষায় লেখা। পুরু কাগজে ছাপা—সচিত্র।

—আট আনা—

বরদাকান্ত মজুমদার প্রণীত

যিশুখৃষ্ট

ক্ষমার অবতার—[illegible] যিশুখৃষ্টের সচিত্র জীবন-কথা; ছেলে-মেয়েদের উপযোগী সরল ভাষায় লেখা।

—আট আনা—

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
প্রণীত

আফ্রিকার জঙ্গলে

আফ্রিকার জঙ্গলের বিভিন্ন জন্তু-জানোয়ার, বিশেষ করিয়া গরিলা শিকারের রোমাঞ্চকর কাহিনী; পড়িতে আরম্ভ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইবে—শেষ না করিয়া নাওয়া-খাওয়া কিছুই ভাল লাগিবে না। ছবি ও মলাটের বাহার অতুলনীয়।

—আট আনা—

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু প্রণীত

তালপাতার সেপাই

মধুর ভাষায় লেখা পাঁচটি সচিত্র হাসির গল্প। গল্প কয়টিতে হাসি ও শিক্ষার অপূর্ব্ব সমাবেশ হইয়াছে।

—দশ আনা—

শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

টলষ্টয়ের গল্প

টলষ্টয়ের কয়েকটি উপদেশপূর্ণ গল্প বাঙ্গালী শিশুদের জন্য মধুর ভাষায় লেখা; বড় বড় অক্ষরে পুরু কাগজে ছাপা।

—পাঁচ সিকা—

প্রত্যেকখানি ৶০ তিন আনা

চাণক্য	—	নীলকমল সেন
শিবাজী	—	নবগোপাল দাস
পদ্মিনী	—	বিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়
কবীর	—	ধীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
তিলক	—	নীলকমল সেন
অশ্বিনীকুমার দত্ত	—	জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষাল
প্রতাপাদিত্য	—	পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
ইশা খাঁ	—	ঐ
* গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	—	হরিশ্চন্দ্র সেন
* আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	—	বিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়
ভক্তকবি তুলসীদাস	—	মনোরম গুহ-ঠাকুরতা
তৈলঙ্গ স্বামী	—	সুরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত
* অক্ষয়কুমার দত্ত	—	অক্ষয়কুমার রায়
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস	—	মনোরম গুহ-ঠাকুরতা
চিত্তরঞ্জন	—	হরিশ্চন্দ্র সেন
* বিদ্যাসাগর	—	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
গ্যারিবল্ডী	—	ঐ
গোখেল	—	হরিশ্চন্দ্র সেন
* সার সৈয়দ আহম্মদ	—	নবগোপাল দাস
শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়	—	বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়

।০ চারি আনা মূল্যের

* মা ও খুকু	—	হেমেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য

প্রত্যেকখানি ।৴০ পাঁচ আনা

* খুকুর ছড়া	—	হেমেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য
* ভক্তির ডোর	—	সত্যচরণ চক্রবর্ত্তী

প্রত্যেকখানি ।৴০ ছয় আনা

পরশমণি	—	বরদাকুমার পাল
জয়ডঙ্কা	—	কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত
ঝুনুঝুনু	—	ঐ
রণজিৎ	—	অবিনাশচন্দ্র রায়
রূপকথার আসর	—	প্রভাতকুমার শর্ম্মা
বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা	—	বন্দে আলী মিয়া
ঝুমঝুমি	—	নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত
* হর্‌রা	—	সুনির্ম্মল বসু
* বাজিকর	—	ললিতমোহন নন্দী
* দুনিয়ার আজব	—	মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী
* ঠাকুর্দ্দা	—	বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত
* পাতাবাহার	—	সুনির্ম্মল বসু
* আল্‌পনা	—	ঐ
* নাগরদোলা	—	হেমেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য
* টুলটুল	—	কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত
* আগডুম-বাগডুম	—	ঐ
* বাদুড় বয়কট	—	বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য
* পূজার ছুটি	—	ঐ
* অলখ্‌ চোরা	—	ঐ
* রাজকুমার	—	নীহাররঞ্জন গুপ্ত
* বেদানা	—	হরিপ্রসন্ন দাশগুপ্ত
* রঙ্গিলা	—	ঐ
* খুকুরাণীর খেলা	—	বরদাকান্ত মজুমদার
* চোর জামাই	—	বন্দে আলী মিয়া
মেনির কুটুম	—	সুরেন্দ্রনাথ সেন
* কৃষ্ণ-সখা	—	মৃত্যুঞ্জয় বরাট সেনগুপ্ত

প্রত্যেকখানি ।৵০ ছয় আনা

* ধ্রুব	—	পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
চন্দ্রহাস	—	ঐ
* ছেলেদের পূজার কথা	—	রাজকুমার চক্রবর্ত্তী
শৈব্যা	—	নরেন্দ্রনাথ মজুমদার
গান্ধারী	—	অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
* বনলতা	—	বসন্তকুমার দাস
বাসবদত্তা	—	ঐ
* পারিজাত	—	নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত
তারাবাই	—	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
মধ্যম ও কনিষ্ঠ	—	অবিনাশচন্দ্র দাস

প্রত্যেকখানি ॥০ আট আনা

আমার বন্ধু ভাস্কর	—	ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী
গোপাল ভাঁড়ের গল্প	—	কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত
গল্পের আসর	—	বন্দে আলী মিয়া
* রত্নপুরী	—	বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য
* মণি-কুণ্ডল	—	হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
* হসন্ত মহারাজ	—	প্রফুল্লচন্দ্র বসু
* ছোট্‌ঠাকুর্দ্দার কাশীযাত্রা	—	আশাপূর্ণা দেবী
* স্তর রাজেন্দ্রনাথ	—	রাজকুমার চক্রবর্ত্তী
* সোনার চাঁদ	—	সত্যচরণ চক্রবর্ত্তী
ফুলঝুরি	—	কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত
ফুলঝুরি (হিন্দী সংস্করণ)	—	ঐ
* সোনার কাঠি রূপার কাঠি	—	ঐ
* পাঁচমিশালী গল্প	—	ঐ
* সাতরাজ্যের গল্প	—	ঐ

প্রত্যেকখানি ।৹ আট আনা

* ছুটির গল্প	—	বরদাকুমার পাল
* এবেলা-ওবেলার গল্প	—	কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত
ময়ূরপঙ্খী	—	ঐ
* তে-রাত্তিরের তাইরে-নাইরে-না	—	ঐ
ভগবানের লীলাখেলা	—	বরদাকান্ত মজুমদার
প্রহ্লাদ	—	ঐ
* যিশুখৃষ্ট	—	ঐ
সতী	—	ঐ
চিন্তা	—	ঐ
সাবিত্রী	—	ঐ
বালকদের খেলা	—	সুবোধচন্দ্র সেন
* আরব্যোপন্যাসের গল্প	—	সুরেন্দ্রনাথ রায়
রংবেরং	—	মনোরম গুহ-ঠাকুরতা
* সুন্দরবন	—	রবীন্দ্রনাথ সেন
কর্ণেল চট্পটি	—	ঐ
* আলাদিন	—	বিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়
* আলিবাবা	—	ঐ
* রবিন্‌সন্ ক্রুশো	—	দেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা
* রবিন্‌সন্ ক্রুশো	—	যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
* ছেলেদের ভক্তমাল	—	দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়
* রাজতরঙ্গিণীর গল্প	—	ঐ
রূপ-সনাতন	—	ঐ
* আফ্রিকার জঙ্গলে	—	খগেন্দ্রনাথ মিত্র
* পাঁচ শিকারী	—	ঐ
* হাঁদারাম	—	যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
* রতনচূড়	—	রমেশচন্দ্র দাস

প্রত্যেকখানি ॥৵০ দশ আনা

* কাফ্রি-মুল্লুকে	—	বরদাকুমার পাল
* জান কি ?	—	গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার
* মাণিক-মালা	—	মৃত্যুঞ্জয় বরাট সেনগুপ্ত
* তালপাতার সেপাই	—	প্রফুল্লচন্দ্র বসু
* হোঁদল কুৎকুৎ	—	ঐ
* দ্রৌপদী	—	রাজকুমার চক্রবর্ত্তী
* হনুমান	—	ঐ
কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণ	—	ঐ
পরশুরামকুণ্ড ও বদরিকাশ্রম পরিভ্রমণ		পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য

প্রত্যেকখানি ৸০ বার আনা

বাংলার মনীষী	—	বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য
* মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র	—	রাজকুমার চক্রবর্ত্তী
* সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ	—	যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
* কালো ভ্রমর (১ম)	—	নীহাররঞ্জন গুপ্ত
* সাইবিরিয়ার পথে	—	খগেন্দ্রনাথ মিত্র
* মাণিক-জোড়	—	প্রফুল্লচন্দ্র বসু
* দুঃসাহসী	—	সত্যচরণ চক্রবর্ত্তী
* দস্যুর কবলে	—	গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য
* বিজ্ঞানের গল্প	—	মনোরম গুহ-ঠাকুরতা
বাঙ্গালীর গল্প	—	পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
হীরা-জহরত	—	জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়
* শয়তানের সুমতি	—	ঐ
* চারু ও হারু	—	দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার
* রামধনু	—	ললিতমোহন নন্দী
* পূজার পড়া	—	রাজকুমার চক্রবর্ত্তী

প্রত্যেকখানি ৸৹ বার আনা

* জাপানী রূপকথা	—	মনোরম গুহ-ঠাকুরতা
পাঁচ সাগরের ঢেউ	—	হেমেন্দ্রলাল রায়
* ছেলে-চুরি	—	রবীন্দ্রনাথ সেন
* বালক শ্রীকৃষ্ণ	—	বরদাকান্ত মজুমদার
* লর্ড পাওএল	—	বসন্তকুমার দাস
লক্ষ্মী বউ	—	শরচ্চন্দ্র ধর
বাঙ্গালার বেগম	—	ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সাবিত্রী-সত্যবান	—	বরদাকান্ত মজুমদার

প্রত্যেকখানি ৸৵৹ চৌদ্দ আনা

স্বামী বিবেকানন্দ	—	মনোরম গুহ-ঠাকুরতা
কালো ভ্রমর (২য়)	—	নীহাররঞ্জন গুপ্ত

প্রত্যেকখানি ১৲ এক টাকা

বাগ্‌দী ডাকাত	—	খগেন্দ্রনাথ মিত্র
ছেলেদের ম্যাজিক	—	যাদুসম্রাট্ পি. সি. সরকার
ম্যাজিকের কৌশল	—	ঐ
* কথাসরিৎসাগরের গল্প	—	কুলদারঞ্জন রায়
* বিবিধ গল্প	—	ঐ
* ছেলেদের গল্প (১ম)	—	ঐ
* ছেলেদের গল্প (২য়)	—	ঐ
নিমাই পণ্ডিতের গল্প	—	দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়
জীবন-কাহিনী	—	রাজবিহারী দাস
* কুট্‌কুটের দপ্তর	—	যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
* রক্তচোষার দিগ্‌বিজয়	—	ঐ
* পয়সার ডায়েরী	—	ঐ
* গল্পের ঝরণা	—	হেমেন্দ্রলাল রায়

প্রত্যেকখানি ১৲ এক টাকা

* গল্পের আল্‌পনা	—	হেমেন্দ্রলাল রায়
ব্যায়াম-শিক্ষা	—	সুবোধচন্দ্র সেন ও বনগোপাল মিত্র
মেবার-গৌরব	—	বিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়
ভারত-লক্ষ্মী	—	ঐ
* পশুরাজ্য	—	সত্যচরণ চক্রবর্ত্তী
* বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার	—	কামিনীকান্ত সেন
ঊষা	—	বরদাকান্ত মজুমদার
সতীরাণী	—	ঐ
কর্ম্মদেবী	—	ঐ
নূতন বৌ	—	শরচ্চন্দ্র ধর
শুভ-বিবাহ	—	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
কালাপাহাড়	—	রসিকচন্দ্র বসু
হরিদাস ঠাকুর	—	সতীশচন্দ্র মিত্র
শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-প্রকাশ	—	ঐ

* চিত্রে দেবশিশু

* সাগরিকা (১ম)	—	রমেশচন্দ্র দাস
* সাগরিকা (২য়)	—	ঐ
* ছুটির বই	—	জগদানন্দ রায়
উদ্ভিদের চেতনা	—	সত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
মেয়েলি ব্রতকথা	—	পরমেশপ্রসন্ন রায়
বিয়ের বই	—	ঐ
* কিশোর রামায়ণ	—	রাজকুমার চক্রবর্ত্তী

প্রত্যেকখানি ১।০ পাঁচসিকা

* ছোটদের বেতালের গল্প	—	খগেন্দ্রনাথ মিত্র
* ছোটদের বত্রিশ সিংহাসন	—	রাজকুমার চক্রবর্ত্তী

প্রত্যেকখানি ১।০ পাঁচসিকা

* খেলার সাথী	—	পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়
* টলষ্টয়ের গল্প	—	দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়
* তাপ	—	জগদানন্দ রায়
মহাভারত	--	রাজকুমার চক্রবর্ত্তী
* ছেলেদের মহাভারত	—	পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
* অতীতের কথা—		
পৃথিবী ও গাছপালা	—	হেমেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য

সতীরাণী চিত্রে   সতীলক্ষ্মী চিত্রে

প্রত্যেকখানি ১॥০ দেড় টাকা

বঙ্গের বীর-সন্তান	—	উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
* সাঁজের কথা	—	শিবরতন মিত্র
* নিশির কথা	—	ঐ
* গাছপালার গল্প	—	হেমেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য
* অতীতের কথা—জীবজন্তু	—	ঐ
* অতীতের কথা—মানব	—	ঐ
টুকটুকে রামায়ণ	—	নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য
বার্ষিক শিশুসাথী (১৩৩৩)	—	ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার
বার্ষিক শিশুসাথী (১৩৩৪)	—	রায় সাহেব জগদানন্দ রায়
বার্ষিক শিশুসাথী (১৩৩৫)	—	বিজয়চন্দ্র মজুমদার
বার্ষিক শিশুসাথী (১৩৩৬)	—	রবীন্দ্রনাথ সেন
বার্ষিক শিশুসাথী (১৩৩৭)	—	কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত
বার্ষিক শিশুসাথী (১৩৩৮)	—	রাজকুমার চক্রবর্ত্তী
বার্ষিক শিশুসাথী (১৩৩৯)	—	ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন
* বার্ষিক শিশুসাথী (১৩৪০)	—	নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য
* বার্ষিক শিশুসাথী (১৩৪১)	—	সুবিনয় রায়চৌধুরী